সার্বজনীন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ

আশ্বিন—১৩৫৯

চার টাকা মাত্র

৩৫৮৭
STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA
১৭.১.৬০

৪২, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ডি. এম. লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ২৫।১এ, কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা-৯, আনন্দময়ী প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত এবং প্রচ্ছদপট শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত।

লেখকের কথা

এই উপন্যাসের পূর্ববঙ্গত্যাগী চরিত্রগুলির মুখে তাদের কথ্য ভাষা, এমন কি, বিশেষ টানটুকু দেবারও চেষ্টা করিনি। তার কারণ, এই উপন্যাসে আরও অনেক প্রধান চরিত্র আছে যারা ওভাষায় কথা বলে না, যাদের কথায় ও রকম টান নেই। এক্ষেত্রে কতগুলি চরিত্রের মুখে স্বাভাবিক আঞ্চলিক ভাষা বা টান দিলে চরিত্রগুলির মধ্যে একটা ভাগাভাগি এনে দেওয়া হত।

কোন কাহিনীতে দু'চারটি বিশেষ চরিত্রকে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলানো যায়—তাতে চরিত্রকটির বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট ও স্বাভাবিক হয়। বিশেষ কাহিনীতে বিশেষ প্রয়োজনে ছাড়া চরিত্রগুলিকে মোট দুটি ভাগ করে দু'রকম আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলানো উচিত নয়—বিশেষ করে চরিত্রগুলি যদি একই শ্রেণীর মানুষ হয়।

আমার এই উপন্যাসে কোন চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষা আমদানীর কোনই প্রয়োজন নেই। এই কাহিনীর মূল ভিত্তি হল সমাজের ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমা ভেঙ্গে গিয়ে সার্বজনীন ব্যাপকতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার যে নতুন গতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সমাজের কোন শ্রেণীতে ভাঙ্গন ধরার অর্থ অনেকে মনে করেন মানুষগুলিরও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে শেষ হয়ে যাওয়া—আসলে মানুষগুলির জীবনও নতুন দিকে গতি পায়, নতুন রূপ গ্রহণ করতে থাকে। সমাজ জীবনে ভাঙ্গন ধরার সঙ্গে গড়ন চলাও থাকবেই।

কাজেই এই কাহিনীতে কতগুলি চরিত্রকে আরও বেশী বাস্তব করার উদ্দেশ্যে তাদের মুখে আঞ্চলিক ভাষা দান করলে চরিত্রগুলির পরস্পারের সম্পর্কের মধ্যে একটা অকারণ ও নিষ্প্রয়োজনীয় ব্যবধান সৃষ্টি করা হত, কাহিনী ব্যহত হত।

এই কৈফিয়ৎ দেবার কারণটা বলি। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে সকলেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছে। অন্য বইয়ে এ পর্যন্ত যত পূর্ববঙ্গীয় চরিত্র এনেছি সকলকেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলিয়েছি। এই কাহিনীতে সর্বপ্রথম ওরকম চরিত্রের মুখে সাহিত্যের চল্‌তি কথ্য ভাষা বসালাম।

সার্বজনীন

এক

সদানন্দ পুরুষ। সর্ব্বদা হাসিখুসী ভাব।

অতি লাগসই মৃদু ও মার্জিত ঠাট্টা-তামাসা স্বাভাবিক সুস্থ মানুষকে তো হাসিয়ে মারেই—হতাশার কালি লেপা গোমড়া মুখে পর্য্যন্ত হাসির অন্ততঃ একটু ঝিলিক ফুটিয়ে ছাড়ে।

আজকের পৃথিবীতে এরকম মানুষ কল্পনা করা কঠিন মনে হলেও একথা সত্য যে কোনদিন কেউ তাকে চিন্তিত দেখেছে বলে স্মরণ করতে পারে না। দুশ্চিন্তার মানেই যেন সে জানে না। কি করে মুখ ভার করতে হয় সেটা শিখবার সুযোগ যেন তার চল্লিশ বছর বয়সে জোটে নি—মুখে মেঘের ছায়াটুকু সঞ্চার করাও যেন তার পক্ষে অসাধ্য!

কতকগুলি পদার্থ বিদ্যুৎ তাপ ইত্যাদির গতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করে। কতকগুলি পদার্থ আবার চল্লিশ বছর জলে ভিজিয়ে রাখলেও ভেজা দূরে থাক, সেঁত-সেঁতে পর্য্যন্ত হয় না—সাধারণ জলের বদলে খাঁটি চোখের জল প্রয়োগ করলেও নয়!

তার ধাতটাও যেন গড়া হয়েছে শোক-দুঃখ-বেদনার শক্ত প্রতিরোধক মাল-মশলা দিয়ে। হাসি আনন্দের ওয়াটারপ্রুফধর্মী আবরণে এমনভাবেই যেন তার হৃদয়-মন ঢাকা যে জগতে নিরানন্দের বর্ষা আছে এটা সে টেরও পায় না!

সে বলে, ঈশ্বর আছেন, আমি আছি। ঈশ্বর সত্যই আছেন, আমি আছি কি না সেটাও ঈশ্বর জানেন। আমি জানি ঈশ্বর আছেন, তাই আমিও আছি। নইলে কি করে জানব ঈশ্বর আছেন? এটা অতি সোজা কথা। পাত্রাধার তৈল কি তৈলাধার পাত্র—সে ইয়াকি নয়! সহজ সরল কথা। আমি আছি কি নেই? এটা জানেন ঈশ্বর। বেশ কথা। ঈশ্বর কি জানেন বা না জানেন সে প্রশ্নই ওঠে না। তিনি সব জানেন—আবার কিছুই জানেন না। তিনি অনন্ত কিন্তু সৃষ্টি করেন—আবার অনন্ত শয্যায় অনন্ত ঘুমে ঘুমিয়ে থাকেন। কাজেই হিসাবটা ওদিক দিয়ে নয়। ঈশ্বর আছেন আমি এটা জানি। সেটাই প্রমাণ যে ঈশ্বরও জানেন আমি আছি। আমি যদি না থাকব তবে কি করে জানব একমাত্র ঈশ্বরই জানেন আমি আছি কি নেই? কাজেই আমি আছি।

বলতে বলতে যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

সত্যি আছি তো?

কয়েক মুহূর্ত ভয়ার্ত দিশেহারা মানুষের মুখভঙ্গি অপূর্ব অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলে, বিহ্বল নেশাখোরের মত উপস্থিত সকলের মুখ, নোংরা রাস্তা, সামনের বাগানবাড়ী আর আকাশের দৃশ্যমান অংশটুকুতে চোখ ঘুরিয়ে এনে নিজের পেট চাপড়ে হো হো শব্দে সে হেসে উঠে!

: আছি আছি, আমি আছি! রেশন নিতে এসেছিলাম আমি, ভুলেই গেছিলাম বাবা! পেটে খিদেটা ছোবল মারছে সাতাস কোটি সাপের মত! আমিই যদি না থাকব, তবে কিসের রেশন, কিসের খিদে!

হাসতে হাসতে সেনদের পাঁচ বছরের মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে বলে, তুইও রেশন নিবি বৌ? একলা এসেছিস? মোটে শ'খানেক

বছর আগে তোকে যে অসতী বলে পুড়িয়ে মারত বৌ-মণি সেকথা বুঝি ভুলে গেছিস? কুলীন বামুন আমি তোকে টাকা নিয়ে বিয়ে করে বলে যেতাম, খবদ্দার, বাকী জীবন সতী থাকবি। পাঁচ ছ'বছর বয়স হয়েছে, বাকী মোটে আর তিরিশ চল্লিশটা বছর। আমাকে ধ্যান করে এ ক'টা দিন কাটিয়ে দিবি, বুঝলি?

হাসির রোল ওঠে।

রেশনের দোকানে রেশন নিতে এসে হত্যা দিয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই হাসতে তো তারা ভুলে যায় নি।

অভাব শুধু হাসাবার মানুষের।

অভাব অনটন রোগ শোক দুর্ভিক্ষও যে জ্যান্ত মানুষের হাসির পাট চুকিয়ে দিতে পারে না, এটুকু যে মানুষটা জানে। সত্যই তো, আনন্দময় সুন্দর জীবন যারা দাবী করছে তারা যদি উপোশ দিয়ে গামছা পরে রেশনের দোকানে এসে হত্যা দিতে হয়েছে বলেই হাসতে ভুলে যাবে, শুধু বেঁচে থাকার আনন্দে এ জগতে তবে হাসবে কারা?

তবে কি সে জেনেশুনেই হাসায়? মানুষের হাসির প্রয়োজনটা বড়ই জরুরী বলে?

বাপ-মা দুজনেরই জ্বর। পাঁচ বছরের মেয়েটা রেশন নিতে এসেছে। তার গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকিয়ে ওইটুকু মেয়ে পর্যন্ত উপভোগ করে তার তামাসা।

পাঁচ বছরের ভয়-ভোলা চালাক চতুর শক্ত মেয়ে!

তার মাথায় পিঠে বাপের মত হাত বুলোতে বুলোতে সে একেবারে যাত্রাদলের ভাঁড়ের মত ভঙ্গি করে বলে, আপনারা তো জানেন না, আপনাদের কি বলব। সেদিন একটি মেয়ে সত্যি আমায় বিয়ে করতে এসেছিল!

সে মুচকে মুচকে হাসে। সকলে উৎসুক আগ্রহে তার রসিকতার আসল কথাটুকুর জন্য প্রতীক্ষা করে। হাসবার জন্য প্রস্তুত হয়েই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। তারা জানে যে রসিকতার এই ভূমিকা শুধু তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য—এবার সে যা বলবে তাতে না হেসে উপায় থাকবে না তাদের।

পর পর সাজানো রেশন কার্ডগুলি নিয়ে দোকানের যে কর্মচারী এ খাতায় ও খাতায় সে খাতায় এটা ওটা সেটা টুকে নিয়ম রক্ষা করছিল—সে পর্য্যন্ত কলমটা উঁচিয়ে ধরে অপেক্ষা করে।

সে-ও তো পাড়ারই ছেলে।

সে হাসির গাম্ভীর্য্য দিয়ে মুখটা হাস্যকরভাবে গম্ভীর করে বলে, ভারি সুন্দরী মেয়ে। সত্যি বলছি ভাই, এত সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে কখনো দেখিনি। রং মেটে, মোটাসোটা চেহারা, বোঁচা নাক—

একটু থামে। এদিক ওদিক তাকিয়ে নেয়।

ঃ সকাল বেলা নাইতে যাব, বাড়ীতে এসে হাজির। আমায় জিজ্ঞেস করলে, আপনার অভিভাবক কে? আমি বললাম, আজ্ঞে আমার তো অভিভাবক নেই! শুনে বললে, যাক গে, সেজন্য আসবে যাবে না, আপনার সঙ্গে কথা বললেই চলবে। আমি ব্যাচেলার নিউজ এজেন্সি থেকে আপনার খবর পেয়ে এসেছি। কিছু সম্পত্তি আছে, চাকরীও করেন, না? বিয়ে না করে দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছেন তো? এটা সমাজ-বিরোধী কাজ, তা জানেন? এসব আর চলবে না, আপনাকে বিয়ে-থা করতে হবে।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ঘটকী বুঝি? জবাব দিলে, না, আমিই তোমাকে বিয়ে করব।

সে নিজে সশব্দে হাসে।

সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ে রেশনপ্রার্থী বালক যুবক বৃদ্ধেরা।

পুরাণো পচা রসিকতা। তবু সকলে সশব্দে হাসে। তার বলার ভঙ্গিতে সকলের মনে হয় যেন নতুন শুনছে রসিকতাটা। নিখিলের রুচি বোধ হয় খুব মার্জিত, সে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, সস্তা রসিকতা করেন কেন?

: সবাই যে বড় গরীব দাদা! সস্তা না হলে নেবে কেন?

খদ্দরের সায়া ব্লাউজের উপর রেশন-বিগর্হিত সুপারফাইন সাড়ী—যেটা আজকের সস্তা মসলিন—গায়ে জড়ানো মোটা সোটা মহিলাটি বলে, আপনাকে চাবকানো উচিত!

সে বলে, কেন? আমি তো মন্ত্রীদের গাল দিই নি!

সকলে আরেকবার হাসে।

মহিলাটি আরও চটে বলে, মেয়েদের অপমান করছেন—লজ্জা করে না?

সে যেন আঁতকে ওঠে। মুখে ভয় আর হতাশার ভাবটা হাস্যকর রকম প্রকট হয়ে পড়ে।

: এ কি বলছেন? কি সর্ব্বনাশ! মেয়েরা যে আমার মা!

এবার কেউ হাসে না। ভদ্রমহিলা মুখ ফিরিয়ে ঝামটা দিয়ে বলে, ভাঁড়!

বরুণ বলে, মিসেস দাস, আপনি ওঁকে চেনেন?

মিসেস রেণুকা দাস শুধু মুখ বাঁকায়।

বরুণ বলে, উনিই আমাদের পরমেশ্বর বাবু।

: তাতে কি হয়েছে?

: রাগ করবেন না, ইতি অতি সদাশিব লোক। কাউকে ইনি খোঁচা দেন না—এমনিই হাসান। আজকালকার দিনে পাড়ায় একজন হাসাবার মত লোক থাকা কি সহজ ভাগ্যের কথা!

: লোকে না খেয়ে মরছে, উলঙ্গ হয়ে থাকছে, এখন ভাঁড়ামি সয় মানুষের? তাও আবার মেয়েদের নিয়ে ইয়ার্কি!

পরমেশ্বর গম্ভীর হয়ে বলে, এখানে আরও মহিলা উপস্থিত আছেন, তাঁরা কিন্তু রাগ করেন নি।

পরমেশ্বর শুধু হাসায় না, দরকার হলে খোঁচা দিতে পারে!

রেণুকা ছাড়া যে পাঁচজন স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিল তাদের কেউ মহিলা বলে না। দু'জন হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের কাপড়ে স্পষ্ট ছাপ লাগানো আছে যে তারা নূতন বাড়ী তুলবার চুণ বালি বয়, অন্য তিনজন বাঙালী স্ত্রীলোককে দেখেই বোঝা যায় পেট চালাবার জন্য তারা ঝি-গিরি ধরণের কাজ করে!

রেশন-ক্লার্ক বরুণ তাড়াতাড়ি রেণুকার কার্ড ক'খানা আগে লিখে কেষ্টকে বলে, আগে এঁরটা মেপে দাও—হাত চালাও একটু!

পরমেশ্বর জোরালো একটা আপশোষের শব্দ করে বলে, নাঃ, আর ভাঁড়ামি নয়। এবার থেকে রেশন নিতে এসে চোটপাট করতে হবে, তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব সকলের আগে।

রেণুকা তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।

সে নিজেই যে গায়ে পড়ে পরমেশ্বরকে শাসন করতে গিয়েছিল সে ভুললেও উপস্থিত অন্য কেউ কথাটা ভোলে নি।

তাই, পরমেশ্বরের ঝাল ঝাড়বার ইচ্ছা ও ক্ষমতার পরিচয়টা তারা বিশেষভাবে উপভোগ করে। মানুষটা অন্য কেউ হলে হয়তো শুধু মেয়েছেলে বলেই অনেকে রেণুকার পক্ষ নিত।

রেণুকা রেশন নিয়ে চলে যাবার পর চশমা পরা সুরঞ্জন বলে, কথাটা উনি বলেছিলেন ঠিকই, ওভাবে না বললেই ভাল করতেন।

: কি রকম ?

: দেশের এই দুর্দিনে নাচগান সিনেমা থিয়েটার আমোদ প্রমোদ বর্জন করাই উচিত। সোজা কথাটা সহজভাবে বলবেন, তা নয় আমাদের ঈশ্বরদা'কে খোঁচা দিয়ে বললেন !

সুরঞ্জনের বয়স বেশী নয়, সন্ত সন্ত পাশ করে চাকরীতে ঢুকেছে, এখনো বিয়ে করার পর্যন্ত সময় পায় নি।

কিন্তু আজকালকার দিনে পাশ করে চাকরী পেয়েছে এ কি সোজা কথা !

দেশে যখন বেকার বোঝাই।

ছাঁটাই হয়ে হয়ে দিন দিন তাদের সংখ্যা যখন বাড়ছে !

ছাত্র সুরঞ্জন রাতারাতি চাকরী পেয়ে বদলে না গেলেও তার একটা সাধ জেগেছে ভারিক্কি ভদ্রলোক হিসাবে পরিগণিত হবার জন্য। ধীরে ধীরে অমায়িকভাবে চারিদিকে একটা সামঞ্জস্য রেখে সে মতামত বলার চেষ্টা করে।

পরমেশ্বর বলে, তুমিও যে আমায় খোঁচা দিয়ে বসলে হে রঞ্জন !

: সে কি ঈশ্বরদা ?

: যা কিছু আনন্দ দেয় সব তুমি বর্জন করা উচিত বললে। দেশের অবস্থা বড় খারাপ। আমিও আনন্দ দিই, আমিও তোমার মতে বর্জনীয়।

: আমি বলছি বাজে আমোদ প্রমোদের কথা—

: তাছাড়া লোকে পাবে কোথা ? কে দিচ্ছে ? সিনেমা খারাপ, থিয়েটার খারাপ সবই খারাপ—ভাল যে আমি তা কিন্তু বলছি না ভাই। কিন্তু যা আছে তাই নিয়ে তো একটু ভুলে টুলে থাকবে মানুষ—যা নেই তা পাবে কোথা ?—তাহলে সব ছেড়ে দিয়ে তোমাদের ওই মিসেস দাস না কে, ওঁর মত মেজাজ করে দিন কাটাতে হয় !

আদিনাথ বলে, বড় কষ্ট করে চালাতে হয় মিসেস দাসকে।

পরমেশ্বর বলে, তাই বলে মেজাজ চড়িয়ে রেখে লাভটা কি? কষ্ট তাতে কিছু কম হবে? দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না বলে লোকে সিনেমা দেখবে না—একথার মানে চোরের উপর রাগ করে সেই কাজটা করা। গাল দেওয়া উচিত সিনেমা যারা করছে। দেশের লোকের এত কষ্ট, ব্যাটারা কোথায় একটু ভাল সিনেমা করে মানুষকে আনন্দ দেবে—তা নয়, স্রেফ বিষ দিয়ে পয়সা নিয়ে ঠকাচ্ছে!

শশধর বলে, বিষ খায় কেন দেশের লোক!

পরমেশ্বর বলে, বিষ খেলে যে নেশা হয় রে ভাই!

অনেকে হেসে ফেলে।

শশধর রুমাল দিয়ে মুখ মোছে।

সে নাম করা নেশাখোর। মদটা তার প্রধান নেশা হলেও আরও তিন চার রকম নেশা তার আছে। অবস্থা ভালই ছিল, চাকরীও করে ভালই—শুধু নেশায় তাকে কাহিল করে ছেড়েছে। শরীর এবং পয়সা দু'দিক দিয়েই!

প্রৌঢ় বয়সী রবীন্দ্র সরকার বলে, যাক্, যাক্। আপনার দেশের খবর কি ঈশ্বরবাবু?

: আমার দেশ? আমার দেশতো এটাই!

: আগে যেটা দেশ ছিল। আপনার ভাই নাকি চলে আসবেন সবাইকে নিয়ে?

: আসবে আসবে তো করছে—এখন কবে হঠাৎ এসেই পড়ে ভাবছি।

: ভাবনার কি?

: ভাবনা নয়? দুর্ভাবনায় রাতে ঘুম হয় না দাদা। সকলকে ঘাড়ে

করে এনে দিয়ে শ্রীমান নিজে নিশ্চয় ফিরে যাবে। দেশে জমিজমা না দেখলে খাবে কি? বোঝাটি সব কাজেই চেপে থাকবে আমারই ঘাড়ে! সংসারটি কি সোজা ভায়ার? স্ত্রী, দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে! বড় ছেলেটি হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়ে, বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে,—নইলে কি যে হাল হত আমার!

: আচ্ছা আপনি দেশে যান না কেন?

: কোন দেশে?

ধীরেন বলে, সে তো অল্পদিনের কথা। আগে যখন দু'টো দেশ একটা ছিল তখনও তো আপনাকে বিশেষ যেতে দেখিনি!

নরেশ প্রশ্ন করে, আপনি কতদিন দেশে যান না?

পরমেশ্বর বলে, বিশ বছর কি ত্রিশ বছর হবে! নিজের বয়স কুড়ি হল না পঁচিশ হল হিসেব রাখি না, দেশে কদিন যাই না যাই কে হিসেব রাখে মশায়? আর কেনই বা যাব বলুন? দেশে আপনার লোক কে আছে বলুন? ভাই আর তার সংসার, ভায়ের বুড়ী মা আর বিধবা বোন আর তার গোটা পাঁচেক ছেলেমেয়ে—

বিশু বলে, ভায়ের সংসারের আগের হিসাবের সঙ্গে তো মিলল না ঈশ্বরবাবু?

: তাই কি আয় মেলে ভাই? পরের সংসারের হিসাব। কা তব কান্তা কস্তে পুত্র—তার আবার ভায়ের ছেলে বৌ মা বোনের হিসাব!

পরমেশ্বর রেশন নিয়ে চলে গেলে রেশনার্থীদের অনেকে তারই সম্পর্কে আলোচনায় সরগরম হয়ে উঠে।

হাসিখুসী সদানন্দ মানুষ কিন্তু একেবারেই সৃষ্টিছাড়া। এই নিরানন্দ জগতে হাসিখুসী সদানন্দ হলেই অবশ্য সৃষ্টিছাড়া হয়—শুধু সেদিক দিয়ে নয়।

লোকটি সে সন্ন্যাসী নয়। কেউ কোন দিন তাকে জপ তপ পূজা অর্চ্চনা করতে ছাখে নি—কোন রকম গোপন সাধন ভজন আছে কিনা চেষ্টা করেও জানা যায় নি।

শুধু গভীর রাত্রে নয়, বিশেষ বিশেষ তিথিতেই শুধু নয়, বহুদিন ধরে দিবারাত্রির নানারকম সময়ে তার ঘরে হানা দিয়ে দেখা গেছে,—ওসব ধার সে ধারে না।

বিয়ে করে নি।

কিন্তু এতকালের মধ্যে কামিনী সম্পর্কিত কোনরকম ভজখট কেউ তার বেলা কল্পনা করারও সুযোগ পায় নি।

নেশাও করে না।

শুধু খৈনি খায়।

ভোজন বিলাসী নয়। খাওয়া দাওয়া অতি সাধারণ। এবং বিশেষ কোন বাছবিচার নেই।

ভোগীও নয় ত্যাগীও নয়, এ কেমন মানুষ? খায়দায় ঘুরে বেড়ায় আর দশজনের সঙ্গে হাসিমুখে মেলেমেশে—অন্তরঙ্গ না হয়ে নিছক শুধু মেলেমেশে—এ কিরকম মানুষ?

প্রণব বলে, এরা হল এক ধরণের পাগল। এরা গা বাঁচিয়ে চলে। কোন কিছুর মধ্যে নেই অথচ এমন ভাব দেখায় যেন সব কিছুর মধ্যে আছে।

নিশীথ বলে, পাগল কিছুই দেখাতে চায় না। দেখাতে চাওয়ার সেন্স থাকলে কেউ পাগল হয় না। তুমি আমি যেমন স্বাভাবিকভাবে এটা ওটা করি, পাগলও তেমনি ভাবেই এটা ওটা করে।

সুরঞ্জন গম্ভীর সুরে বলে, আমরা কি স্বাভাবিকভাবে সব কিছু করি নিশীথ বাবু?

: করি না? আমরা স্বাভাবিক মানুষ নই?

: সবটা কি স্বাভাবিক? অনেক দিক দিয়ে আমরা অস্বাভাবিকও বটি তো!

: কেন?

: যুগটাই অস্বাভাবিক বলে।

নরেশ মন দিয়ে শুনছিল। এবার সে জোর দিয়ে বলে, তাই কখনো হয়! একটা যুগ কখনো অস্বাভাবিক হতে পারে না। মানুষও কখনো অস্বাভাবিক হয় না—দু'চারজন যারা হয়, তারা রোগী। ইতিহাস এঁকে-বেঁকে এগিয়ে চলে, যখন যে অবস্থা থাকে সেটাই স্বাভাবিক অবস্থা।

তখন ইতিহাসের আঁকা-বাঁকা গতি নিয়ে তাদের কয়েকজনের তর্ক সুরু হয়। রেশন মাপা হলে এক একজন থলি হাতে বিদায় হয়ে যায়। অন্যেরা এ ওর সঙ্গে নানা বিষয়ে এলোমেলো কথা সুরু করে।

অসুখ-বিসুখ অভাব অসুবিধার কথা। জীবনে যত নালিশ জমা হয়েছে তার কথা।

দেখা যায়, পরমেশ্বর যে হাসির আবহাওয়াটা সৃষ্টি করে গিয়েছিল সেটা উপে গেছে।

দুই

সুরঞ্জনদের একই বাড়ীতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে।

পরমেশ্বর নামে বিশেষ প্রকৃতির একজন মানুষ বাড়ীতে আছে এটা যেন তারা টেরও পায় না। তিনতলা বাড়ীতে আরও তিন ঘর ভাড়াটের সঙ্গে তারাও আছে, ওই তিন ঘর ভাড়াটের অস্তিত্ব তারা প্রতিদিন টের পায় মর্মে মর্মে—ভাড়াটেদেরও অবশ্য মর্মে মর্মেই টের পাইয়ে দেয়—পরমেশ্বর

যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে তাদের সকলের অস্তিত্ব আর সংঘাতের সঙ্গে।

সে ভিন্ন ভাড়াটে—লম্বা চওড়া একজন স্বতন্ত্র লোক সে ভিন্ন ভাবেই রাঁধে বাড়ে খায় দায় ঘুমায় এবং ঘরের ভাড়া দেয়—কিন্তু ভাড়াটে হিসাবে তার অস্তিত্বকে যেন ভিন্ন ভাবে অনুভব করাই যায় না।

মাস শেষ হতে না হতে কখন যে সে ভাড়া দিয়ে রসিদ কেটে নিয়ে যায়।

অন্যদের ভাড়া নিয়ে খেঁচাখেঁচি করার সময় যেন প্রথম সুরঞ্জনের বাবা অচিন্ত্যের চোখে পড়ে রসিদটা,—পরমেশ্বর ভাড়া দিয়ে দিয়েছে।

ভাড়ার জন্য একবারও যেতে হয় নি পরমেশ্বরের কাছে।

বিধুভূষণের সুন্দরী মেয়ে পদ্মা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে লজ্জা পায়—আজ কত বছর প্রতিদিন কত বার এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে আসছে, কিন্তু সামনা সামনি না হলে পরমেশ্বর আছে কি মরেছে চেয়ে দেখার সময় হয় নি, খেয়াল হয় নি!

: কেমন আছেন ঈশ্বর বাবু? খবরের কাগজ পড়ছেন?

: খবর কই? কাগজ কই? ব্যাপারটা কি দেখছি।

পদ্মা সুখের হাসি হাসে। তা হলে অপরাধ হয় নি! পরমেশ্বর দীর্ঘ অবহেলাতেও অপরাধ নেয় নি!

ঈশ্বর উঠে এসে কুকারে আগুন জ্বলছে কিনা দেখতে থাকে।

পদ্মা বলে, খবর কার? কাগজ কার ঈশ্বরবাবু?

সে ভাবে, এবার নিশ্চয় তাকে ঘরে ডাকা হবে। বলা হবে, বোসো।

খানিকটা ন্যাকামি করেছে তো।

তারপর অনেক রকম অনেক কথা কইতে কইতে ঈশ্বর তার কোমল হাতটি অন্তত একবার নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেবে।

সে বলবে, কি করছেন ?

: তোমার হাতের রেখা দেখছি।

একটু মিষ্টি কথা বললেই আনন্দে লাফিয়ে ওঠে এই সব একক রহস্যময় জীবনযাপনকারী মানুষ, এই সব সুযোগ পাবার জন্যই এই রকম একাকীত্বের ফাঁদ পেতে বসে থাকে মাকড়সার মত।

কিন্তু পরমেশ্বর নড়ে চড়ে না। কাগজটা নামিয়ে তার দিকে চেয়েও ভাখে না।

মানুষটা কি ভণ্ড ?

পরমেশ্বর কাগজ পড়তে পড়তেই বলে, খবর তোমার আমার। কাগজটা আমেরিকার।

: তাতে কি ?

: কাগজ বেচেই ওরা সুখী নয়। খবর ছাপা কাগজ বেচতে চায়। বলে কিনা খবরের চেয়ে কাগজের দাম বেশী ! কাগজ যদি চাও, আমাদের বানানো খানিক খবর সাথে নাও। ভেজাল নিতেই হবে।

পদ্মা হেসে বলে, আপনি এসব কথাও ভাবেন নাকি !

পরমেশ্বর যেন অভিমান করে বলে, ভাবনাও একচেটিয়া করতে চাও তোমরা ?

পদ্মা অগত্যা মনের ভাবনা খুলেই তাকে বলে। মানুষটার সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা হচ্ছে।

: আমরা তো চললাম ঈশ্বরবাবু।

: তাই শুনছিলাম।

: এ পাড়ায় থাকব না। পাড়াটা সুবিধে নয় তেমন।

: কি করেছে পাড়ার লোক ? তোমাদের পাকা ধানও নেই, পাড়ার লোকে মই দিতেও জানে না !

: মোটে মিশুক নয়। কেমন হিংশুটে স্বভাব। আমরা একটু ফরোয়ার্ড বলে হিংসে করে!

: সে তো যেখানে যাবে সেখানেই করবে! অন্ততঃ তোমাদের তাই মনে হবে। যদি সবাই হিংসাই না করল, ফরোয়ার্ড হয়ে লাভ কি? প্রমাণ কি যে সবার চেয়ে এগিয়ে আছি?

: আপনার সঙ্গে কথায় পারা দায়।

: কাজে?

পদ্মা একটু হাসে।

সামনে থাকলে আলাপ করার সময় এত ভাল লাগে মানুষটাকে, অথচ চোখের আড়াল হলে এক বাড়ীতে থাকলেও সে যে আছে এটুকুও যেন খেয়াল থাকে না! একেবারে মুছে যায় মন থেকে!

পদ্মা বলে, আমরা চলে গেলে আপনি কোথায় যাবেন? আমাদের নতুন বাড়ীতে যদি এই রকম দু'খানা ঘর আপনাকে দিই—

: আমি তো যেতে পারব না। এখানেই থাকতে হবে।

: কেন?

: তোমাদের এ বাড়ীটা আমিই কিনব যে?

: তাই নাকি! আমি তো কিছুই জানি না!

: কি করে জানবে বল? আজ বসে বসে আমিই শুধু মনে মনে ঠিক করেছি ঘণ্টা খানেক আগে। তোমার বাবার সঙ্গে এখনো কথা হয় নি। তবে বিধুবাবু যখন বিক্রীই করে দেবেন বাড়ীটা, খদ্দের খুঁজছেন, আমাকে বিক্রী করতে আপত্তি হবে না নিশ্চয়। অবশ্য যদি দরে বনে।

দাড়িতে হাত বুলিয়ে ঈশ্বর আবার বলে, দরেও বনবে মনে হয়। সেদিন যেরকম দামের কথা বলছিলেন, আমার তাতে আপত্তি নেই।

পদ্মার কৌতুহলের সীমা ছিল না। সে জিজ্ঞাসা করে, বাড়ী কিনবেন কেন? আপনি তো একলা মানুষ? বিয়ে করবেন নাকি?

: বিয়ে? কাকে বিয়ে করব, মেয়ে কই?

: মেয়ে নেই দেশে? কি যে বলেন আপনি! আমি মেয়ে ঠিক করে দিচ্ছি!

ঈশ্বর গম্ভীর হয়ে বলে, সে তো তুমি আমার একটি মা কি বোনকে ঠিক করে দেবে—দেখতে গেলেই চিনতে পারব।

: ও! সব মেয়েই আপনার মা বোন—এই জন্য!

: হয় তো সবাই নয়, একজন হয় তো আছে কোথাও যাকে বিয়ে করা চলে। কিন্তু কে খুঁজে বেড়ায় বল? তার চেয়ে দিব্যি আছি, খাই দাই ঘুরে বেড়াই।

: তবে যে বাড়ী কিনবেন?

: আমার ভাই আসছে সবাইকে নিয়ে। সাতপুরুষের ভিটে ফেলে আসবে—একেবারে ভাড়া বাড়ীতে উঠবে? তার চেয়ে একটা বাড়ী কিনে রাখাই ভাল।

: কবে আসবেন আপনার ভাই?

: ভিটে ছেড়ে আসবে, তার আবার কবে কি। যেদিন খুসী আসতে পারে!

ষণ তার প্রস্তাব শুনে বলে, আপনি কিনবেন? সে তো ভাল কথাই। আমার মশায় বাড়ীটা বেচবার ইচ্ছা ছিল না, মেয়েরা থাকতে চাইছে না। এ পাড়ায় ভাল অ্যাসোসিয়েশন নেই।

: কোন দিকে যাবেন?

বালীগঞ্জের দিকে যাব ভাবছি।

: ভালই তো, ভালই তো।

বিধুভূষণের কাছে আরেকবার পরমেশ্বরকে বাড়ী কেনার কারণটা বিশ্লেষণ করতে হয়।

বলে, বাড়ীটা আসলে কিনছে আমার ভাই, আমি একরকম এজেন্ট হিসাবে কিনে দিচ্ছি, এইমাত্র।

: আপনিও তো সম্পত্তির সমান অংশীদার?

: অংশ আছে আইনে—কিন্তু টাকা দিয়ে বাড়ী দিয়ে আমি কি করব বলুন? একলা মানুষ—খেতে পরতে আর একটু মাথা গুঁজতে পেলেই হল।

বিধুভূষণ আরও অনেক বারের মত বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, সত্যি! আপনি না সন্ন্যাসী না গৃহী। ব্যাপারটা বুঝতে পারি না আপনার।

পরমেশ্বর হেসে বলে, আমার ব্যাপার খুব সোজা। ঝন্‌ঝাট ভালবাসি নে। ঘর সংসার করলেও ঝন্‌ঝাট আবার সন্ন্যাসী হলেও কম ঝন্‌ঝাট নয়। তার চেয়ে নির্ব্বিবাদে একলা জীবনটা কাটিয়ে দেওয়াই ভাল।

: কামনা বাসনা ত্যাগ করেছেন?

: আমি কিছুই ত্যাগ করিনি। কামনা জাগে—মিলিয়ে যায়। বাসনা হয়—ভুলে যাই। কামনা বাসনা থাকলেই তো হয় না—ওসব মেটাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে তো। ওই চেষ্টাটাই আমার আসে না মশাই! আবার দোকানে যাব রসগোল্লা খেতে? তার চেয়ে কোঁচরে মুড়ি আছে তাই চিবাই!

: কিছুই ত্যাগ করেন নি—আবার কিছু ধরতেও চান না!

: পারলে ধরি। কষ্ট করে ধরতে নারাজ। কষ্ট করলে যদি কেষ্ট মেলে—আমার কেষ্ট মিলে কাজ নেই। এমনিই বেশ চলে যাচ্ছে।

একটু দার্শনিকতা অবতারণার চেষ্টা করে বিধুভূষণ বলে, আচ্ছা ঈশ্বরবাবু, মানুষ কি কর্ম ত্যাগ করতে পারে? কর্মফল নয় ভগবানে সমর্পণ করা যায়, কিন্তু কর্ম—

: কে ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় বলুন? ভগবান আছেন, জগৎসংসার আছে, আমি আছি—বাস্, মিটে গেল। মনের আনন্দে দিন কাটাও।

: আনন্দে?

: নিশ্চয়। আনন্দই সহজে হয়।

কার কাছে খবর শোনে পঙ্কজ। সে উৎসাহিত হয়ে এসে বলে, আপনি সত্যি এ বাড়ীটা কিনছেন ঈশ্বরবাবু?

: কিনছি বৈকি।

: দেশের সবাই চলে আসবেন?

: তাও আসবেন বৈকি!

: অনেকদিন পরে ওদের সঙ্গে দেখা হবে।

পরমেশ্বর তার আনন্দ দেখে মৃদু হেসে বলে, তুমি তো আচ্ছা ছেলে হে! ওদের হল চরম দুর্গতি, জলের দামে যা পারে বেচে দিয়ে সব ফেলে টেলে চলে আসছে, দেখা হবে বলেই তুমি খুসী হয়ে উঠলে।

পঙ্কজ লজ্জিত হয়ে বলে, ছি ছি, ওদিকটা আমার খেয়ালও হয়নি!

পঙ্কজ পাড়ার ছেলে, বোধহয় সব বিষয়েই সব চেয়ে বেশী উৎসাহী ছেলে। দেশ ভাগ হবার আগে একটা বিশেষ প্রয়োজনে পঙ্কজকে পরমেশ্বর দেশের বাড়ীতে পাঠিয়েছিল। পাঠিয়েছিল মানে পঙ্কজ নিজেই উৎসাহ করে গিয়েছিল—ও দেশটা বেড়িয়ে আসবার সখ তার ছিল অনেক দিনের।

দু'তিন দিনের জন্য গিয়ে পরমেশ্বরের ভাই মহেশ্বরের বাড়ীতে অতিথি

হয়ে কাটিয়ে দিয়েছিল দু'সপ্তাহ। পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষকে তার স্পষ্ট স্মরণ আছে, বিশেষভাবে প্রতিমাকে।

প্রতিমা তখন স্কুলে পড়ত। এখন কলেজে উঠেছে। না জানি কত বড় হয়েছে আর কতদিক দিয়ে বদলে গিয়েছে প্রতিমা!

: সেবার বেড়াতে গিয়ে তোমার খুব ভাল লেগেছিল, না হে? পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করে।

: খুব ভাল লেগেছিল!

: যাবে আরেকবার? দু'চারদিনের জন্য?

পঙ্কজ চিন্তিত ভাবে বলে, ছুটি পাব কি? নতুন চাকরী!

পরমেশ্বর বলে, আমার কিন্তু বাবা স্বার্থ আছে! তোমায় শুধু বেড়াতে যেতে বলছি না। যেতে লিখেছে আমায়—সকলকে নিয়ে আসতে একটু সাহায্য হবে। আমার আর নড়তে চড়তে ভাল লাগে না কোথাও। তুমি গেলে আমি রেহাই পাই!

: কবে যেতে হবে?

: সেটা তোমায় যথাসময়েই জানাব।

: একটু আগে জানা দরকার, আপিসে ছুটি নিতে হবে কি না।

: সামনের সপ্তাহে?

: বেশ। সকলেই চলে আসবে?

: সবাই। জন্মের মত চলে আসবে—জলের দামে সব বেচে দিয়েছে। ভেবেছিলাম ভাই বুঝি সকলকে আমার জিম্মায় রেখে সম্পত্তি দেখতে ফিরে যাবে—কিন্তু ও একেবারে সব সাফ করে দিয়ে আসছে। মানুষটা একটু গোঁড়া, বুঝলে না? নিজের ভগবানটিকে ছাড়া কারো ভগবানকে পছন্দ করে না।

পঙ্কজ হেসে বলে, আপনি?

পরমেশ্বর বলে, আমি ? আমার ভগবান একটা হলেই হল। তিনি কি আর কেমন আর বিশেষভাবে কাদের অত সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।

: সময় নেই কেন ? কিছুই তো করেন না। কোন ঝন্‌ঝাট নেই।

: কিছু না করার জন্য সময় দিতে হয় বলেই তো কিছু করার জন্য সময় পাই না। তুমি যাবে তো ঠিক ?

: যাব।

খবর শুনে পঙ্কজের বাড়ীর মানুষ অসন্তুষ্ট হয়।

জ্ঞান বলে, তোমার চিরদিন পরের ব্যাপারে মাথা গলাতে যাওয়া। আগে যা হোক চলে যেত, এখন চাকরী বাকরী নিয়েছ, এখনো কি ওসব পোষায় ? নিজের দিকে একটু তাকাবে না ?

: একটু বেড়াতে যাব তাতে দোষ কি ?

: ছুটির সময় বেড়াতে যেও। ছুটি নিয়ে আপিস কামাই করে বেড়াতে যাওয়ার কোন মানে হয় না।

: ক'দিনের তো ব্যাপার।

: কদিনেই অনেক এসে যায়। তা ছাড়া তুমি তো আর সত্যি সত্যি বেড়াতে যাচ্ছ না, যাচ্ছ বেগার ঠেলতে।

পঙ্কজ গম্ভীর হয়ে বলে, আপনাদের হিসাব আমি বুঝি না। নিজের বেড়ানো হবে, অন্যের একটু উপকার হবে—সব বাদ দিয়ে শুধু যদি চাকরীই করতে হয়, অমন ভাবে বেঁচে থেকে লাভ কি ?

জ্ঞানও গম্ভীর হয়ে বলে, পরমেশ্বরের হাওয়া লেগেছে তোমার গায়ে। সারা দেশের বেকারের সংখ্যা জানো যে চাকরীকে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিচ্ছ ? এই চাকরী করেই তোমায় খেতে হবে।

পঙ্কজ আর তর্ক করে না।

তিন

ট্রেণ হু হু করে ছুটেছে।

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে।

গাড়ীর মধ্যে টিমটিমে আলো। যাত্রীরা ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে কোন রকমে নিঃশ্বাস নিয়ে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ষ্টীমারেও ভিড় ছিল কিন্তু ট্রেণে যা অবস্থা হয়েছে তার বর্ণনা হয় না। মানুষের দেহ যদি আরেকটু নরম হত তাহলে সকলে বোধ হয় তালগোল পাকিয়ে একটা মাত্র মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে যেত!

তবু, এর মধ্যেও মানুষের প্রাণ যে কত উদার তার প্রত্যক্ষ বাস্তব প্রমাণ মিলছে। এ অবস্থায় আত্মরক্ষার অন্ধ স্বার্থপরতাকে পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে উঠে যাত্রীরা গাড়ীর একটা কোণ মেয়েদের ছেড়ে দিয়েছে, তারা যাতে একটু স্বস্তিতে বসে যেতে পারে।

কারো শোয়ার প্রশ্নই অবশ্য উঠে না।

বাচ্চারা শুধু মা বাপের বুকে শোবার ঠাঁই পেয়েছে।

ছোট একটি মেয়ে কোলে নিয়ে একজন অল্পবয়সী বৌ বেঞ্চির কাঠে মাথা হেলান দিয়ে মুষড়ে পড়ে আছে। পাশের অজানা অচেনা মেয়েটি এমনভাবে পাখা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে যাতে বেশী হাওয়া অসুস্থা স্ত্রীলোকটির গায়ে লাগে! হাতটা যেন তার আপনা থেকে ওই দিকে সরে পাখাটা নাড়ছে ওইভাবে।

এটা থার্ডক্লাশ কামরা। যাত্রী উঠেছে সব ক্লাশেরই। ঘর বাড়ী ফেলে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দেশান্তরী হবার সময় গাড়ীর কামরা কোন্ ক্লাশের বিচার বিবেচনা করার সুযোগ হয় নি।

দু'চার জন যারা সে চেষ্টা করেছিল তারা ভেসে গেছে ভিড়ের অসমর্থনে।

সাধন বলে, শুধু থার্ডক্লাশের যাত্রী না থাক, থার্ডক্লাশের যাত্রীরাই একটু অভদ্র হয় স্বার্থপর হয়, যায়গা নিয়ে মারামারি করে, এটা চিরকালের মিথ্যা কথা। আমরা ভেবে দেখি না, উঁচু ক্লাশে যেটুকু ফাঁকা ভদ্রতার দেখা মেলে সেটা শুধু ওটুকু ভদ্রতা করার সুযোগ সুবিধা থাকে বলেই! আজকাল উঁচু ক্লাশেও ভিড় হয়—অভদ্রতা স্বার্থপরতা থেকে যায়গা নিয়ে মারামারি পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যায় না। বরং থার্ডক্লাশের চেয়েও বিশ্রীভাবে অভদ্রভাবে হয়!

পঙ্কজ বলে, আমারও উঁচু ক্লাশ নীচু ক্লাশ সম্পর্কে ওইরকম ধারণা ছিল। যুদ্ধের সময় কলকাতায় যখন জাপানী বোমার আতঙ্ক হয়, সেবার ট্রেণে উঁচুক্লাশের ভদ্রতা আর মার্জ্জিত রুচির চরম পরিচয় পেয়েছিলাম।

পঙ্কজ সেই অভিজ্ঞতার কথা বলে। বড়লোকেরাই বেশীর ভাগ সহর ছেড়ে ভাগবে তাড়াতাড়ি—ফার্ষ্টক্লাশের টিকিট কিনেও গাড়ীতে উঠবার জন্য ভিড় ঠেলে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। অন্যের ছেলেপিলে আর মেয়েদের সরিয়ে নিজের পরিবারটি নিয়ে গাড়ীতে ওঠার জন্য সে কি ঝগড়া মারামারি! যারা আগে উঠতে পেরেছে কামরার মধ্যে যায়গা দখল নিয়ে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের শত্রু, কিন্তু দরজা বন্ধ রেখে বাইরে থেকে আর কেউ উঠে যাতে তাদের অসুবিধা ঘটাতে না পারে সে জন্য তাদেরই আবার কি কুৎসিত একতা!

থার্ডক্লাশের মানুষ এ ধরণের স্বার্থপরতা জানে না। জোট বেঁধে তারা বিপন্ন মানুষকে গাড়ীতে উঠতে বাধা দেয় না। উঠবার যদি সাধ্য থাকে, ওঠো! আগে উঠে বসেছি, এবার নিজেদের কষ্ট বাড়বে বলে গায়ের জোরে তোমায় উঠতে দেব না, তুমি ছেলেপুলে স্ত্রীকে নিয়ে

প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকবে, থার্ডক্লাশের যাত্রীরা কোনদিন এভাবে চিন্তা করতেই জানে না।

ছেলেমানুষ গণেশ সায় দিয়ে বলে, সত্যি!

দম আটকানো গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে এবং কামরার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে মেয়েদের বসবার যায়গা করে দেবার মধ্যে সেও যেন দেখতে পায় ভদ্রতা কাকে বলে তার আসল রূপটা।

সাধন বলে, বাইরে থেকে মনে হয় গরীবরা বড়ই ঝগড়াটে। কিন্তু খাঁটি মিল শুধু গরীবদের মধ্যেই হয়। লোক দেখানো মিল নয়, দরকারী বাস্তব মিল।

পঙ্কজ বলে, গাড়ীর সকলেরই সমান অবস্থা। টাকাপয়সা হয় তো কারো আছে কারো নেই—কিন্তু কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, টাকাপয়সা কদিন চলবে, কেউ জানে না।

প্রতিমার সঙ্গে চোখোচোখি হয় পঙ্কজের। পাখাটা নামিয়ে প্রতিমা একটু হাসে।

এ অবস্থাতেও প্রতিমা হাসতে পারে!

দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে মহেশ্বর হাঁটুতেই মাথা গুঁজে একভাবে বসে আছে।

তার বুকটা কিরকম হু হু করছে কে জানে!

এদের কলকাতা যেতে সাহায্য করার জন্য না এলে সে বোধ হয় এতটা স্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারত না সাতপুরুষের ভিটে ফেলে চিরদিনের জন্য দেশান্তরী হওয়া এই সব মানুষের কাছে কি মর্মান্তিক ব্যাপার।

প্রতিমার মা সুভাগিনী চোখ বুজে আছে।

কে জানে চোখের পাতা দিয়ে চোখের জল ঠেকাবার জন্য কিনা!

হু হু করে ট্রেণ চলেছে।

মালপত্রের একটা পাহাড়ের ডগায় তারা তিনজনে কোনরকমে বসেছে। একটু ঘুমিয়ে নেবার আশা করাও বাতুলতা। ঘুমানো দূরে থাক, একটু অসতর্ক হলেই একেবারে নীচের লোকের ঘাড়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

পাশেই বসেছে গণেশ।

বয়স তার বেশী নয় কিন্তু কিশোর বয়সী ছেলের পক্ষেও আশ্চর্য্যরকম কোমল তার মুখখানা। এরকম কোমলতা দেখেছে মনে পড়ে না পঙ্কজের। গলার আওয়াজটাও তার মিষ্টি।

পঙ্কজকে সাবধান করে দিয়ে সে বলে, ঝিম ধরলেই পড়ে যাবেন কিন্তু। ওদিক দিয়ে আমার অবস্থা বরং ভাল।

: ঝিম ধরাই ঠেকাচ্ছি।

গণেশ একটু হাসে।

দাঁতগুলি ঝকঝকে। হাসিটা পঙ্কজের বড় ভাল লাগে। তার চোখে সোনার চশমা, সখের হওয়াই সম্ভব।

সে বলে, আপনি বরং এক কাজ করুন না? ওই আংটার সাথে নিজেকে বেঁধে ফেলুন। সবে বারটা বেজেছে, ঘুম ঠেকাতে ঠেকাতে কখন চোখ লেগে যাবে, দুর্ঘটনা ঘটে যাবে একটা।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়।

কিন্তু সমস্যা হল দড়ি পায় কোথা, নিজেকে আংটার সঙ্গে বাঁধে কি দিয়ে। কোঁচাটা খুলবে কিনা ভাবছে, গণেশ ডেকে বলে, মা, আলগা চাদরটা ছুঁড়ে দাওতো?

মেয়েদের যায়গা থেকে একজন প্রৌঢ় বয়সী বিধবা বলে, চাদর আবার কি হবে? ছাখতো বেলা চাদরটা গেল কৈ।

বেলাই চাদরটা পেতে বসেছিল। চাদরটা তুলে তাল পাকিয়ে ভাই-এর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ঈর্ষা মেশানো অনুযোগের সঙ্গে কিশোরী মেয়েটি বলে, চাদরটাও তোমার চাই? ওখানে পাতবে কোথায়?

দেখা গেল, কোমরে জড়িয়ে আংটায় চাদর বাঁধা যায় না। এক মুহূর্ত্ত একটু অপ্রতিভ হয়ে থেকে ছেলেটি চাদর লম্বা করে তাদের দু'জনের কোমরে জড়িয়ে বেঁধে দেয়। তার পড়ার ভয় নেই—পঙ্কজের এই নিরাপত্তাটুকুর ব্যবস্থা করে দিতে পেরে ভারি খুসী মনে হয় তাকে।

: তোমার নাম কি?

: নাম? আমার নাম গণেশ।

নাম বলতে মুহূর্ত্তের ইতস্ততঃ ভাব একটু খাপছাড়া মনে হয়।

তারাও দেশ ছেড়ে বাড়ীঘর ছেড়ে কলকাতায় চলেছে। একরকম নিরুদ্দেশ যাত্রা, কোথায় উঠবে কোথায় থাকবে কি করবে কিছুই ঠিক নেই। এবং পরিবারটির অভিভাবক হয়ে সঙ্গে চলেছে এই ছেলেমানুষ গণেশ।

: আত্মীয় স্বজন কেউ নেই কলকাতায়?

: আছেন বৈকি। একটি পিসে, আর একটি দূরকম্পর্কের কাকা। মাকে স্পষ্ট লিখে দিয়েছেন দু'জনে তাঁদেরও বাড়ীতে তিলধারণের ঠাঁই নেই। লিখে দেওয়া সত্ত্বেও আমরা অবশ্য হাজির হব।

: তারপর কি করবে?

: যেমন তেমন একটা বাসা খুঁজে নিতে হবে।

: সেটাইতো সমস্যা। বাসা খুঁজতে ক'মাস লেগে যাবে কে বলতে পারে?

গণেশ চুপ করে থাকে।

চুপ করে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। ব্যাপারটা আরেকবার ধারণা করার চেষ্টা করে পঙ্কজ। শুধু গণেশেরা নয়, গাড়ীর বোধহয় অধিকাংশ পরিবারই এমনি অনিশ্চিতের দিকে যাত্রা স্বরু করেছে। এবং গাড়ীও আজ এই একটি চলছে না কলকাতার দিকে।

গা ব্যথা হয়ে গেছে, পা দুটো আড়ষ্ট লাগছে। ধীরে ধীরে চোখ বুজে কষ্টটা ভুলবার চেষ্টা করে। মনটা আবার গভীর ভাবে নাড়া খেয়েছে। কি বিশৃঙ্খল অনিশ্চিত অবস্থা দেশে। মানুষের যেন খেয়ে পরে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকার অধিকার নেই, চারিদিকে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে থাকতেই হবে, দুঃখ দুর্দ্দশা চরমে উঠতেই হবে। পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ বেধে বছরের পর বছর ধরে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ভয়ঙ্কর সব মারণাস্ত্র নিয়ে খুনোখুনি চলবে, দুর্ভিক্ষ উজাড় করে দিয়ে যাবে, পরণের কাপড়ের জন্য লোকে পাগল হবে। যুদ্ধ থেমে গেলেও সাধারণ মানুষের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার উপায় থাকবে না। আরেকটা যুদ্ধের নানা সূচনা চালাবে দানবেরা। ধনীর চেয়ে বড় জঞ্জাল জগতে আর নেই। পুরাণো পচা গলা সংস্কার ও প্রবৃত্তির সব চেয়ে নিরাপদ আশ্রয়, সভ্যতাকে ব্যর্থ করার সব চেয়ে বড় অজুহাত! এ আঘাত কি মানুষ ভুলতে পারবে?

মাঝে মাঝে ষ্টেশনে গাড়ী থামছিল। বাইরে না তাকালেও বেশ বোঝা যায় এত রাত্রেও ষ্টেশনগুলি মানুষে বোঝাই হয়ে আছে—সকলেই তারা ট্রেণের প্রত্যাশী নয়।

নিরুদ্দেশের যাত্রীরা কিছু কিছু আশ্রয়ের খোঁজে ষ্টেশনে ষ্টেশনে নেমে পড়বে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, তারপর অদৃষ্টে যা থাকে হবে।

প্রত্যেক ষ্টেশনে গাড়ীতে ওঠার জন্য মানুষের কাকুতি মিনতি প্রাণের

মধ্যে বেঁধে। কিন্তু উঠবে কোথায়? ছোট একটা ছেলের দাঁড়াবার মত স্থানও কোন কামরাতে নেই। প্রাণের মায়া ছেড়ে গাড়ীর ছাতের উপরও মানুষ উঠেছে।

হঠাৎ দুটি ষ্টেশনের মাঝামাঝি মাঠের মধ্যে গাড়ীটা থেমে গেল। খানিক পরেই একটা হৈ চৈ গোলমাল শোনা গেল। কয়েকটা গুলির আওয়াজও শোনা গেল। যাত্রীরা নেমে পড়ছিল, চাদরের বাঁধন খুলে পঙ্কজ আর গণেশ নেমে পড়ল।

কি ব্যাপার? গাড়ীতে ডাকাতি হয়ে গেছে। কতগুলি লোহা লক্কর ইঁট পাথর ফেলে রেখে লাইনটা ডাকাতেরা বন্ধ করেছিল, গাড়ী থামতেই একদল লোক মেয়েদের গাড়ীতে উঠে পড়ে। রিভলবার দেখিয়ে মেয়েদের গায়ের গয়ণা কেড়ে নিয়েছে। অন্য কামরায় যাত্রীরা টের পেয়ে হৈ চৈ করে নেমে আসতে আসতে যা লুট করেছিল তাই নিয়ে গুলি ছুড়তে ছুড়তে ডাকাতরা পালিয়ে গেছে। কয়েকজন যাত্রী সাহস করে তাদের পিছু নিয়েছিল, কিন্তু অজানা স্থানে অন্ধকার মাঠ জঙ্গলে বেশীদূর তাড়া করে যেতে পারেনি।

অন্ধকারে ডাকাতেরা সরে পড়েছে।

গাড়ীতে আর্মড গার্ড ছিল। তারা একবার ইঞ্জিনের দিকে একবার গার্ডের গাড়ীর দিকে খুব ছুটোছুটি করেছে দেখা গেল।

ডাকাতদের যে সব যাত্রী তাড়া করে গিয়েছিল, ফিরে আসতে অন্য যাত্রীরা তাদের ঘিরে ধরে। দেখলেই বোঝা যায় কেউ তারা অসাধারণ মানুষ নয়, সাধারণ হিন্দু-মুসলমান, বাঙ্গালী। হাতে সকলের লাঠি পর্য্যন্ত নেই।

মানুষ সত্যি কখনও ভীরু হয় না। পৃথিবীতে যেমন দু'চারটে চোর আছে বলে চোর শব্দটা এসেছে, তেমনি কয়েকটা ভীরু আছে বলে ভীরু

শব্দটা এসেছে! আসলে মানুষ যেমন চোর নয়, ভীরুতাও তেমনি তার ধর্ম নয়।

উত্তেজিত গণেশ বলে, এরা কোন সাহসে ডাকাতের পিছু নিয়েছিল, এঁ্যা? ওদের যে বন্দুক ছিল!

পঙ্কজ বলে, সাহস? এতগুলি মানুষ আছি, এইতো সাহস? ডাকাতরা তবে পালালো কেন? এক গাড়ী লোকের কাছে দু'চারটে বন্দুক কিছুই নয় জানে বলে তো!

আধ ঘন্টা দেরী করে গাড়ী ছাড়ে। তারা তখন নিজের জায়গায় উঠে বসেছে, দুজনে চাদরটা গায়ে জড়িয়েছে। আধ ঘন্টা উঠে হেঁটে বেড়িয়ে হাত পায়ের আড়ষ্ট টন্‌টনে ভাবটা কেটে যাওয়ায় কি আরামটাই যে বোধ হচ্ছিল!

গণেশ বলে, এই ব্যাপার নিয়ে কাল অনেক কাগজে বিষ ছড়াবে।

পঙ্কজ সায় দিয়ে বলে, তাই তো মুস্কিল। চোর-ডাকাত যে শুধু চোর-ডাকাত, শুধু অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে, এটা লোকে ভুলে গেছে।

গণেশ অনুযোগের সুরে বলে, লোকের কি দোষ? যাদের তারা বিশ্বাস করবে তারাই যদি মাথা গুলিয়ে দেয়, লোকে কি করবে? লোকে মিথ্যা চায় না, অন্যায় সহ্য করে না। সত্যের নামে ন্যায়ের নামে তাই না তাদের ভুলাতে হয়!

পঙ্কজ খুসী হয়ে বলে, তোমার বয়সের ছেলেরা যখন এটা বুঝতে শিখেছে তখন আর ভাবনা নেই। লোকে আর বেশীদিন ভাঁওতায় ভুলবে না। এ দেশের লোকের বিশ্বাসটা জোরালো, সহজে অবিশ্বাস করতে চায় না। তাই এত দুর্ভোগ। কিন্তু এবার দায়ে পড়ে বিচার করতে শিখছে।

ম্লান গম্ভীর মুখে গণেশ নীরবে সায় দেয়। এই অবস্থায়, নিজেরা

যখন উৎখাত হয়ে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, তখন এই বয়সের একটি ছেলের এই রকম সুস্থ বিচার শক্তি পঙ্কজকে অভিভূত করে দেয়। পথে পাওয়া অসমবয়সী বন্ধুটিকে আরেকটু কাছে টানতে চেয়ে সে হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে যায়। আচমকা থেমে গিয়ে বোকার মত চেয়ে থাকে। দেখা যায় গণেশের মুখ আরক্ত হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে সে হাতটি গলা থেকে খুলে দেয়।

ধীরে ধীরে পঙ্কজের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, সহানুভূতির সঙ্গে জোর দিয়ে বলে, তাতে কি হয়েছে? ঠিক করেছ।

গণেশ চোখ তুলে চেয়ে হাসে।

পঙ্কজ সহজ ভাবে মৃদুস্বরে বলে, চুল কাটতে মায়া হয়নি গণেশ?

—হয়েছিল। কি করব?

গণেশ আবার একটু হাসে।

বিছানার উপরে বসে রাতারাতি গণেশের সঙ্গে পঙ্কজের বন্ধুত্ব হয়েছিল। ওদিকে মেয়েদের কোণায় পাশাপাশি না বসেও গণেশের মা আর সুভাগিনীরও যে ভাব হয়ে গেছে জানা ছিল না। পরদিন শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমে টের পাওয়া গেল।

গণেশের মা নেমেই গণেশকে বলে, ইনি বলছেন, আমাদের যখন থাবার যায়গা নেই, এঁদের সঙ্গে যেতে। দু'একদিন এঁদের বাড়ী থেকে একটা ঘর খুঁজে উঠে যাব। সুবিধা হলে এদের বাড়ীতেও ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে পারি।

পঙ্কজ বাক্যহারা হয়ে তার কথা শোনে। জগৎ সংসারে এত কাণ্ড ঘটে গেল, এরা এখনো এদের পুরাণো ধারণার জগতে রয়ে গেছে!

এখনো যেন আগেকার যুগ রয়ে গেছে, যখন বিরাট কলকাতা সহরের অসংখ্য বাড়ীর তুলনায় বাসিন্দার সংখ্যা কম ছিল, তিরিশ চল্লিশ টাকায় কেউ দোতালা বাড়ী ভাড়া নিলে বাড়ীওলা পুলকিত হয়ে ভাবত তার কপাল বড় ভাল!

কেউ কিছু বলার আগেই গণেশ বলে, তাই কি হয় মা? এঁদের কত অসুবিধা হবে।

কিন্তু সকলের মত সেও খুব ভড়কে গিয়েছে বোঝা যায়।

ভড়কে যাবার কথাই। ষ্টেশনের চারিদিকে একবার চোখ বুলোলেই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম করবে সেটা আশ্চর্য্য নয়। কোথাও কোনদিকে তিল ধারণের স্থান নেই। এত যে ভিড় হয়েছে ষ্টেশনের ঢাকা অঙ্গনের নীচে সেটা ট্রেণে যাবার যাত্রীর ভিড় যে নয় সহজেই বোঝা যায়। তাদেরি মত অনেকগুলি পরিবার ষ্টেশনে বাসা বেঁধেছে—ভদ্র এবং চাষী পরিবার!

এক একটি পরিবারের ভাগ্যে কয়েক হাত মাত্র যায়গা জুটেছে, তারই মধ্যে মাদুর পাটি বিছিয়ে হাঁড়িকুঁড়ি বাক্স পেঁটরা মালপত্র নিয়ে সকলে দিন রাত্রি কাটাচ্ছে! মেয়েদের কোন আবরু নেই, একেবারে খোলা যায়গায় এত লোকের মধ্যে তাদের চব্বিশ ঘণ্টা কাটছে। কোন কোন পরিবারের আস্তানার দিকে তাকালেই বেশ টের পাওয়া যায় যে দু'চারদিন এখানে মাথা গুঁজে তাদেব কাটে নি, কিছুকাল এখানে এই অবস্থায় বসবাস চলছে। এর মধ্যে রোগী যে কত চারিদিকে শুধু একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই টের পাওয়া যায়। কেউ জ্বরে ধুঁকছে, কেউ চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে, অসুস্থ ছেলে কোলে কোন মা বিরস মুখে বসে আছে, কেউ হাওয়া করছে রোগীর মাথায়। মনে হয় একটা হাসপাতাল যেন গড়ে তুলেছে জগতের পরিত্যক্ত জীবেরা—ষ্টিমারের ডেকের মত

সে হাসপাতালে অভাব শুধু স্থানের এবং ডাক্তার নার্স ওষুধপত্র এবং চিকিৎসার ব্যবস্থার! আর সবই আছে, নোংরামি, অব্যবস্থা বিশৃঙ্খলা!

বিশ্রী একটা দুর্গন্ধে বাতাস ভরাট হয়ে আছে। মানুষ পচেও বুঝি এমন কটু দুর্গন্ধ ওঠে না, মনুষ্যত্ব পচে গিয়ে গন্ধ ছাড়ছে।

মুখগুলিতে অসহায় বিপন্ন ভাবের সঙ্গে একটা অদ্ভুত কাঠিন্য—প্রত্যেকের মুখ যেন তাতে একটু লম্বাটে দেখাচ্ছে। অবস্থার ফেরে একান্ত নিরুপায় হয়ে কোনদিকে আশার আলো দেখতে না পেলে মরিয়া মানুষের মুখের চেহারা যেমন রুক্ষ কঠিন হয়ে ওঠে—যার মধ্যে শুধু একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত! শেষ পর্য্যন্ত লড়তে হবে, লড়াই করে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই, সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত লড়তে হবে।

প্রতিমা হঠাৎ মন্তব্য করে, জ্যাঠামশাই ষ্টেশনেও আসেন নি।

পঙ্কজ হেসে বলে, কেন আসবেন? আমাকেই ত প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। যা না করলে চলে সে কাজ তিনি কখনো কারো খাতিরে করেন না।

সুভাগিনী বলে, এরা তবে আমাদের সঙ্গেই চলুক?

মহেশ্বর বলে, চলুক।

গণেশ বলে, এক কাজ করা যাক। আমরা কাকার ওখানে উঠব ভাবছি, সবাই আমরা ওদিক দিয়ে একটু ঘুরে যাই আসুন। কাকা লিখেছেন জায়গা নেই—যায়গা যদি সত্যি না পাই তবে আপনাদের সঙ্গে চলে যাব। আপনারাও প্রথম আসছেন, কত হৈ চৈ হাঙ্গামা। আমরা গেলে আরও হাঙ্গামা বাড়বে।

পঙ্কজ তার কথায় সায় দিয়ে বলে, সেটা মন্দ হয় না।

প্রতিমা বলে, তাই করা যাক। তুমি কি বল দাদা?

সাধন বলে, এ ব্যবস্থা মন্দ কি!

তারা গাড়ী যোগাড়ের চেষ্টা করছে, ভারিক্কি :ভদ্র চেহারার একটি লোক কোথা থেকে এসে দাঁড়ায়। ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, সরু পাকানো গোঁপ, লাইমজুস দিয়ে পালিশ করা চকচকে চুল।

আপনাদের বাড়ীর দরকার?

গণেশ সাগ্রহে বলে, আপনার জানা আছে নাকি বাড়ীর খবর?

ভদ্রলোক হেসে বলে, আমার হাতেই আছে।

তার দু'হাতের আঙ্গুলে গোটা পাঁচেক আংটি। এরকম যার হাত তার হাতে বাড়ী থাকা আশ্চর্য্য নয়। তবে কিনা, কলকাতার সাংঘাতিক বাড়ী সমস্যার গুজব তাদের কাছেও পৌচেছিল। ভদ্রলোকের প্রস্তাব শুনে তারা খানিকটা থ' বনে যায়। বাড়ীর জন্য ভাড়াটের খোঁজে মানুষকে যদি এভাবে ষ্টেসনে এসে ধন্না ।দতে হয় তাহ'লে কলকাতায় বাড়ীর দুর্ভিক্ষটা তো মোটেই সত্য হ'তে পারে না।

: আপনারি বাড়ী?

: আজ্ঞে হ্যাঁ, বাড়ীটি অধীনের। আমাদেরও আদি নিবাস পুর্ব্ববঙ্গে, পিতাঠাকুর ব্যবসা করতে কলকাতা আসেন। শেষ জীবনে তিনিই বাড়ীটি করে যান। ওপরে নীচে খান দশেক কোঠা—আমরা স্বামী-স্ত্রী আর একটি ছেলে, মোট এই তিনটি প্রাণী, আদ্দেক কোঠা কোন কাজেই লাগত না। তবু ভাড়া দেবার কথা কখনো ভাবিনি মশাই! কাজ কি? বাবা যথেষ্ট রেখে গেছেন, ভগবানের দয়ায় আমারও রোজগার কম নয়, কটা টাকার লোভ করে দরকার কি আমার? না কি বলেন?

মহেশ্বর সায় দিয়ে বলে, সে তো বটেই!

ভদ্রলোকের গলা এবার ভারি শোনায়। বলে, কিন্তু আপনাদের মত হাজার হাজার দেশের মানুষ এসে বাড়ীর জন্য কি দুর্দ্দশা ভোগ করছেন জানার পর মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম কি, এ বড় স্বার্থপরের মত কাজ হচ্ছে। এতগুলো ঘর আমার পড়ে থাকবে আর আমার দেশের লোক স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে ফুটপাতে দিন কাটাবে? সবাইকে না পারি দুটি তিনটি পরিবারকেও তো বাড়ীতে আমার জায়গা দিতে পারব! নিজেরা তাই দুটি মাত্র ঘর নিয়ে অন্যগুলি ভাড়া দিচ্ছি। কাল একটি পরিবারকে দু'খান ঘর ভাড়া দিয়েছি। আপনারা যদি চান, বাকী চারখানা ঘর নিতে পারেন।

ভাড়া কত? আর সেলামী—

রাম রাম রাম! সেলামী কি মশাই? এক পয়সা সেলামী নেব না। শুধু ছ'মাসের ভাড়াটা আগাম দেবেন। ভাড়া খুব কম করেছি—আমার তো ব্যবসা নয় বাড়ী ভাড়া দেওয়া! চারখানা ঘর আশী টাকা মাসে। বড় বড় ঘর, ইচ্ছে করলে দেড়শো টাকায় ভাড়াটে বসাতে পারি।

গণেশের ভাব দেখে মনে হয়, সত্যিই বুঝি ভাগ্যে তাদের সিকে ছিঁড়ে স্বর্গ জুটেছে! গণেশের মা এ পর্য্যন্ত কোন কথা বলেনি, এবার থাকতে না পেরে সোজাসুজি জানায়, বেশ তো, আপনাদের বাড়ী আমরা নেব।

কিন্তু দেখা যায় চারখানা বড় বড় ঘরওলা স্বর্গ অত সহজে মুখের কথায় জোটে না! ছ'মাসের ভাড়া ভদ্রলোককে হাতে হাতে দিতে হবে, এইখানে দিতে হবে—নগদ চারশ' আশী টাকা!

একথা শুনলে মানুষের মনে সন্দেহ জাগে বৈ কি!

বাড়ীটা একবার চোখে না দেখে—

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বলে, ভাবছেন, কে জানে লোকটা কলকাতার চোর না জোচ্চোর, টাকা হাতে পেয়ে যদি পালায়! তা কথাটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। এ কলকাতা সহরে কতরকম জোচ্চুরি যে চলে তার হিসেব হয় না। তবে আসল কথাটা শুনুন বলি।

ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে দামী একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, বাড়ী ভাড়া নিয়ে যে আইন হয়েছে জানেন তো? বাড়ীতে যদি ভাড়াটে একবার ঢোকে, কারো সাধ্যি নেই আর তাকে বার করে! বাড়ীতে ঢুকে জেঁকে বসে আপনারা যদি গোলমাল করেন আমি কোথায় যাব?

: বাড়ীটা শুধু একবার চোখে চেখে—

ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বলে, নিশ্চয়, নিশ্চয়! বাড়ী দেখাব বৈকি। কিন্তু ওই যে বললাম, ভেতরে ঢুকতে পাবেন না। বাইরে থেকে দেখে দু'মাসের ভাড়াটা দিয়ে তবে ভেতরে যাবেন। এটুকু মশায় আমার দিকের প্রোটেকৃশন! তা বাইরে থেকে দেখেই বাড়ী আপনাদের পছন্দ হয়ে যাবে। লেন দেনটা এখানে চুকিয়ে নিতে চেয়েছিলাম কেন জানেন? বাড়ীর দরজায় গিয়ে দাঁড়াবেন, ভেতরে ঢুকতে পারবেন না, সে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয় তো! তা আপনারা যখন তাই চাচ্ছেন তখন আর কথা কি?

ইতিমধ্যে একটি লম্বা কালো চশমা পরা যুবক এসে লোকটির পিছনে দাঁড়িয়ে এদের সঙ্গে তার আলাপ শুনছিল।

এবার সে আচমকা সামনে এগিয়ে গিয়ে বলে, তা এটা আপনার যুক্তিসঙ্গত কথা। চলুন আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।

ভদ্রলোকের মুখটা যেন একটু কেমন হয়ে যায় হঠাৎ!

: আপনি কে?

আমি একজন ভলান্টিয়ার।

বলতে বলতে যুবকটি পকেট থেকে একটা ব্যাজ বার করে পিন দিয়ে সার্টের বুক পকেটে এঁটে দেয়।

দেখে ভদ্রলোকটি উদাসভাবে সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, আচ্ছা আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমার গাড়ীটা নিয়ে আসি।

সেই যে গাড়ী আনতে যায়, আর তার পাত্তা মেলে না! পাঁচ সাত মিনিট পরে নবাগত যুবকটি বলে, ওর জন্য অপেক্ষা করে আর লাভ নেই। ও আর ফিরছে না।

গণেশের মা বলে, মাগো, এমন সব কারবার এখানে!

মহেশ্বর নিঃশ্বাস ফেলে বলে, যারা ঘরবাড়ী ছেড়ে নিরাশ্রয় হয়ে এসেছে তাদেরও মানুষ ঘাড় ভাঙ্গে?

ভলান্টিয়ার ছেলেটি বলে, ঘাড়-ভাঙ্গা সমাজে এতো হবেই। দুর্ভিক্ষে যখন লাখ লাখ মানুষ মরছিল তখন চালের কারবারে কত লোক লাখপতি হয়েছে বলুন তো?

বলতে বলতে ছেলেটি একজন বুড়োর দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়।

বুড়ো বলে বুড়ো, বয়স বুঝি তার একশ'র কাছে গেছে। ছেঁড়া একটা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখ উঁচু করে সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টি যে তার ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে, অপরিচিত এই জগত যে আবছা অস্পষ্ট একটা অদ্ভুত রহস্যের মত ঠেকছে তার কাছে, নড়বড়ে ঘাড়ে বসানো মাথাটা সঞ্চালন করা দেখেই তা বোঝা যায়। শণের মত পাকা চুলগুলিও তার অধিকাংশ ঝরে গেছে।

এই মানুষটা কি একা এসেছে দেশবাড়ী আশ্রয় ছেড়ে? না, তাও কি সম্ভব! একটি বৌ এক হাতে একটি শিশু বুকে চেপে ধরে অন্য হাতে

টিনের একটা রঙ্‌চটা তোরঙ্গের পাশে কাঁথা বিছিয়ে শয্যা রচনা করছিল, তার কপালে মস্ত সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর লেপা! বুকের শিশুটিকে কাঁথায় শুইয়ে দিয়ে সে বুড়োর পাশে এসে দাঁড়ায়, ভলান্টিয়ার ছেলেটিকে বলে, উনি তো কানে শুনতে পান না।

ছেলেটি বুড়োকে জিজ্ঞেস করছিল, সে কোথায় যাবে, কি করবে, কোন সাহায্যের দরকার আছে কি না। বুড়ো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল তার মুখের দিকে!

কাঁথায় শোয়ানো শিশুটির দিকে চেয়ে পঙ্কজ শিউরে উঠে। এক মাসও বোধ হয় বয়স হবে না। সে যে কি রোগা আর আকারে কতটুকু, না দেখলে কল্পনা করা যায় না। কাঁদছে—আওয়াজ নেই। মুখের কাছে কান নিয়ে গেলে বোধ হয় কান্না শোনা যাবে। একদিকে এই বুড়ো, অন্যদিকে ওই শিশু। এই সম্বল নিয়ে একা বৌটি বেরিয়েছে নূতন আশ্রয়, নূতন জীবনের সন্ধানে!

চেয়ে ত্মাখে, গণেশ একদৃষ্টে বৌটির মুখের দিকে চেয়ে আছে।

গণেশের কাকার নাম ঘনশ্যাম বাবু, বাড়ী শ্যামবাজারের দিকে একটা ছোট রাস্তার মধ্যে। ছ্যাকড়া গাড়ী বাড়ীর সামনে দাঁড়াতে দেখা গেল বাড়ীটা বড় ও তিনতলা। দেখে সকলের ভরসা হল।

আশে পাশে কয়েকটা বাড়ীতে রেডিও বাজছিল, কিছু তফাতে একটা বাড়ীতে আবার চলেছে গান শেখাবার ক্লাশ। সঙ্গীতে আর সঙ্গতে সমস্ত পাড়াটা যেন গম গম করছে। সুস্থ লোকের মাথা ধরে যাবার কথা। যাদের মাথা ধরাই থাকে তাদের মাথা ধরা সারে কিনা অবশ্য বলা যায় না।

গাড়ী থেকে দেখা গিয়েছিল বাড়ীর সদর দরজা খোলা। নেমে

দেখা গেল ইতিমধ্যে কে যেন গাড়ী দাঁড়াতে দেখে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে।

খানিক ডাকাডাকির পর স্বয়ং ঘনশ্যাম নেমে এসে দরজা খুলল। গণেশদের সাদরে অভ্যর্থনা জানাবার কোন লক্ষণই কিন্তু তার ব্যবহারে দেখা গেল না। বাইরে এসে দাঁড়িয়ে পিছনে হাত বাড়িয়ে দরজাটি আবার সে ভেজিয়ে দিল।

ঃ এর মানে কি? এমনভাবে হঠাৎ এলে যে তোমরা?

গণেশ বলে, সাত আটদিন আগে তো একটা চিঠি দিয়েছি কাকা?

ঘনশ্যাম বলে, তোমরা চিঠি দিলেই হল? সে চিঠির জবাবে আমি যে চিঠি দিলাম তোমাদের আসতে বারণ করে, সে চিঠি বুঝি বাতিল হয়ে গেল যেহেতু তোমরা আসবে বলে চিঠি দিয়েছিলে?

কি রাগ ঘনশ্যামের! তার রাগ দেখে গণেশ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে, তার মুখে কথা যোগায় না। গণেশের মা এক পা এগিয়ে এসে বলে, এ তো চিঠিপত্রের ব্যাপার নয় ঠাকুরপো, বাঁচন মরণ নিয়ে কথা। আমরা থাকতে আসি নি, শুধু কয়েকটা দিন আশ্রয় নেব—যদ্দিন না একটা ঠাঁই খুঁজে পাই।

ঘনশ্যাম বলে, কয়েকটা দিন? একবেলা থাকার যায়গা নেই, কয়েকটা দিন? এ বাড়ীতে উঠবার যদি সাধ ছিল, এত দেরী না করে কিছুকাল আগে এলেই হত! আত্মীয় স্বজন কি একবিন্দু যায়গা খালি রেখেছে ভেবেছেন? সব দখল করে নিয়েছে। বাইরের লোককে ভাড়া দিলে কত টাকা ভাড়া পেতাম। ধনে প্রাণে মারা গেলাম আত্মীয় স্বজনের জন্য!

গণেশের মা বলে, আমরাও নয় ভাড়া দেব, যদ্দিন থাকি।

ঘনশ্যাম হঠাৎ অট্টহাস্য করে ওঠে!—ভাড়া দেবেন? বেশ তো, বেশ তো, দেখুন না চেষ্টা করে একটা ঘর দখল করতে পারেন নাকি!

চিলেকুটি পর্য্যন্ত বেদখল হয়ে আছে। আমার বড় শালার শ্বশুর মশায় দোতলার বাথরুমটি নিয়েছেন। আসুন, পারেন তো দখল করুন ঘর।

বলে সত্য সত্যই দরজা খুলে ঘনশ্যাম সরে দাঁড়ায়। দেখা যায় প্যাসেজে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে জন ত্রিশেক মেয়ে পুরুষ! মেয়েদের সংখ্যাই বেশী।

গণেশের মা অনেককেই চিনতে পারে, মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়ে নাম ধরে সম্পর্ক ধরে একে ওকে তাকে ডেকে বলে, তুমিও এখানে আছ? অমুক কই? কেমন আছে?

বলতে বলতে গণেশের মা এগিয়ে যায়, কিন্তু তারা কেউ একচুল নড়ে না, বাড়ীতে ঢুকবার প্যাসেজ ব্যারিকেড করে দাঁড়িয়ে থাকে!

একজন প্রৌঢ়া বিধবা বলে, এ বাড়ীতে কোথায় উঠবে গণেশের মা? তিল ধারণের যায়গা নেই। আমরাই বলে যে কষ্টে আছি।

গণেশের মা বলে, তা হলে উঠব কেন পিসী? এ বেলাটা বিশ্রাম করি, ওবেলা কোথাও চলে যাব।

পিসী বলে, কোথা যাবে? যাওয়ার যায়গা আছে এ সহরে? ভেতরে একবার ঢুকলে বাছা তোমরা আর নড়বে না, নড়তে পারলে তো নড়বে? আমাদের শোয়া বসা নড়াচড়ার যায়গা নেই, তোমরা এতগুলি লোক ঢুকলে কেউ আর বাঁচবে না।

ঘনশ্যাম আবার অট্টহাস্য করে ওঠে।

গণেশের মা হতভম্ব হয়ে বলে, দুয়ার থেকে ফিরে যাব ঠাকুরপো? বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না, দুদণ্ড বসতে দেবে না?

ঘনশ্যাম বলে, আমি কি করব? দেখছেন তো অবস্থা, নিজের বাড়ীতে কোণঠাসা হয়ে আছি।

সুভাগিনী বলে, চলেন চলেন, আমাদের বাড়ীতে চলেন। কি দরকার এদের অত তোষামোদ করার?

চার

বিধুভূষণ মানুষটা খুব চাগা আর হিসাবী।

বাড়ীর যে দর সে দিয়েছে, পরমেশ্বর যে কোন কথা না বলে সেটাই মেনে নিয়েছে তার কারণ সে জানে। দেশ ভাগ হওয়ায় যারা ভিটে ছেড়ে আসছে তাদের প্রথম ঝোঁকটাই হয় নতুন ভিটে সংগ্রহ করার—একটি নিজের বাড়ী করার।

পরমেশ্বর প্রায় একযুগ নীচের তলাটা ভাড়া নিয়ে আছে—একা একজন মানুষের জন্য এতগুলি ঘর! একটি মস্ত পরিবার অনায়াসে থাকতে পারে। পরমেশ্বর ভাড়া দিয়ে এসেছে নিয়মিত, ভাড়া বাড়াতে চাইলে বিনা আপত্তিতে মেনে নিয়েছে। বিধুভূষণের নিজের কোন ক্ষতি নেই, বরং লাভই হয়েছে এরকম একজন ভাড়াটে পাওয়ায়, অন্য মানুষ হলে এভাবে নানা অজুহাতে ভাড়া বাড়াবার সুযোগ তাকে দিত না,—তবু পরমেশ্বরের বেহিসাবি চালচলনে গা-টা বরাবর জালা করেছে বিধুভূষণের!

টাকা উড়িয়ে নষ্ট করলে বরং অন্য কথা ছিল,—বিধুভূষণের হিসাবে ওভাবে খরচ করলেও টাকাটা অন্তত ভোগে লাগে।

অকারণে বিনা প্রয়োজনে টাকা খরচ করার মানে বোঝে না বিধুভূষণ।

সে কৃপণ নয়, সকলের ষ্টাইলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখতেই সে যথেষ্ট টাকা খরচ করে। দামী আসবাব কিনে ঘর সাজানো বা মেয়ে বৌকে ভাল শাড়ী কিনে দেওয়া তার কাছেই মোটেই বেহিসাবী খরচ নয়। কিন্তু নিজেদের কোন দরকার না থাকলেও একতলাটা যদি সে ভাড়া না দিত—সেটা হত তার কাছে বেহিসাবী অপচয়। ঠিক এই হিসাবে ঘর

খালি ফেলে রাখার জন্য সমস্ত একতলাটা পরমেশ্বরের ভাড়া করা তার কাছে নিছক টাকা নষ্ট করা—বোকামি !

পরমেশ্বরকে সে বলে, সাব-টেনাণ্ট বসিয়ে কিছুটা ভাড়া তুলে নিতে পারেন অনায়াসে।

পরমেশ্বর হেসে বলে, তা হলে তো একখানা ঘর ভাড়া নিয়েই থাকতে পারি ! সংসার নেই, নেশা করি না, নিজের মনে একটু আরামে থাকব না ?

আরাম ! কে জানে এ কি রকম আরাম ? বিধুভূষণের মাথায় ঢোকে না !

অনেক কিছুই অবশ্য মাথায় ঢোকে না বিধুভূষণের। কারণ সে ধরে শুধু তার নিজের হিসাব, পরমেশ্বরের দিকটা বিবেচনা করে না। একটা মানুষ বিষয়সম্পত্তি সব কিছু ভাইকে ছেড়ে দিয়ে আত্মীয়স্বজনকে পরিহার করে একা এভাবে জীবন কাটায়, তাকে গৃহীও বলা যায় না সন্ন্যাসীও বলা যায় না, সে ভোগীও নয় ত্যাগীও নয় : সহজ সাধারণ মানুষ হলেও শুধু দশজনের মত নয় বলেই জীবনটা তার অসাধারণ।

তার বেলা একটু অন্যরকম হিসাব ধরতে হবে বৈকি !

বিধুভূষণ তাই ধারণাও করতে পারে না যে নিরীহ আপনভোলা মানুষ বলে বা ঝন্‌ঝাট এড়াবার খেয়ালে পরমেশ্বর তার বেশী ভাড়ার দাবী মেনে নেয় নি মোটেই, তার ছেলেমেয়েদের জন্য ওটা নিছক তার উদারতা।

এ উদারতার মানে বোঝা তার পক্ষে কঠিন। কারণ, তার ছেলে মেয়েদের জন্য স্নেহমমতার কোন পরিচয়ই পরমেশ্বর কোনদিন দেয় নি।

তবে তার সম্পর্কে সমীরের যে অসীম কৌতুহল আছে সেটা পরমেশ্বর হাসিমুখেই প্রশ্রয় দিয়ে চলে।

অনেক অসঙ্গত ব্যক্তিগত প্রশ্নও বরদাস্ত করে যায়।

প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে সমীর তাকে এমন প্রশ্নও করে বসেছিল যে প্রথম জীবনে কোন ব্যর্থ প্রেমের ব্যাপার ঘটার ফলে কি সে এরকম উদাসীন হয়ে আছে?

: আমি কি উদাসীন? আমার মত আয়াস-প্রিয় লোক কটা আছে?

: তবু, বিয়ে করলেন না, একলা থাকেন—

: সে তো আমি আরামে থাকতে ভালবাসি বলে! ব্যর্থ প্রেমের জন্ম সব ত্যাগ করে থাকলে কি এরকম আনন্দে থাকতে পারতাম?

সমীর আমত আমতা করে বলেছিল, মানে, আপনি ভুলতে পারেন না, ভুলতে চানও না। স্মৃতি নিয়েই আপনি আনন্দে থাকেন।

পরমেশ্বর হেসে বলেছিল, একটি মেয়েকে ভালবাসলে তাকে ভোলা না যেতে পারে, কিন্তু তার স্মৃতিটা অবলম্বন করে মানুষ আনন্দে জীবন কাটায় কি করে হে? ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতিতে আনন্দ আছে না কি?

: কিন্তু—

: তোমার মন মানতে চাইছে না, কেমন? তুমি মানে বুঝতে পারছ না। বড় একটা কোন আদর্শ থাকত, দেশের কাজ, সমাজ-সংস্কার সেবাব্রত এসব কিছু নিয়ে মেতে থাকতাম—হ্যা, তা হলে একটা মানে বোঝা যেত! একটা কিছু নিয়ে থাকবে তো মানুষ? এ মানুষটা খায়-দায় ঘুমায়, কিছুই করে না। কোনরকম পাগলামি ছাড়া তো মানুষের চলে না, এ মানুষটা কি নিয়ে দিন কাটায়? তোমার রীতিমত ভাবনা হয়েছে এই নিয়ে!

সমীর একটু হাসবার চেষ্টা করেছিল।

পরমেশ্বর বলেছিল, তোমার হিসাবটা ঠিক হচ্ছে না। তুমি নিজের মাপকাঠিতে আমার বিচার করছ! তুমি যা দামী মনে কর, তুমি যা চাও, আমি তা চাইনা কেন—ইচ্ছা করলেই পেতে পারি অথচ আমার দরকার হয় নয় না কেন ওসবের? তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তোমাতে আমাতে অনেক তফাৎ! তুমি জীবনে একরকম সুখ চাও—আমি আরেকরকম সুখ চাই। চাওয়ার দিক দিয়ে আমরা কেউ কম চাই না, তফাৎ শুধু কি চাই তাতে। তুমি বড় হতে চাও, টাকা চাও, বৌ চাও প্রেম চাও, প্রতিষ্ঠা চাও, হৈ চৈ উত্তেজনা ভরা জমজমাট জীবন চাও। আমি চাই নিজের ভাবে বিভোর হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে।

: নিজের ভাবে?

: তবে কি? এও তো আমার একটা পাগলামি,—এই পাগলামি নিয়ে আমি আছি! এরকম পাগলামি সকলের আসে না—কিন্তু সেটা হল আলাদা কথা। তুমি টাকা-পাগল, দেশ-পাগল, ধর্ম-পাগল, জ্ঞান-পাগল, কর্ম-পাগল, নির্বান-পাগল, কাম-পাগল—অনেক রকম পাগল দেখেছ। আমার মত আনন্দ-পাগল দ্যাখোনি, তাই তোমায় খটকা লাগে।

: আপনি এরকম হলেন কেন?

: কেন হলাম? দেখলাম যে এরকম হওয়াই আমার পক্ষে সবচেয়ে সহজ আর সুবিধাজনক!

সমীর তবু ছাড়ে নি।

: জীবনটা সহজ হলেই কি—?

: না, সবার পক্ষে তা নয়। এ জীবন সকলের পোষাবে না।

সংসারের ঝনঝাটে যে পাগল হতে বসেছে—সে একেবারে ডিগবাজী খেয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারে। আমার এই জীবন তার একটা দিনের জন্য পছন্দ হবে না।

সমীর ভেবেচিন্তে বলেছিল, মানুষ তো সামাজিক জীব?

: নিশ্চয়!

: সমাজকে বাদ দিয়ে আপনি আনন্দ পান কি করে?

: সমাজকে বাদ দিলাম কই? তা হলে তো সন্ন্যাসী হয়ে বনে যেতাম। আমি সামাজিক জীবন যাপন করছি। ব্যক্তিগত জীবনটা আমার যেমন হোক—সমাজে যেভাবে চলা উচিত আমি সেইভাবে চলছি।

সমীর নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, আমি কত কি করব ভাবি—মাঝে মাঝে মাথা ঘুরে যায়!

পরমেশ্বর হাসে নি।

: তাতো যাবেই। অনেকের মাথা বিগড়ে যায়, তোমার তো শুধু ঘুরে যাওয়া।

আরেক দিন সমীর বলেছিল, আপনি এত বোঝেন, কিন্তু কখনো আমাকে কোন পরামর্শ বা উপদেশ দেন না।

পরমেশ্বর হাসি মুখে তার ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ মুখের ভাব খানিকক্ষণ লক্ষ্য করেছিল।

: পরামর্শ বা উপদেশ কেন দেব? তুমি আমার কে?

: চেনাশোনা তো আছে?

: তাতে কি? পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যা—শাস্ত্রের উপদেশ। এ উপদেশ নিজে মানি নি। পরের ছেলে তোমাকে উপদেশ দিতে যাব কিসের গরজে?

: আপনি কি চান না আমি বড় হই?

: বড় হবে তুমি—সেটা চাইবেও তুমি। আমি কেন তোমার ঝন্‌ঝাট যেচে নেব? তবে কোন বিষয়ে পরামর্শ করতে চাও—যখন ইচ্ছা এসে পরামর্শ করে যেতে পার। কিন্তু কোন দায়িত্ব আমি নেব না। আমার মতামত শুনতে চাও শুনিয়ে দেব। কিন্তু পরে এসে বলতে পাবে না যে আপনার কথা শুনে আমার এই হল কিম্বা এই হল না।

: আপনি আশ্চর্য্য মানুষ।

পদ্মারও মাঝে মাঝে ঝোঁক আসে এই নিঃসঙ্গ নির্বিরোধী সদানন্দ মানুষটাকে জয় করতে।

অন্যভাবে নয়। সাধারণভাবে।

একটু দরদ দেখালে, নির্জন ঘরে নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে তার সঙ্গে গল্প করলে, নিজের সুখ দুঃখের কথা বললে, একটু সেবা করলে—পরমেশ্বরের মত মানুষ যেন খুসী হয়।

কিছুতেই বাগ মানাতে না পেরে প্রচণ্ড বিরাগের মধ্যে তার ঝোঁকটা কেটে যায়।

ভাল করে সে কথা পর্য্যন্ত বলে না তার সঙ্গে। দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ফ্রক পরা অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তার নতুন কায়দায় শাড়ী পরে কলেজ যাওয়ার অবস্থায় পরিবর্তিত হবার প্রক্রিয়াটা পরমেশ্বর যে দেখে এসেছে, এটা তার খেয়াল থাকে না!

শাড়ী পরতে শেখার প্রথম দিকে, নিজেকে নারীত্বের প্রতিনিধি মনে করার ঝোঁক যখন মেয়েদের আসে—একবার সে এক কাণ্ড করেছিল।

তার সাধ হয়েছিল, পরমেশ্বরকে সে জব্দ করবে।

এমন জব্দ করবে যাতে চিরদিন ছি ছি বলার অধিকার তার জন্মে যায়।

ছুটির দিন দুপুর বেলা পাতলা একটা শাড়ীতে আলুথালু বেশ করে সে গিয়ে হাজির হয়েছিল পরমেশ্বরের ঘরে।

বলেছিল, কি করছেন? একটু গল্পটল্প করতে এলাম।

সে ভেবেছিল, পরমেশ্বর নিশ্চয় তাকে দেখে নিজেকে সামলাতে পারবে না। নভেল পড়ে পড়ে আর সিনেমা দেখে দেখে তার ধারণা হয়েছিল নিজের বাপ ভাই ছাড়া এ জগতে কোন বয়সের এমন পুরুষ থাকা অসম্ভব, নির্জন দুপুরে তাকে এভাবে যেচে ঘরে আসতে দেখে যার পক্ষে আত্ম সম্বরণ করা সম্ভব।

পরমেশ্বর বলেছিল, এসো মা এসো! আমার মা জননী এসো। আজকে বুঝি মার মনে পড়ল ছেলে একলাটি আছে, তার সাথে দুটো কথাবার্ত্তা বলে আসতে হবে?

এমন জব্দ পদ্মা আর হয় নি।

সেই থেকে তার নভেল সিনামার বাঁকা শিক্ষায় একচেটিয়া প্রভাবে এসেছিল একটু বিচার বিবেচনা করে চলার সুবুদ্ধি!

মহেশ্বরের পরিবার শুধু নয়, গণেশরা পর্য্যন্ত এসে একটা ঘর দখল করে বসায় মনে হল এতদিনে বুঝি একাকীত্বের অবসান হয়েছে পরমেশ্বরের, তার জীবন ভরে উঠেছে আত্মীয়তাকে স্বীকৃতি দানে।

আপনজনের দায়িত্ব গ্রহণে!

সমীর বলে, আপনি তবে আপন পর হিসাব করেন?

পরমেশ্বর হেসে বলে, করি বৈকি। চিরদিন করে এসেছি।

: কি রকম?

: রকম তুমি বুঝবে না। সর্ব্ব ঘটে সমান জ্ঞান তুমি কবে আমার দেখলে যে আপন পর ভেদ করি দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছ? এ আমার আপন,

এ আমার পর দেখিয়ে সব সময় হৈ চৈ করি না বলে কি আমার আপন পর থাকবে না !

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করে, বাড়ীটা সত্যিই আপনি কিনবেন তো ঈশ্বর বাবু ?

: আমার ভাই কিনবে। জলের দরে সব বেচে এলেও আপনার বাড়ীটা কিনতে পারবে। তারপর দেখা যাবে কি হয়।

অনেক বিষয়ে মহেশ্বরের পরিবারটি অত্যন্ত রক্ষণশীল। তারা অনেক সংস্কারের বোঝা বয়, অনেক পুরাণো চাল-চলন আঁকড়ে থাকে।

গণেশ শাড়ী পরেছিল এ বাড়ীতে এসে রাত্রে শুতে যাবার সময়।

পরদিন পঙ্কজ এসে তাকে দেখে হেসে বলেছিল, গণেশ এবার কি হলেন ?

: সবিতা হলেন।

গণেশের মা মানদা বলে, আর বলো কেন বাবা। দু'টি বয়স্থা মেয়ে নিয়ে পড়লাম বিপাকে—কি করি, কোথা যাই। মেয়ে আমার কচকচ করে মাথায় চুলগুলি কেটে ফেলল ! বাপ মরেছে কবে, তার পুরাণো কোটটা গায়ে চাপাল। শাড়ীর পাড় ছিঁড়ে ধুতি করে পরল। বলল, মা, আমি তোমার ছেলে। চুলগুলি গেল এই যা আপশোষ।

পঙ্কজ সাহস দিয়ে বলে, আজ কাল এরকম চুলও রাখে মেয়েরা।

সবিতা বলে, চার-পাঁচ মাস ধরে জমি জায়গা ঘর-বাড়ী বিক্রী করে টাকার যোগারটা মা-ই করেছিল। আমি শুধু পুরুষ সেজে সঙ্গে এসেছি। ভারি কাজ ! শুধু মেয়েছেলে দেখলে কে কি গোলমাল পাকাবে, এই জন্ম পুরুষ সেজেছিলাম। তা সত্যিই দেখলাম—একটা ছোকরা পুরুষ মানুষেরও অনেক খাতির ! মেয়ে হলে হাসত—পুরুষ সেজে চোটপাট করতে অনেকে ভড়কে গেছে।

মাথার চুলগুলি ছিড়ে ফেলার ভঙ্গি করে বলে, মেয়ে হয়ে জন্মানোই কমারি ! সবিতা না হয়ে সত্যি যদি আমি গণেশ হতাম !

একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে গণেশের মা। বলেছে, আমার এখন যত কম খরচে দিন চালানো যায়। চুমুক চুমুক খেয়ে খেয়ে কলসীর জল ফুরিয়ে যায়। আমার কে আছে রোজগার করবে ?

: দেশে কে রোজগার করত ?

: নিজে করতাম—লোক দিয়ে করাতাম। জমি বিলি করতাম, দুধ বেচতাম, সুপারি বেচতাম,—সব করতাম। এখানে কে আছে আমার জন্য রোজগার করবে ? আমার নিজের রাস্তা আছে রোজগারের ?

সবিতা বলে, আমি পারি।

: থাক্ থাক্। কাম নাই।

পঙ্কজ জানে সবিতার এত যে উৎসাহ নতুন নতুন পথে মেয়ে হয়ে জন্মানার বাধা ডিঙ্গিয়ে নতুন কিছু করার এর উৎস তার অনভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এই অনভিজ্ঞতা তো আরও অনেকের মধ্যেই থাকে—এমন সহজ ভাবে দুঃসাহসী কাজের মধ্যে নিজেদের দুরবস্থার প্রতিকার করার ঝোঁকটাই শুধু সকলের মধ্যে দেখা যায় না।

অভিজ্ঞতা যে এ উৎসাহকে দমিয়ে দেবে, তাকে হতাশায় পাঁকে ডুবিয়ে দেবে এমন কোন কথা নেই।

মনটা শক্ত হলে হয় তো আরও বেশী জোর সে খুঁজে পাবে নিজের মধ্যে, মা আর বোনের দায়িত্ব নেবার জন্য আরও বেশী উৎসাহ বোধ করবে।

একেবারে ভোঁতা হয়ে যাবে না এমন কথাও অবশ্য জোর গলায় বলা চলে না।

সবিতার কাছে সে তার দেশবাড়ী আত্মীয়স্বজনের গল্প শোনে।

বলে রাখে, সংসারের কাজে ফাঁকি দিয়ে আমার বদনাম কোরো না। তোমার মা যেন না ভাবতে পারেন তিনি খেটে মরছেন, আমি তার মেয়েটিকে আটকে রেখেছি। অবসর পেলেই চলে আসবে আমার কাছে।

: আমি কেন আসব? তাও একবার নয়, রোজ রোজ—বার বার!

পঙ্কজ হেসে বলে, কেন আসবে বলছি শোন। আমি আসতে পারি—দশবার ছেড়ে একশোবার। আমার তাতে অপমান হবে না। কিন্তু তোমার কখন কাজ থাকবে কখন থাকবে না জানব কি করে? দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত আপিস,—ছুটির দিন ছাড়া সকালে আর সন্ধ্যায় শুধু কথা বলার সময়। তখন তুমি ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকবে।

সবিতা মুচকে হাসে। গণেশের হাসিটা মনে পড়ে যায় পঙ্কজের।

: আপনি যে কি বলেন তার ঠিক নেই।

: কেন?

: কথাটা বুঝে বলেছেন? সারাদিন করবেন আপিস—আর আমি কখন ফাঁক পাব, কখন যাব, সেজন্য হত্যা দিয়ে সকাল সন্ধ্যা বাড়ীতে বসে থাকবেন?

: তাও তো বটে! তবু তুমি যেও।

সবিতার বাবা ছিল কাপড়ের ছোট কারবারী আর কবি।

কাপড়ের কারবারী, হাটে-বাজারে খুচরো ব্যবসায়ীদের সে কাপড় সরবরাহ করত, সে ছিল কবি!

স্বভাব কবি।

কিন্তু লড়ায়ে কবি।

নাম ছিল গোপেশের। গোপেশ আসরে নামবে শুনলে লোকারণ্য হয়ে যেত।

কত সুন্দর সুন্দর গান যে গোপেশ বেঁধেছিল।

বলতে বলতে গুণ গুণ করে সবিতা গান ধরে দেয়। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় কবিগানের সুরে দেশের অনাচার অত্যাচার অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গান—যেমন তীব্র ব্যঙ্গ তেমনি সুগভীর দরদ।

নীচের তলায় কোণের দিকের ঘরের সামনে বারান্দায় খালি গলায় গান ধরে সবিতা, একে একে বাড়ীর মানুষ এসে হাজির হয় সেখানে।

পাটি পেতে মানদা সকলকে বসতে দেয়।

ঘরের দুয়ারের কোণে হাটু মুড়ে বসে সে মেয়ের মুখে স্বামীর রচিত গান শোনে—দুটি চোখ বন্ধ করে।

পাড়ার কয়েক বাড়ী রেডিও বাজছে—সন্ধ্যার প্রোগ্রামের বাছা বাছা গান।

কি একঘেয়ে হয়ে গেছে মার্কিনী ঢংয়ের প্রাধান্য পাওয়া বাছা বাছা গান আর যন্ত্রসঙ্গীত!

জগতে যেন একটাই রস উপভোগ করতে শিখেছে মানুষ—মিহি মধুর রস।

বেশী মিহি করতে গিয়ে মাঝে মাঝে রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের গানের নামে বিড়াল ছানার কান্নাও শুনতে পাওয়া যায়!

সবিতা গান বন্ধ করলে খানিক্ষণ সকলে চুপ করে থাকে।

পরমেশ্বর নমিতাকে বলে, দিদিকে সামাল দিস্। এ মেয়েকে সিনেমায় টেনে নেবে।

সুভাগিনী বলে, চমৎকার গলা মেয়ের—সুন্দর গায়।

পঙ্কজ বলে, ওকে শেখালে খুব নাম করতে পারবে।

মানদা বলে, বাপের কাছে নিজে নিজে শিখেছে। এসব গানের কি কদর আছে ?

পঙ্কজ বলে, আছে বৈ কি ? সভায় এসব গান হলে লোকে মেতে যায়।

প্রতিমা বলে, আপনি গানও এত ভালবাসেন তা তো জান্‌তাম না।
মহেশ্বর বলে, শ্যামা সঙ্গীত জানো মা ?

আরেকটা গান করে সবিতা। খালি গলায় গ্রাম্য ঢং-এ গান।

গান শেষ হলে সকলে নানা বিষয়ে কথা বলে।

প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সাধন থাকে চুপ করে।

চিরদিনই সে চুপচাপ।

পরমেশ্বর সর্ব্বদা হাসিখুসী, চেনা অচেনা সকল মানুষের সঙ্গে চলে তার অফুরন্ত কথা।

মহেশ্বর গম্ভীর ও ভাবুক কিন্তু বিশেষ ধরণের লোকেদের সঙ্গে আধ্যাত্মিত বিষয়ে সেও অজস্র কথা বলে।

সাধন হয়েছে বাপ জ্যাঠার ঠিক বিপরীত।

বোবা হয়ে থাকতে পারলেই সে যেন খুসী হয়।

একটি মাত্র কথা সে আজ বলে, সোজাসুজি সবিতাকে জিজ্ঞাসা করে, গান শিখবে ?

ঃ শিখব।

তারপর সাধন আর একটি কথাও বলে না।

কয়েকদিন পরে তার বন্ধু অসীম গান শেখাতে আসে সবিতাকে।

সপ্তাহে দু'তিন দিন গান শেখাতে আসবে।

বিনা পয়সায়—নিজের পকেট থেকে বাসের পয়সা খরচ করে।

পরমেশ্বর বলে, মেয়েটা গেল—সহরের কালচারের পাল্লায় গেল। সহরতলী থেকে প্রথমে বলবে অ্যামেচার—তারপর দাঁড়াবে প্রফেশনাল। একখানা গানের দাম হবে—

মানদা প্রায় ভীত মুখে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

: এমনি করেই ভগবান উপায় করে দেন।

শুনে মানদা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

শিক্ষাদীক্ষা চালচলন রুচি অরুচিতে অনেক তফাৎ দুটি পরিবারে, সহর অজানা না হলেও এবং স্কুল কলেজের শিক্ষার অভাব না থাকলেও মহেশ্বরের পরিবারটি স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক গ্রাম্যতা ও গোঁড়ামি নিয়ে এসেছে। তিন বছর কলকাতাবাসী বিধুভূষণের পরিবারটির সহুরে আধুনিকতার সঙ্গে মহেশ্বরের পরিবারের স্বাভাবিক রক্ষণশীলতার খাপ খাওয়া সম্ভব নয়। তবে, শুধু কয়েকটা দিন তারা এক বাড়ীতে বাস করবে, কয়েকদিন পরে পৃথক হয়ে দূরে সরে যাবে, শুধু এই জন্যই দুটি পরিবারের হৃদ্যতা যেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেড়ে গিয়ে নিবিড় ঘনিষ্টতায় পরিণত হয়ে যায়।

ট্রেণে বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন প্রকৃতির যাত্রীদের মধ্যে যেমন হয়।

কটা দিনের তো ব্যাপার। পরমেশ্বর বায়না করে রেখেছে, মহেশ্বর টাকা নিয়ে এসে দিলেই বাড়ীর দখলীসত্ব ছেড়ে দিয়ে বিধুভূষণেরা চলে যাবে!

তারপর কে ধারবে কার ধার, কে দেখতে যাবে তাদের মধ্যে কত দিক দিয়ে কত পার্থক্য।

দুদিন পরেই সাধন দেশে ফিরে যায়। সম্পত্তি বিক্রীর ব্যাপারে মহেশ্বরকে সাহায্য করতে হবে।

এ দু'দিন নিজেদের সঙ্গে সে সবিতাদেরও বাইরের কতগুলি প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করেছে। বাজার করেছে, দোকান থেকে জিনিষ এনে দিয়েছে, রেশন কার্ডের জন্য দরখাস্ত দাখিল করে এসেছে।

জিজ্ঞাসা করেছে, হেড অব দি ফ্যামিলির নাম কি লিখব—

পঙ্কজ হেসে বলেছে, কেন, গণেশ চন্দ্র লিখবে।

গণেশ হিসাবে এখানে পৌঁছে বেশ বদল করে নিজের পরিচয় দিলে সবিতা নিশ্চয় ইতিমধ্যে লজ্জা কাটিয়ে উঠত। ট্রেণে গণেশ হিসাবে তাকে একটু আরাম দিতে চেয়ে কাছে টেনে আনতে যাওয়ার যেভাবে পঙ্কজের কাছে তার পরিচয় ফাঁস হয়ে গিয়েছিল, সেটা বোধ হয় সে এখনো ভুলতে পারে নি।

পঙ্কজের পরিহাসে আবার তার মুখ লাল হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু সে শক্ত মেয়ে। তবু হাসবার চেষ্টা করে বলেছে, দুটো কার্ড হয় না? একটা গণেশ নামে, আর একটা সবিতা নামে?

: হয় বৈকি! এনকোয়ারি করতে এলে গণেশ সেজে সামনে গেলেই হল!

সাধন দরখাস্ত দিয়ে এলেও রেশন কার্ড জুটিয়ে আনার হাঙ্গামা করার দায়িত্বটা সমীর যেচে নিয়েছে।

সাধনকে বলেছে, আমি সব ঠিক করে দেব, ভাববেন না।

পঙ্কজ উপস্থিত ছিল।

সে বলেছে, আপনার তো আপিস আছে। অসুবিধা হবে। আমি ব্যবস্থা করে দেব।

সমীর বলেছে, না না, অসুবিধা কিছু নেই।

শুধু রেশন কার্ড যোগার করার দায়িত্ব নয়, সাধনকে কিছু না বললেও দৈনিক বাজারের ভারটাও সে যেচে গ্রহণ করেছে।

সকাল সাতটা বাজতে না বাজতে থলি হাতে নীচে নেমে এসে সে সুরমাকে সামনে দেখে বলে, আপনাদের তো বাজার করার লোক নেই আজ। আমি বাজারে যাচ্ছি, আপনাদেরটাও এনে দিই।

সুরমার হাতে ছিল বাসনের পাঁজা। সে বলে, আপনি আবার কষ্ট করবেন?

: কষ্ট কিসের? আমাদের জন্য মাছ তরকারী কিনতেই যাচ্ছি—সেই সঙ্গে আপনাদেরটাও কিনে আনব। ঈশ্বর বাবুকে এসব ঝন্‌ঝাট পোয়াতে হবে, ভাবতেও আমার বিশ্রী লাগছে।

: কেন, জ্যাঠামশাই বাজার করতেন না?

: করতেন—কিন্তু সে ছিল একার জন্য বাজার, বেড়াতে গিয়ে কিনে কেটে আনলেন, হু'দিন চালিয়ে দিলেন।

সুরমা আশ্চর্য্য হয়ে বলে, সে কি? এতকাল এ বাড়ীতে আছেন, আপনি জানেন না তিনি রোজ নিয়মমত বাজার করেন?

সমীর লজ্জিত হয়ে বলে, অতটা খেয়াল করি নি।

সুরমা বলে, তবে হ্যাঁ, বেড়াবার জন্য বেড়াতে যাওয়া, বাজার করার জন্য বাজার করতে যাওয়া—এসব জ্যাঠামশাই ভিন্ন ভিন্ন করেন না। হেঁটে বাজারে যান—বেড়ানোও হয়, বাজার করাও হয়। আলসেমি উনি হু'চক্ষে দেখতে পারেন না। আলসেমির জন্য টাটকা মাছ তরকারী না খাওয়া ওঁর মতে পাপ!

পরমেশ্বর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, কেন বদনাম দিচ্ছিস সুরমা? আমি আলসেমি খুব ভালবাসি। এদেশে বেশী বেশী খেটে মানুষের প্রাণ যায়—আলসেমিকে প্রশ্রয় দেওয়া এদেশে ধর্ম্ম হওয়া উচিত! আলসেমি মানেই তো বিশ্রাম।

: বাসনটা রেখে আসি।

সুরমা রান্না ঘরে যায়। প্রতিমা আঙুল দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বুঝা যায়, সে সম্ভ সম্ভ ঘুম ভেঙে উঠেছে।

পরমেশ্বর বলে, সামনেই প্রমাণ ত্তাখো। তুলনা কর।

সমীর বুঝতে পারে না।

: কিসের প্রমাণ? কিসের তুলনা?

: আলসেমি যে আসলে বিশ্রাম তার। এরা দুটি বোন—সুরমা দেড় বছরের বড়। কিন্তু প্রতিমাকেই বড় মনে হয় না? এখানে নয় ঝি চাকর নেই, বাসন মাজা ঘরের কাজ করা দরকার হয়েছে। দেশে পানটুকু সেজে দেবার লোক ছিল—সারাদিন শুয়ে থাকলেও কেউ দোষ ধরত না। কিন্তু সুরমার হল কর্ম্মের আদর্শ, বসে থাকতে নেই কাজ করতে হয়, দায়িত্ব নিতে হয়। প্রতিমা ওসবের ধার ধারে না। আরাম বিলাসের সুযোগ আছে, নেব না কেন?

সমীর বলে, কিন্তু—

: হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো বটেই! প্রতিমা ফিগার ঠিক রাখার জন্ম স্কিপিং করে—আরও কি সব যেন ব্যায়াম ট্যায়াম কায়দা কৌশল করে।

সমীর কি বলত কে জানে, রান্না ঘরে বাসন নামিয়ে রেখে এসে সুরমা বলে, ইনি আমাদের বাজার করে এনে দিতে চাইছেন।

পরমেশ্বর বলে, চেয়ে কি মস্ত একটা অপরাধ করেছেন?

: তা নয়। সবিতাদের বাজারটাও তো করতে হবে?

: তাও ইনি নিশ্চয় করবেন। সবিতাকে ডাকো।

সবিতা আসে। কিন্তু আসে একেবারে খালি হাতে! বাজারে পয়সা বা থলি কিছুই আনে না।

: কি বলছেন?

প্রতিমা বলে, ইনি বাজারে যাচ্ছেন। বললেন কি আমাদেরও বাজারটা এনে দেবেন।

সবিতা বলে, আমাদের দরকার নেই বাজারের।

বলে সে খালি হাতে বাজার করতেই বেরিয়ে যায়!

সমীর বলে, মেয়েটা তো ভারি অহঙ্কারী!

পরমেশ্বর বলে, না না, তুমি ভুল বুঝলে। বেচারা নিজেদের বাঁচাচ্ছে। সাধন দুদিন ওদের বাজার করেছে—নিজেদের জন্য দামী দামী মাছ তরকারী যা কিনেছে ওদের জন্যও তাই এনেছে। ওদের কি অত খরচ পোষায়? মেয়েটি বুদ্ধিমতী, নিজে শাকপাতা কিনে আনতে গেছে।

মাছের বাজারে সবিতার সঙ্গে দেখা হয় সমীরের।

: কি মাছ কিনলে?

সবিতা বলে, মাছ? কুচো চিংড়ি দু'টাকা সের—মাছ কিনব কি করে?

সমীর বুঝি হঠাৎ ভাবের বশে বুদ্ধি হারায়, পরমাত্মীয়ের দাবীটা নিজের ভাবে নিজেই খাড়া করে উৎসাহের সঙ্গে বলে, আমি আজ তোমাদের মাছ খাওয়াব।

মহৎ ভাব। উৎখাত হয়ে এসেছে একটা পরিবার, একটা মেয়ে ভার নিয়েছে সেই পরিবারটিকে বাঁচিয়ে রেখে নতুন স্থানে শিকড় গেড়ে স্থায়ী করবার—এমন একটি মেয়েকে একটু আদর করার মহৎ ভাব!

তাই, সবিতার প্রতি-প্রশ্নে সে বেসামাল হয়ে যায়।

: মাছ খাওয়াবেন কেন? আমি কম বয়সী মেয়ে বলে?

: না না, এমনি বলছিলাম—

: আমি কিন্তু ঠিক করেছি কোন রকমের বেশ্যা হব না—ধর্মভাবেও হব না—ভালবাসার ভাবেও হব না। আপনি মিছেই আমার পিছনে লেগেছেন।

বাজারের মধ্যে গায়ে ঠেলাঠেলি করা ভিড়, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই ধরণের কথাবার্তা! সমীরকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে মাঝ বয়সী একজন মন্তব্য করে, বাপ্ রে বাপ, এরা হাটে-বাজারেও প্রেম চালাবে!

সবিতা হঠাৎ স্বর পালটায়।

: আচ্ছা, আপনার মাছ খাব। কিনে নিয়ে যান, রান্না করে পাঠাবেন।

মাছ কেনা হয়ে গিয়েছিল সমীরের। আর পোয়াটেক কিনলেই সবিতাদের দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হত। সে একসের মাছ কিনে বসে—বাজারের সব সব চেয়ে দামী মাছ।

অলকা বলে, এত মাছ এনেছিস? দু'রকম মাছ?

সমীর বলে, কাটা মাছটা রান্না করে সবিতাদের পাঠিয়ে দিও।

পদ্মা বলে, সবটা? কেন?

: কেন মানে? আমাদের রান্না মাছ খেতে চেয়েছে।

: তা তো চাইবেই! কত কি চাইবে। স্বরমাদের না দিয়ে সবিতাদের জন্য কেন?

: ওদের মাছ এনে দিয়েছি।

অলকা বলে, তুই চুপ কর পদ্মা। একজনদের একদিন একটু মাছ খাওয়ালে সমীর ফতুর হবে না!

সমীর পুরো একটা সিগারেট খায়।

তারপর অলকাকে বলে, সবটা মাছ সবিতাদের পাঠিও না। খানিকটা স্বরমাদেরও পাঠিও। দু'ঘরেই পাঠান উচিত।

মাছ রান্না হয়ে যাবার আগেই সমীর স্নান করে খেতে বসে। আপিস যাবে।

সবিতার সাত বছরের ভাই বুনো ছোট একটা বাটিতে খানিকটা বড়ি দেওয়া তরকারী এনে দেয়।

: দিদি বলল, চেখে দেখবেন।

বুনো ফিরে যেতে-না যেতে স্বয়ং সুরমা একটা বাটি হাতে করে আসে।

পাতের কাছে বাটিটা নামিয়ে রেখে বলে, শুধু পটোল দিয়ে এ তরকারীটা আমি মাথা ঘামিয়ে বের করেছি। খেতে ঠিক মাংসের মত লাগে। কেমন লাগে বলতে হবে কিন্তু।

পদ্মা হেসে বলে, দাদা, তুমিই দেখছি ভাগ্যবান মানুষ!

সুরমা বলে, না ভাই, তোমাদের সবাইকে চাখতে দেব বলে বেশী করেই রেঁধেছি। উনি আপিস যাবেন—একেবারে কড়াই থেকে খানিকটা তাই এনে দিলাম।

সুরমার তরকারীটা আগে খেয়ে সমীর বলে, এটা পটোলের তরকারী নয়, এটা নিশ্চয় কোন নতুন রকম মাংস।

সুরমা খুসী হয়ে বলে, যাক্, খারাপ হয় নি তা হলে!

সুরমার প্রকৃতি শান্ত ও কোমল। স্নেহ করতে আর ঘরের কাজ করতে—সেটা আসলে হল অন্যের সেবা,—সে খুব ভালবাসে।

প্রতিমা তার চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট, কিন্তু তুলনায় সুরমাকেই আরও ছোট মনে হয়। সে চটপটে চালাক চতুর মেয়ে সর্ব্বদা হাসিখুসী ভাব—কিন্তু অভিমান তার প্রচণ্ড।

রাগে সে সহজেই এবং সামান্য কারণে তার রাগের পরিমাণ দেখে

মনে হয় মাথার বুঝি তার গোলমাল আছে। তবে সহজেই রাগটা আবার তার পড়েও যায়।

এ বিষয়ে স্থরমা একেবারেই অন্যরকম। রাগ অভিমান বলে কিছুই যেন তার নেই, সে যেন মূর্তিমতী ধৈর্য্য আর ক্ষমা।

সমীরের সঙ্গে স্থরমার আলাপ জমে পরমেশ্বরকে নিয়ে আলোচনায়। মানুষটা সম্পর্কে দু'জনেরই খুব আগ্রহ—কিন্তু দেখা যায় তার সম্পর্কে তাদের মতের অনেক অমিল।

সমীর বলে, আপনারা কলকাতা আসেন নি আগে?

: কতবার।

: জেঠামশায়ের সঙ্গে তো একবারও দেখা করতে আসেন নি?

: বাবার বারণ ছিল। জেঠামশাই নিজেও কখনো যেতেন না, আমাদেরও আসতে লিখতেন না। বাবা বলেন, যে চায় না তাকে জ্বালাতন করতে নেই। বাবা ওঁকে দেবতার মত ভক্তি করেন, ওঁর প্রত্যেকটি ইচ্ছা মেনে চলেন।

সমীর মনে মনে বলে, সে তো বটেই—অর্দ্ধেক সম্পত্তি ভোগ দখল করতে দিয়েছেন, তাকে ভক্তি না করলে চলবে কেন!

মুখে বলে, এবার তো এতটুকু জ্বালাতন হলেন না? বরং খুসীই হয়েছেন মনে হয়! আপনারা আগে এলে বিরক্ত হতেন জানলেন কি করে? আসতে তো তিনি বারণ করেন নি আপনাদের!

: বিরক্ত হতেন কে বল্লে? আমরা আগে এলেও বিরক্ত হতেন না।

: তবে?

: আহা, বিরক্ত না হওয়াটা ওঁর স্বভাব। কিন্তু আমরা তো জানি উনি আত্মীয় বন্ধু চান না, নিজের মনে একলা থাকতে ভালবাসেন।

নইলে দেশ ছেড়ে সবাইকে ছেড়ে এখানে এসে এভাবে থাকবেন কেন? জেনে শুনে আমরা কেন ওঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাব? জুলুম করব?

সমীর হেসে বলে, আপনারা ভুল করেছেন।

ঃ ভুল?

ঃ আমি এখন বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা। উনি আপনাদের ভালবাসতেন—আপনারা ওঁর সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা করে নিয়ে ওঁকে এমনভাবে অবহেলা করেছেন যে উনিও আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন নি—একলা জীবনটা কাটিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন। শুধু দেখা করতে আসা নয়, আপনারা সবাই একরকম ওঁর ঘাড়ে এসে চেপেছেন। তবু ওনার দিব্যি খুসীর ভাব। এটা কি করে হয়? আগে যদি আপনারা একটু স্নেহ মমতা দেখাতেন আর স্নেহ মমতা চাইতেন, ওনার জীবনটা অন্য রকম হয়ে যেত।

সুরমা হেসে বলে, আমরা তো সেদিন জন্মালাম। বাবার চেয়ে উনি মোটে দেড় বছরের বড়। ছেলেবেলা থেকে বাবা ওঁকে দেখে আসছেন, বাবার কখনো ভুল হয়? অল্প বয়স থেকে উনি আত্মীয়স্বজনকে ছাড়তে আরম্ভ করেন। কলেজে পড়বার সময় প্রথম প্রথম পুজোর ছুটি গরমের ছুটিতে দু'চারদিনের জন্য বাড়ী যেতেন, পরে একেবারে যেতেন না…

মহেশ্বরের কাছে শোনা পরমেশ্বরের অতীত জীবনের কাহিনী সুরমা সমীরকে শোনায়। ছুটিতেও বাড়ী না যাওয়ায় মা কেঁদেকেটে আর বাবা কড়াস্বরে বুঝিয়ে ছেলেকে চিঠি লিখত—তাকে স্মরণ করিয়ে দিত তার দায়িত্ব আর কর্ত্তব্যের কথা। পরমেশ্বর জবাবে লিখত, বাড়ী যেতে তার ভাল লাগে না, কারণ বাড়ীর সকলে সব সময় অকারণে দুঃখী সেজে থাকে, বাড়ীতে আনন্দ নেই। মিছিমিছি নানা রকম ঝনঝাট বাধিয়ে বাড়ীর সবাই যেন সব সময় দুঃখী হয়ে থাকতে ভালবাসে। কোন

অভাব নেই, অথচ কারো মুখে হাসি দেখা যায় না। এই নিরানন্দ আবহাওয়ায় যেতে তার মন চায় না, গেলেও তার হাসিখুসী ভাব দেখে সবাই তাকে ছ্যাবলা মনে করে। এ অবস্থায় বাড়ীতে না যাওয়াই তার পক্ষে ভাল! ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে ভেবে মা বাবা কি রকম ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল পরমেশ্বরের, কিভাবে চেষ্টা করেছিল সুন্দরী মেয়ে খুঁজে তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দেবার সে কাহিনীও সুরমা শোনায়।

পরমেশ্বর জানিয়েছিল, বিয়ে সে করতে রাজী আছে।

সমীর অবাক হয়ে হলে, সত্যি?

সুরমা বলে, আমি কি বানিয়ে বলছি?

বিয়ে করতে পরমেশ্বর রাজী হয়েছিল, কিন্তু একটি সর্ত্তে! ছোট একটি মেয়েকে সে বিয়ে করবে, বিয়ের পর বৌ নিয়ে একেবারে পৃথক হয়ে থাকবে।

কেন?

না, বৌকে সে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে, গড়ে তুলবে—যাতে অকারণে অসুখী হবার ধাতটা তার বদলে যায়। সত্যি সত্যি দুঃখ পাবার কারণ না ঘটলে, রোগ ব্যারাম না হলে—শুধু বদ শিক্ষার জন্য সে যাতে হাসতে না ভুলে যায়। জীবন আনন্দময়—এই সত্যটা বুঝতে শেখে!

সুরমা বলে, বুঝছেন তো? উনি চিরদিন এই ভাবের ভাবুক। কারো খাতিরে উনি কারো বানানো দুঃখের ভাগ নেবেন না। এটাকেই উনি ঝন্‌ঝাট এড়িয়ে চলা বলেন।

সমীর বলে, এটাই তো বৈরাগ্য!

সুরমা বলে, কিসে?

: সংসারে সুখ নেই কেবল দুঃখ—এই ভাবকেই বৈরাগ্য বলে, এই ভাব থেকেই লোকে সংসার ছাড়ে।

: উনি তো বলেন না সংসারে সুখ নেই কেবল দুঃখ। বরং উল্টো কথাই বলেন যে জীবন আনন্দময়। তিনি সংসার ছাড়েন নি—অকারণে দুঃখ ভোগ করাকে ছেড়েছেন।

: ওটা একই কথা। সংসারে সবাই যেরকম আমি সেরকম হব না, একা নিজের ভাব নিয়ে থাকব—তাকেই বৈরাগ্য বলে! অন্যে সংসার ছেড়ে ঈশ্বরকে নিয়ে থাকে, উনি আনন্দ নিয়ে আছেন। কোন তফাৎ নেই।

: আপনি ভুল বুঝলেন।

সুতরাং তর্ক বেঁধে যায়।

এই একটি কথা থেকে আসে হরেক রকম কথা। সমীর বড় বড় কথা টেনে এনে সুরমাকে কাবু করে দেয়।

সুরমা বলে, মুখ্য মানুষ, আপনার সঙ্গে পারব কেন? এসব কথা আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশী বোঝেন। সমাজ, ধর্ম্ম সাইকলজি নিয়ে কি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে পারি? জ্যাঠামশায়ের ব্যাপারটা ভাল করে জানি তাই বলছিলাম।

সানন্দভাবে সে একটু হাসে।

: গুরুজনের সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে নেই, কিন্তু ঠিকমত সাথী পেলে আজও উনি বিয়ে করে সংসারী হতে রাজী হবেন।

সমীরও হাসে।

: এদেশে লোকে বৌ ছেড়ে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়। খাঁটি সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনী খুঁজে পায় না।

: আপনি ভুল বুঝেছেন জ্যাঠামশাইকে।

প্রতিমা বলে, দিদি, পুরো একটি ঘণ্টা তুমি কাটিয়ে এলে সমীর বাবুর ঘরে।

সুরমা বলে, আপিসের বেলা হয়ে গেল, নইলে আরও দু'এক ঘণ্টা কাটিয়ে আসতাম।

: আমি বুঝি একলা খেটে মরব ?

: আমি যে সারাদিন একলা খেটে মরি ? এক ঘণ্টা খেটেই তোর গোসা হল ! কি খেটেছিস শুনি ? মশলা বেটেছিস ? কাপড় কেচেছিস ? রান্না করেছিস ?

প্রতিমা বলে, আমি কাজে যেতাম, আটকে রাখলে ।

সুরমা বলে, কি কাজ যেতে ?

: সেটা আমার কাজ।

সুরমা হেসে বলে, ছাখ, আমি কচি খুকি নই। পঙ্কজদের বাড়ী যেতে পারিস নি বলে তো ? পঙ্কজ আজ দেরীতে কাজে যাবে। এখন গেলেও দেখা পাবি।

প্রতিমা মুখ বাঁকায়।

: তুমিও যেমন ! পঙ্কজবাবু সবিতাকে নিয়ে উদ্বাস্তু মিটিংএ গেছেন।

: তোকে নিলেন না ? হায় হায় !

সুরমা হাসে।

বড় হাঙ্গামাগুলি মোটামুটি সেরে আসতে মহেশ্বর ও সাধনের প্রায় দু'সপ্তাহ সময় লাগে ।

তার দু'দিন পরেই টাকা নিয়ে বাড়ীর দখল ছেড়ে দিয়ে বিধুভূষণেরা চলে যায়।

সুরমা বলে সমীরকে, মাঝে মাঝে আসবেন তো ?

সমীর বলে, নিশ্চয় আসব। এমনিই ঈশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসতে হত, এবার আপনাদের সঙ্গেও ভাব হল।

: এরকম ভাব তো আপনার কত মানুষের সঙ্গেই হচ্ছে।

: সবার সাথে কি একরকম ভাব হয় ?

: আমাদের পূজো হবে। নেমন্তন্ন রইল।

: আপনারা দুর্গা পূজা করেন নাকি ?

: বহু কাল ধরে পূজো চলে আসছে।

পাঁচ

বাড়ীর দখল পেয়েই মহেশ্বর বলে, এবার ওপর তলায় যাবার ব্যবস্থা কর। দাদা একতলায় যেমন ছিলেন তেমনি থাকবেন।

সুভাগিণী বলে, আমাদের এত লোকের কুলোবে? সবিতাদেরও একটা ঘর দিতে হবে তো!

মহেশ্বর বলে, না কুলোলেও কুলোতে হবে। দাদার অসুবিধা করা চলবে না। দাদার জন্যই এ বাড়ী কেনা হয়েছে, নইলে আমি এত টাকা দিয়ে বাড়ী কিনতাম না—কম টাকায় ছোট বাড়ী কিনতাম।

সাধন বলে, জ্যাঠা রাজী হবেন না।

সুরমা বলে, আমারও তাই মনে হয়। ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে—

মহেশ্বর বলে, না; মন বুঝবার জন্য যদি জিজ্ঞেস করতে যাই, আপনার অসুবিধা হবে না কি, দাদা নিশ্চয় বলবেন, ওঁর কোন অসুবিধা নেই। আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা নেই? আমরা কেন ওঁর শান্তি নষ্ট করব!

সবিতাও শুনছিল।

সে বলে, আমরা বরং তা হলে একটা ঘর খুঁজে উঠে যাই।

সাধন বলে, আগে থেকেই কেন ব্যস্ত হচ্ছ? দেখা যাক না কি ব্যবস্থা হয়।

: আমাদের জন্য আপনারা কষ্ট করবেন—

: তা নয় একটু করলাম।

কিন্তু সবিতার মুখ দেখে বোঝা যায় তার অস্বস্তি দূর হয় নি। নিজেদের অসুবিধা ঘটিয়ে তাদের উপকার করাটা সে ঠিক পছন্দ করে উঠতে পারছে না।

মহেশ্বরের নির্দ্দেশমত পরমেশ্বরকে কিছু না জানিয়েই জিনিষপত্র সব দোতলায় চালান যাচ্ছে, স্বয়ং পরমেশ্বর বাড়ী এসে বলে, এ আবার কি ঝন্‌ঝাট বাঁধালে তোমরা ?

: আমরা ওপরে চলে যাচ্ছি।

: কেন ?

: একতলায় আপনি যেমন ছিলেন তেমনি থাকবেন।

: কেন ?

: নইলে আপনার অসুবিধা হবে।

: কেন অসুবিধা হবে ?

এ কেন'র জবাব দিতে না পেরে তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। মহেশ্বর হাজির থাকলে বোধ হয় জবাব দিতে পারত। মহেশ্বর গিয়েছিল দোকানে। ভাল খাঁটি গাওয়া ঘি কিনতে।

সহরের দোকানে খাঁটি গাওয়া ঘি—তাও আবার ভাল !

কাছেই রাস্তার ওপর তারই মত এক দেশ ছাড়া মানুষের নতুন মনোহারী দোকান।

মহেশ্বর বলে, খাঁটি গাওয়া ঘি বলছ ?

কালীপদ বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। এখনো ভেজাল বেচতে শিখি নি !

খাঁটির চেয়েও যেন বেশী উৎকৃষ্ট মনে হয় বর্ণ আর গন্ধ ঘিয়ের—চেয়ে দেখে গন্ধ শুঁকে রীতিমত সন্দেহ হয় !

আঙ্গুলে একটু ঘি নিয়ে হাতে খানিকক্ষণ ঘষে পরীক্ষা করে দেখে মহেশ্বর বলে, খাঁটিই বটে—জিনিষটা যা সেটা খাঁটি। তবে ঘি নয়।

: আজ্ঞে ?

মহেশ্বর তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, আট দশ টাকা সের বিক্রী হয় গাওয়া ঘি—তার রং আর গন্ধ তৈরী না হয়ে কি যায় ! তবে আমাকে

ভুলানো অত সোজা নয়। সাত পুরুষ ধরে ঘরের গরুর দুধের মাখন থেকে তৈরী ঘি খেয়ে আসছি।

কালীপদ বলে, ঘি পৃথিবীতে আপনিই খেয়েছেন একা?

: তুমি তো দিয়েছ মুদীখানা, তোমার বাপ কি করত হে? তোমার ঠাকুরদাদা? আমি কোন বংশের ছেলে জানো?

কালীপদ রাগে কিন্তু কথা কয় না। সে তিন পুরুষে দোকানদার, খদ্দেরকে না চটানো তার একেবারে ধাতস্থ। অবস্থার ফেরে আজকাল মেজাজ খানিকটা বিগড়ে গেছে, নইলে তার ঘিয়ের নিন্দা শুনেও মহেশ্বরকে খোঁচা দিয়ে মন্তব্য করত না যে পৃথিবীতে একাই সে খাঁটি ঘি খেয়েছে, আর কেউ স্বাদ জানে না।

রাগে গজ গজ করতে করতে মহেশ্বর বাড়ী ফেরে কিন্তু পরমেশ্বরকে সামনে দেখে সে চোখের পলকে একেবারে যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়।

পরমেশ্বর হাসিমুখে বলে, তুমি কি আমাকে তাড়াতে চাও মহেশ্বর?

মহেশ্বর বলে, আজ্ঞে, সে কি কথা?

: তবে এরকম উদ্ভট ব্যবস্থা করছ কেন? তোমরা সবাই ওপরে যাবে আমি একলা নীচের তলাটা দখল করে থাকব?

: লোক থাকলে আপনার অসুবিধে হবে না? এতকাল নিরিবিলি ছিলেন—

পরমেশ্বর হাসে।

: তুমি আজও আমায় বুঝলে না মহেশ্বর! এতদিন পয়সা ছিল, একতলাটা ভাড়া নিয়ে একলা ছিলাম। এখন এটা আমাদের নিজের বাড়ী, তোমাদের ওপরে পাঠিয়ে আমি ওভাবে থাকতে পারি? প্রতি মূহুর্তে আমার মনে হবে না একটা খাপছাড়া অদ্ভুত অবস্থায় আছি?

মহেশ্বর বলে, ঠিক বুঝতে পারি নি। আপনি চিরদিন একলা থাকতেই পছন্দ করেন—

: সে যখন সুযোগ ছিল তখন ছিলাম। কারো অসুবিধা ঘটাতে হয় নি। আজ সুযোগ নেই তবু জোর করে একলা থাকব? এখন তো সেটা পছন্দ হবে না আমার!

সুরঞ্জনেরা বাড়ীর পিছনের অংশে থাকে। সম্পূর্ণ পৃথক। দু'খানা ঘর, একটা গ্যারেজ আর ছোট এক টুকরো উঠান।

কবে কোন প্রয়োজনে হয় তো গাড়ী কিনতে হবে ভেবে বিধুভূষন গ্যারেজটা তৈরী করেছিল। পরে হিসেব করে দেখল যে কবে গাড়ী কিনবে সেটা অনিশ্চিত কিন্তু দু'খানা ঘর আর গ্যারেজটা অনায়াসে পৃথক করে অবিলম্বে ভাড়া গোণা যায়।

গ্যারেজে সুরঞ্জনদের রান্না হয়।

বিধুভূষনের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে খেঁচাখেঁচি হত অচিন্ত্যের। এখন তারা ভাড়াটে হয়েছে মহেশ্বরের।

অচিন্ত্যের বদলে এখন চাকুরে সুরঞ্জন মাসের পয়লা তারিখে যেচে এসে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে যায়।

পরমেশ্বর বলে, দশ টাকা কম দিতে হবে, নইলে চলবে না। তোমরা অন্য বাড়ী খুঁজে নাও।

ভয়ানক যেন রেগে গিয়েছে এমনি ভাবে বলে!

সুরঞ্জন একটু ভড়কে গিয়ে বলে, বরাবর যা দিয়ে এসেছি—

: বিধুবাবু বরাবর দশটাকা বেশী নিতেন, এবার থেকে দশটাকা কম দিতে হবে। ঠিক ভাড়া কত হওয়া উচিত আমি হিসেব করে দেখেছি। আমাকে ঠকাতে পারবে না। ঠিক ভাড়া দিতে না চাও, উঠে যাও।

এবার সুরঞ্জনের মুখে হাসি ফোটে।

: বেশ:তো ঠিক ভাড়াই নিন্!

টাকা নিয়ে মহেশ্বর রসিদ দেয়।

পরমেশ্বর হেসে বলে, আমার মতলবটা টের পেলে না, এই তুমি শিক্ষিত বুদ্ধিমান ছেলে? কয়েক মাস দশ টাকা করে কম নিয়ে ভিক্টার দাঁড় করিয়ে তোমাদের ভাগিয়ে দেব।

সুরঞ্জন হাসিমুখে তাকে রসিদটা দেখায়। মহেশ্বর নিজেই রসিদের পিছনে লিখে দিয়েছে যে চলতি মাস থেকে দশটাকা ভাড়া কমান হল।

পূজা এগিয়ে আসছে।

মহেশ্বর নতুন অবস্থায় নতুনভাবে পূজার ব্যবস্থা করার চিন্তা আর হিসাব নিকাশ নিয়ে সব সময় ব্যস্ত আর বিব্রত হয়ে আছে। পরমেশ্বর নিজে থেকে পরামর্শ দিয়েছে, পঙ্কজের সঙ্গে পরামর্শ কর। ওপাড়ার সার্বজনীন পূজায় খুব খাটে—ওর কাছে সব জানতে পারবে।

ছোটখাট কিন্তু চকচকে নতুন গাড়ীতে চেপে এক রবিবার সকালে বিধুভূষনেরা এ পাড়ায় বেড়াতে আসে, চেনা লোকদের সঙ্গে দেখা করতে আসে।

বুঝতে অবশ্য কষ্ট হয় না কারুরই যে দেখা করার চেয়ে নতুন কেনা গাড়ীটা দেখাতে আসাই তাদের বেশী জরুরী ছিল।

কোন একদিন গাড়ী কেনাটা টাকা নষ্ট করার বদলে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে ভেবে এ বাড়ীতে বিধুভূষন একটা গ্যারেজ তৈরী করেছিল, সম্ভ্রান্ত পাড়ায় আধুনিক প্যাটার্ণের গ্যারেজবিহীন ছোটখাট বাড়ীটা কেনার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী কেনাও তার দরকার হয়ে পড়েছে।

একটা গ্যারেজও তৈরী করে নিতে হয়েছে তাড়াতাড়ি। একজন ড্রাইভারও রাখতে হয়েছে গাড়ীটা চালাবার জন্য। তারা কেউ গাড়ী

চালাতে জানে না। বিধুভূষনের অবশ্য হিসাব ঠিক করাই আছে। নিজেরা গাড়ী চালালে কোনই দোষ হয় না আজকাল, গাড়ী একটা থাকলেই হল।

গাড়ী চালাতে শিখে লাইসেন্স পাওয়া পর্য্যন্তই সে কান্তিলালের মাইনে গুণবে। অবশ্য গাড়ী চালাতে শিখতে হবে খুব ভাল করেই। কান্তিলালের খরচটা বাঁচাতে চেয়ে কলকাতা সহরে কাঁচা হাতে গাড়ী চালাতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে হয়তো অপচয় করে বসবে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিম্বা জীবনের! ওরকম বেহিসাবী টাকার মায়া বিধুভূষনের নেই।

তার আগের বাড়ীর সামনেই গাড়ী দাঁড়ায়। পাড়ার অনেক বাড়ী থেকেই গাড়ীটা এখানে দেখা যাবে।

তারা নেমে বাড়ীর ভিতরে গেলে কান্তিলালও নেমে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরায়। এমন একটা মুখভঙ্গি করে থুতু ফেলে যেন গাড়ী আর গাড়ীর মানুষগুলির নোংরা সান্নিধ্য থেকে মুক্তি পেয়ে বেঁচেছে।

পদ্মা মুখ ফিরিয়ে তার সেই মুখভঙ্গি দেখে ভাবে, বিড়ি টানতে ভাল লাগে না বেচারার। কিন্তু কি করবে সিগারেট কিনতে নিশ্চয় পয়সা কুলোয় না।

কিন্তু কেন কুলোয় না? মাইনে তো কম পায় না একজন লোকের পক্ষে। খাওয়ার খরচ, থাকার খরচও লাগে না এক পয়সা।

কি করে এতগুলি টাকা?

পরমেশ্বর চিঠি লিখছিল নিজের ঘরে। সেখান থেকে জানালা দিয়ে গাড়ী থামা থেকে সকলের নেমে বাড়ীতে ঢোকা চোখে না পড়েই পারে না।

নিজের ভাবে মশগুল হয়ে বাড়ীর সামনে মোটর গাড়ী থামার

আওয়াজ কেউ যদি কাণে না শোনে, চোখটি তুলে জানালা দিয়ে চেয়েও না ছাখে কে এল, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।

পদ্মা একটু যেন ভয়ে ভয়েই টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দামী টেবিল, দামী চেয়ার, খালি গায়ে চেয়ারে বসে পরমেশ্বর দামী পেন দিয়ে একটি পোষ্টকার্ডে চিঠি লিখছে।

মুখ না তুলেই পরমেশ্বর বলে, এসো মা। নতুন রথে চড়ে এসেছো দেখছি। বেশ বেশ, নিত্য নতুন চাই, নইলে জীবন একঘেয়ে হয়ে যায়। বোসো মা জননী, টুলটা টেনে নিয়ে বোসো।

চিঠিটা লেখা শেষ করেই বোধ হয় মুখ তোলে।

: মাকে একখানা চিঠি লিখলাম!

: আপনার মা? আপনার মা বাবা দু'জনেই মারা গিয়েছেন শুনেছিলাম?

পরমেশ্বর মুচকে মুচকে হাসে।

: মা কখনো মারা যায়? আমার মা মরতে না মরতে বাবা আমাদের একটি কচি মা এনে দিয়েছিলেন।

পদ্মা আমতা আমতা করে বলে, আপনার সৎ মা?

পরমেশ্বর আঙ্গুল উচিয়ে তাকে শাসানোর ভঙ্গি করে বলে, মা কখনো অসৎ হয়? সব মা-ই সৎ। বাবার তিন বিয়ে ছিল বলে কি আমার শুধু দু'টি সৎ মা? তোমায় যে মা বলি, তুমি তা হলে অসৎ নাকি?

পদ্মা অধীর হয়ে বলে, সত্যি করে বলুন না কাকে চিঠি লিখলেন?

: সৎ মাকেই লিখলাম। বাবার তিন নম্বরের বৌ। তীর্থে বাপের বাড়ী, তাই সেখানেই আছেন। দশ বছর মাসে মাসে টাকা পাঠাবার দায়টা বয়ে আসছি। নতুন মাস সুরু হলেই আমার এক দায়—মাকে

টাকা মণিঅর্ডার করে পাঠানো। না পাঠিয়ে উপায় নেই। কদিন পরেই মার আমার চিঠি আসবে।

পদ্মা টুলে বসে যেন উসখুস করে। দু'বছর বোধ হয় পুরো হয় নি, নির্জন দুপুরে মিহি শাড়ী এলো মেলো ভাবে গায়ে জড়িয়ে এই লোকটাকে সে জব্দ করে এসেছিল।

মা জননী বলে ডেকে কি জব্দই তাকে করেছিল মানুষটা।

ওর নাকি সৎমা আছে। বাবার তৃতীয় পক্ষের বৌ! দশবছর তাকে নাকি সে মাসে মাসে মনিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়ে এসেছে।

শুধু এটুকু জানলে সে কি আর সেদিন মানুষটাকে জব্দ করার কথা মনে আনত? একেবারে একা দেখত মানুষটাকে, গা-ছাড়া ভাব, হাল্‌কা হাসি তামাসা নিয়ে দিন কাটায়। ওর যে আবার আপন জন আছে ভাবতেও পারা যেত না।

: কি লিখলেন?

: লিখলাম টাকা আর পাঠানো হবে না, ছেলেদের কাছে চলে এসো। আনতে লোক পাঠাচ্ছি।

পদ্মা হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়।

: আপনি ভয়ানক নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর হয়ে আপনি আনন্দ পান।

পরমেশ্বর যেন খুসী হয়ে বলে, এত চটে গেলে? বয়স হলে বুঝবে, এটা নিষ্ঠুরতা নয়, এ হল প্রকৃতির দায়, জীবনের নিয়ম। গরু দোয়া দেখেছ কখনো? বাছুর কি ভাবে স্তন পান করে? মায়ের দেহের সারাংশ চুষে নিচ্ছে, একটু তাতে কম পড়লেই প্রাণপণে ঢুঁ মারে। গাইটি আর পারছিল না দুধ ছাড়তে বন্ধ করে দিতে চাইছিল সাপ্লাই। বাছুরের গুঁতোয় আবার সে খানিকটা দুধ ছাড়ে রিজার্ভ ফাণ্ড থেকে। বাছুরটা কি নিষ্ঠুর?

: গোয়ালা বাছুরটাকে বেঁধে রেখে প্রায় সব দুধ দুয়ে নিয়েছে, তাই বাছুরটাকে গুঁতো মারতে হয়।

: আমিও তো তাই বলি। বাছুরগুলি ওরকম গুঁতো মেরে দুধ আদায় করে বলেই তো গোয়ালারা কচি বাছুর মেরে ফেলে। চামড়াটা টান করিয়ে ভিতরে খড় পুরে চারটে বাঁশের বাতায় ঠ্যাং লাগিয়ে গরুটাকে ভুলায়। খড় ভরা শুকনো চামড়া চাটতে চাটতে পশ্চিমের মস্ত গাই বালতি ভরা দুধ ছেড়ে দেয়—তার প্রত্যেক সেরের দাম এক টাকা। রোজ দেয়। ভুল ভাঙ্গে না।

সকাল বেলাই কেমন বিষাদ অনুভব করে পদ্মা। নতুন গাড়ী চেপে এ পাড়ায় বেড়াতে আসার উৎসাহ কোন ফাঁকে উপে গেছে।

সবিতা গান শিখছিল অসীমের কাছে। তার গলায় গ্রাম্যতা এখনো স্পষ্ট হয়ে আছে সুরে আর টানে।

গলা সাধা বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করে, সমীরবাবু আসেন নি?

পদ্মা বলে, নাঃ। পরে আসবে।

পদ্মা জানে তারা গাড়ী দেখাতে আসছে বলেই সমীর তাদের সঙ্গে আসে নি। এখন তারও মনে হয়, সত্যি, এ কেমন গ্রাম্যতা তাদের? এত দামী দামী গাড়ীর ছড়াছড়ি কলকাতা সহরে আর তুচ্ছ একটা গাড়ী কিনে তারা একটু ঈর্ষা জাগাতে এসেছে এ পাড়ার সেকেলে রক্ষণশীল মানুষদের বুকে—যাদের সঙ্গে মিল না খাওয়ায় তাদের পালাতে হয়েছে অন্য পাড়ায়!

পদ্মাও এভাবে চিন্তা করে? সস্তা নভেল আর সস্তা সিনেমা মানুষ আর জীবনকে যে বেচারীর কাছে এত সস্তা করে দিয়েছিল যে নিজের সুন্দর দেহটার সাহায্যে পরমেশ্বরের মত মানুষকেও জব্দ করতে যেতে

এই সেদিনও যার দ্বিধা জাগেনি ? সেদিন মা বলে ডেকে পরমেশ্বর কি তার এই দশা করেছে ?

এ ভাবে চিন্তা করতে অনুভব করতে শিখিয়েছে ?

কিন্তু মা বলে ডেকেই যদি বিষিয়ে তোলা কাঁচা মনে মানুষ আর জীবনকে শ্রদ্ধা করার অমৃত সৃষ্টি করে নিজের উপরেও শ্রদ্ধা জাগানো যেত তবে আর ভাবনা ছিল কি !

পদ্মা শুধু ভড়কে গেছে। ভদ্র-জীবনের মিথ্যা আর ফাঁকিগুলিই আরও বেশী করে ধরা পড়ছে তার কাছে।

নইলে সুরঞ্জন অধ্যাপক হয়েছে শুনে আত্মগ্লানিতে তার মন এমন বিরূপ হয়ে ওঠে যে এ বাড়ীতে এসেও একবার ওদের পিছনের অংশটুকুতে যেতে অনিচ্ছা বোধ করে !

ইতিমধ্যে সুরঞ্জন কলেজ থেকে তিন চারবার তাদের বাড়ী গিয়েছে। তার জন্যই গিয়েছে সে তো জানা কথাই।

চাকরী পাওয়ার আগে পর্য্যন্ত সুরঞ্জন খুব সংযতভাবে তার সঙ্গে মিশত। ঘনিষ্ঠতা বাড়াবার কোন চেষ্টাই করত না। এখন সে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। অত্যন্ত সদিচ্ছা নিয়েই চায় তাতে সন্দেহ কি !

কিন্তু চাকরী পাওয়া না পাওয়ার উপরেই যে সদিচ্ছা নির্ভর করে সেটা সার্থক করার জন্য তার সঙ্গে এবার বেশী করে মিলে মিশে একটা ভালবাসা তৈরী করে নেবার কোনই তো দরকার নেই।

সোজাসুজি বিধুভূষণের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করলেই পারে। ভাল ছেলে, ভবিষ্যৎ আছে। বিধুভূষণ রাজী হয়ে যাবে।

তার মতামত ?

ছাত্র সুরঞ্জনকে কত সুযোগ সে দিয়েছে তার মতামত জেনে নেবার—তখন জেনে নিলে তার একটা মানে থাকত। আজ অধ্যাপক

হবারও মানে থাকত—অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে ভয় না করে তার জন্য দুঃসাহসের সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হয়েছে।

অধ্যাপক হবার পর, ভবিষ্যৎ উন্নতি সুনিশ্চিত হবার পর নিশ্চিন্ত হয়ে আজ তার মতামত জানার চেষ্টা কি ছেলেখেলা নয়? সুবোধ সুশীল কাপুরুষেরা যে খেলা খেলে?

তবু অনিচ্ছা জয় করে একবার যেতে হয়। না গেলে ভাল দেখাবে না।

কান্তিলাল পিছনের সিটে আরাম করে বসেছিল, পদ্মাকে বেরিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করে, ফিরতে দেরী আছে?

দেরী থাকলে সে আরও আরাম করে বসে ঘুমের আয়োজন করবে! যখন তখন যেখানে সেখানে ইচ্ছামত ঘুমিয়ে নিতে পারে বলেই কি ওর মুখে চিন্তা ভাবনার এতটুকু ছাপ নেই? অথবা চিন্তা ভাবনা নেই বলেই এভাবে ঘুমোতে পারে?

পদ্মা বলে, খানিকটা দেরী আছে।

সুরঞ্জনদের দরজার দিকে চলতে চলতে পদ্মা অনুভব করে কান্তিলালের দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে, কিন্তু সে দৃষ্টি উদাস, নির্ব্বিকার।

দু'টি ঘরে সুরঞ্জনদের কোন অন্তবিধা নেই। মানুষ তারা তিনটি—অচিন্ত্য, অহল্যা আর সুরঞ্জন।

সুরঞ্জন খুসী হয়ে বলে, এসো, বোসো। গাড়ী কিনে খুব বেড়াচ্ছ দেখছি।

: বেড়াব না? বেড়াবার জন্যেই তো গাড়ী কেনা!

পদ্মা একটু হাসে। কিন্তু সে ভিতরে বোধ করে অস্বস্তি। সুবোধ সুশীল কাপুরুষ? কে জানে! জীবনকে যারা হাল্কা ভাবে না তারা হয় তো এরকম ধীর শান্ত সংযতই হয়।

কিন্তু সারাজীবন তার কথায় উঠতে বসতে যে প্রস্তুত তার কাছে সে অস্বস্তি বোধ করে কেন ?

অল্পক্ষণের মধ্যেই পদ্মা উঠে পড়ে।

বলে, পাড়া ছাড়বার পর এই প্রথম পাড়ায় এলাম, চেনা লোকদের সঙ্গে দেখা করে আসি।

এইটুকু সময়ের মধ্যে সত্য সত্যই কান্তিলালের ঘুম এসে গিয়েছিল—তবে ঘুমটা গাঢ় হয় নি। পদ্মা ডাকতেই সে চোখ মেলে তাকায়।

ঃ চলুন তো একটু—কাছেই।

কান্তিলাল নিজের সিটে গিয়ে গাড়ীতে ষ্টার্ট দেয়।

কাছে বলে কাছে, এই পাড়াতেই বিনোদের হলুদ রঙের বাড়ীটার সামনে পদ্মা গাড়ীটা দাঁড় করায়! দূরত্ব একশ গজের বেশী হবে না!

কান্তিলাল মুচকে হাসে। নতুন গাড়ী দেখাতে এসেছে।

তার সে হাসি দেখতে পেয়ে পদ্মা চটে যায়।

ঃ হাসছেন যে? ভাবছেন গাড়ী পেয়ে খোঁড়া হয়েছি ?

ঃ না না, আমি কিছু ভাবি নি।

ঃ বন্ধুদের গাড়ীটা দেখাতে এসেছি। নইলে এটুকু আসতে গাড়ী লাগত না।

কান্তিলাল সায় দিয়ে বলে, নতুন গাড়ী কিনেছেন, পাঁচজনকে দেখাবেন বৈকি ?

বাড়ীর ভিতরে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে পদ্মা আবার বেরিয়ে আসে। তার সঙ্গে আসে বিনোদের সমগ্র পরিবারটি।

গাড়ী দেখে সকলে নানারকম মন্তব্য করে, খুশী আর প্রশংসার মন্তব্য।

প্রণব বলে, বাঃ, সুন্দর ছোটখাটো গাড়ীটি। দেখে লোভ হচ্ছে।

বাবা সেকেলে ধ্যাড়ধেড়ে গাড়ীটা আঁকড়ে আছেন। বললে বলেন, আজকালকার গাড়ী কি টেঁকসই হয়? এসব পুরোণো মডেলের গাড়ী মজবুত কত।

ঃ বিনোদবাবু বাড়ী নেই?

ঃ বাবা ওপাড়ায় গেছেন—পূজো কমিটির মিটিং হচ্ছে। ভেতরে এসো?

ঃ না, আমি যাই। ওরা সবাই ওয়েট করছে, এবার বাড়ী ফিরব।

শুনে কেউ আর কিছু বলে না। মনটা খুঁত খুঁত করে পদ্মার। সাধে কি এ পাড়ার মানুষদের সঙ্গে তাদের মিশ খেত না। হালচাল বুঝে কথা কইতে জানে না। কি তার দরকার ছিল এ কথাটা উল্লেখ করার যে আর সকলে মহেশ্বরে বাড়ীতে অপেক্ষা করছে!

সে একা গাড়ী দেখাতে এসেছে, আর কেউ এলনা এদের বাড়ী। পাড়ায় এসে অন্যদের সঙ্গে দেখা করল, তাদের বাড়ী এল না। এদের মনে লেগেছে, অপমান হয়েছে।

পদ্মা ভাবে, কত প্যাঁচ সংসারে মানুষের মেলা মেশায়!

বিধুভূষণের বিদায় নেবার সময় মহেশ্বর আবার বিশেষভাবে তাদের পূজা দেখে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখে।

পদ্মা জিজ্ঞাসা করে, কোথায় পূজা হবে?

ঃ ওই বারান্দায় প্রতিমা বসাব। জায়গা বড় কম হল, উপায় কি!

বিধুভূষণ বলে, বাড়ীব মধ্যে পূজা করার বড় অসুবিধা। একটা সদর দরজা দিয়ে অত লোকের আসা যাওয়া—

মহেশ্বর বলে, উপায় কি? বাড়ীর পূজা বাড়ীর মধ্যেই করতে হবে।

কোথা দিয়ে বর্ষা কেটে গিয়ে শরৎ এসে গিয়েছে।

বর্ষার গোড়ায় তারা এসেছিল। বেশীদিন বাকী নেই দুর্গা পূজার।

মহেশ্বর চায় এবার সে মহাসমারোহে পূজা করবে।

কলকাতা সহরে পয়সা খরচ করলে কোন আয়োজন করতেই বেশী সময় লাগে না।

তাদের সাত পুরুষের পূজা।

দেশের বাড়ীতে বেশ ঘটা করেই হত। দেশ ছেড়ে আসার মনোবেদনায় ঘটাটা একটু বাড়িয়েই দিতে চায় মহেশ্বর।

পরমেশ্বর একবার বলেছিল, খরচপত্রও কম করাই উচিত মহেশ্বর। সমারোহ কমিয়ে দাও। বাড়ীটা কিনতে অনেক টাকা গেছে।

মহেশ্বর বলেছিল, মা ফেলেছেন দুর্দ্দশায়। দুর্দ্দশায় পড়লে আরও বেশী ঘটা করে মার পূজা করতে হয়।

: আগামী বছরও করতে হবে তো। মা তো আর ছেড়ে কথা কইবেন না!

: মার পূজো মা-ই করিয়ে নেবেন।

অনেক কথা বলে ফেলেছিল পরমেশ্বর। আর সে কিছু বলে নি। নিলে সব দায়িত্বই তার। সে বড় ভাই। কিন্তু টাকার ভাগও সে কোনদিন নেয় নি, কোন দায়িত্বও কখনো গ্রহণ করে নি।

ছয়

কারো অসুবিধা ঘটাবার জন্য সঙ্কোচ বোধ করার কারণ সবিতার ছিল না। একতলাটা সম্পূর্ণ দখল করার বদলে পরমেশ্বর মাত্র একখানি ঘর নিজের জন্য নেওয়ায় স্থানের মোটেই অভাব ছিল না।

তাছাড়া সবিতা তাদের ঘরখানার জন্য ভাড়া দেবে।

দশ টাকা ভাড়া নিতে রাজীও হয়েছে সাধন।

তবু সবিতার অস্বস্তি ঘোচে না!

সে মাকে বলে, এখানে থাকতে ভাল লাগে না মা!

মানদা বলে, কেন? ভগবানের দয়া ছিল তাই বদলোকের পাল্লায় না পড়ে এখানে ঠাঁই পেয়েছি। বিপদে আপদে এঁরা সহায় হবেন।

: সেই জন্যেই তো। একে আমরা গরীব, তায় একেবারে নিঃসহায়। খালি মনে হয় যেন এদের দয়ায় এদের আশ্রয়ে আছি!

: অত খুঁত খুঁতে হতে নেই। মেয়েছেলে না তুই?

: মেয়েছেলের বুঝি মান-সম্মান নেই?

মানদা বিরক্ত হয়ে বলে, কি জানি বাবু, তোর সাথে তর্ক করে পারি না।

পাশের বাড়ীতে নিশীথ একখানা ঘরের ভাড়াটে। একটু তেরচা ভাবে হলেও সবিতা আর তাদের দুটি ঘরের জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরের খানিকটা দেখা যায়।

নলিনী জানালায় পর্দ্দা দিয়ে রাখে। জানালার তলার দিকে রঙীন কাপড়ের সুন্দর পর্দ্দা। তবু দাঁড়ানো মানুষের বুক পর্য্যন্ত উপরের দিকটা দেখা যায় সবিতাদের ঘর থেকে।

শুধু নিশীথ আর সবিতার। তাদের তিন বছরের ছেলেটির নয়।

জানালায় দাঁড়িয়ে নলিনী তার সঙ্গে আলাপ করে। তারা কোথা থেকে এল, কেন এল, ক'জন এল ইত্যাদি নানা বৃত্তান্ত জেনে নেয়।

প্রশ্ন করে, ঘরটা তোমরা ভাড়া নিয়েছ ?

: হ্যাঁ।

: একখানা ঘর ? কত ভাড়া ?

: দশ টাকা।

শুনে চোখ বড় বড় করে নলিনী বলে, সত্যি ?

তার অবাক হবার মানেটা সবিতা বুঝতে পারে কয়েকদিন পরে। নলিনী তাকে তার ঘরে বেড়াতে যাবার আহ্বান জানিয়ে রেখেছিল। সবিতারও কৌতূহল ছিল জানালা দিয়ে আংশিক ভাবে দেখা ঘরখানা ভাল করে দেখবে।

তাদের ঘরের চেয়ে ছোটই হবে ঘরখানা। আসবাবপত্র খুব বেশী দামী নয় কিন্তু ঘরখানা যেন ছবির মত সাজানো।

: এসো ভাই, বোসো।

নলিনী তাকে বসতে দেয় ছবি আঁকা সিঙ্গাপুরী মাদুরে—বোঝা যায় মাদুরটি খুবই পুরাণো কিন্তু যত্নে রাখায় জীর্ণ হয় নি।

সবিতা বলে, আপনারা কদিন এখানে আছেন ?

: বছর খানেক আগে ছিলাম ওই শশধর বাবুর বাড়ী। লোকটা এক একদিন মদ খেয়ে এমন হল্লা করত ! কি ভয়ে ভয়ে যে থাকতাম কি বলব তোমাকে ! এ ঘরখানা পেয়ে যেন বেঁচেছি।

: কত ভাড়া দেন ?

: লাইট নিয়ে পঁয়ত্রিশ টাকা।

শুনে এবার সবিতা চোখ বড় বড় করে তাকায়।

: এত ভাড়া ? একখানা ঘর পঁয়ত্রিশ টাকা ?

নলিনী হাসে।

: ভাড়া আজকাল এই রকম দাঁড়িয়েছে। দু'পাঁচ টাকা কম বেশী হবে। তোমরা দশ টাকায় অমন ভাল একখানা ঘর পেয়েছ শুনে তাই তো অবাক হয়ে গেছি। আত্মীয়তা আছে ?

: না। একমাস আগে চেনাও ছিল না।

: ওরাও বোধ হয় রেট জানেন না, তাই।

বাড়ী ফিরেই সে বলে, আর এখানে থাকা হয় না মা।

: কেন ?

: ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়ার ঘরে থাকা আমাদের পোষাবে না।

: অত কেন ? ওরাই তো দশ টাকা ভাড়া বলে দিয়েছে।

: সে ওরা দয়া করে বলেছে। আমরা দয়া নিতে যাব কেন ? একটা কম ভাড়ার ঘর খুঁজে নিতে হবে তাড়াতাড়ি !

মানদা চটে বলে, তুই বড় বাড়াবাড়ি করিস !

সবিতা শান্তভাবে বলে, বাড়াবাড়ি কিসের মা ? বাবা থাকলে এ রকম দয়া নিতেন ? তুমি পরের ঘর থেকে এসেছো, তোমার গায়ে লাগে না,—আমি তো বাবার মেয়ে ! এমনি উপকার নিতে পারি, মাসের পর মাস দয়া নিতে পারব না হাত পেতে।

পঙ্কজকে সে জিজ্ঞাসা করে, কম ভাড়ার ঘর পাওয়া যায় কোথা ?

: কত কম ?

: আট দশ টাকা।

পঙ্কজ সোজাসুজি ডোবাটার ওপাশের বস্তিটা দেখিয়ে দিয়ে বলে, ওখানে। আরও কমেও পাবে—তিন চার টাকার ঘরও আছে। এখানে থাকবে না বুঝি ?

ঃ না।

কারণটা শুনে পঙ্কজ একটুও আশ্চর্য্য হয় না। বরং সায় দিয়ে বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম।

সবিতা আশ্চর্য্য হয়ে বলে, বলেন কি! কি থেকে ভাবলেন?

পঙ্কজ হেসে বলে, তোমার মাথা একটু খারাপ আছে জানি তো?

ঃ বটে?

ঃ অন্য কেউ হলে খুসীই হত—আরও সুযোগ সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করত। কিন্তু তোমার কিনা মাথা খারাপ, ছেলে সেজে পথে বার হও, তুমি ঠিক উল্টোটা ভাববে। গরীব হয়ে বড়লোকের সঙ্গে খাতিরের সম্পর্ক রেখে তুমি চলতে পারবে না।

সবিতা খুসী হয়ে বলে, তাই বলুন!

তুলসী মহেশ্বরদের বাড়ী কাজ করতে এলে সবিতা জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের ওদিকে ঘর খালি আছে বলতে পার?

ঃ কেন গা? ঘর কি হবে?

ঃ ভাড়া নেব।

ঃ এখানে রইবে না? এ ঘর কি দোষ করলে গা? ভাড়া বেশী তো নয় মোটে! কপালজোরে দশ টাকায় এমন ঘর পেয়ে গেছ!

ঃ কপালজোরে কাজ নেই। তুমি যাবার সময় আমায় ডেকে নিয়ে যেও।

কাজেই তুলসীর মারফতে খবরটা জানাজানি হয়ে যায়।

তুলসী সুরমাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের ভাড়াটে উঠে যাবে কেন গো? বনিবনা হল নি?

সাধন চা খাচ্ছিল কাছে বসে। সে বলে, তোমায় কে বললে উঠে যাবে?

: ওই মেয়েই বললে। মোর সাথে ঘর দেখতে যাবে বস্তিতে।

: তাই নাকি? কখন বললে?

: এই তো আসতে না আসতে চেপে ধরেছে, ঘর খালি আছে তোমাদের ওদিকে? সস্তা ঘর? আমি বললাম, দশ টাকায় এমন ঘর পেয়েছো, মন উঠছে না? তা কোন জবাব দিলে না।

তুলসী কলতলায় চলে গেলে প্রতিমা বলে, ব্যাপার কি? এমন সুবিধে ফেলে চলে যেতে চায়? নিশ্চয় কিছু হয়েছে।

বলে সে বিশেষ এক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সাধনের দিকে তাকায়।

সাধন গম্ভীর হয়ে বলে, হবে আবার কি? ও তোমাদের সঙ্গে থাকতে চায় না—এই হল ব্যাপার! বড়লোকের মেয়ে তোমরা, কত উদারতা দেখিয়ে গরীব বেচারীদের ঘরে স্থান দিয়েছ, সারাদিন তাই ভালভাবে একটা কথা কইবার সময় পাও না। এভাবে থাকবে কেন?

সুরমা বলে, দোষটা শেষে হল আমাদের?

সাধন বলে, বাপের পয়সায় দুধ ঘি খেয়ে ক্রিম পাউডার মেখে রঙীন শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে ঘুরে বেড়াও—ওকে তোমরা বুঝবে না। আমার সঙ্গে তোমবা কলকাতা আসতে ভরসা পাওনা, আমি যে মোটে একজন ব্যাটা ছেলে। তোমাদের আনবার জন্য জ্যাঠামশাইকে লোক পাঠাতে হয়। ওর বাপ নেই ভাই নেই, একগাদা টাকাও নেই, তবু ও একলা ব্যবস্থা করে মা আর ভাইবোন দুটিকে কলকাতা পার করে এনেছে।

সুভাগিনী বলে, তুই কি পাগল হলি সাধন? কি যা তা বকছিস? ওরকম পাকামি করা কি ভাল কোন মেয়ের পক্ষে? সৎ ঘরের ভাল ঘরের কোন মেয়ে ওরকম করে? বাপ ভাই না থাক—আর কি কেউ ছিল না, খুড়ো জ্যাঠা মামা মেসো আত্মীয় কুটুম? নরম হয়ে বললে

তারা কি সাহায্য করত না? তুই খালি বীরত্ব দেখছিস মেয়েটার। বীরত্ব না ছাই, এ হল পাগলামি মেয়েটার—বদ্ খেয়াল।

: তুমি বুঝবে না মা।

: আমি সব বুঝি। গুরুজন কেউ থাকলে বজ্জাতি করার অসুবিধা হবে—তাই নিজেই পুরুষ ছেলে সেজে মস্ত বাহাদুরী করেছেন। এখানে আমরা মায়া করে ঠাঁই দিয়েছি—আমাদের চোখের সামনে যা খুসী করতে পারছে না। তাই ঝোঁক চেপেছে উঠে যাবার।

সুরমা চুপ করে থাকে।

প্রতিমা খুসী হয়ে বলে, তুমি ঠিক বলেছ মা।

সাধন বলে, তুমি দু'চারশো বছর পিছিয়ে আছো মা। তুমি বুঝবে না। অ্যারিষ্ট্রোকেট মেয়েরা যা খুসী করে—তাদের তোমরা দোষ দেও না। একটি মেয়ে দু'চার বছর একলা সারা পৃথিবী টহল দিয়ে এল—তাকে তোমরা মেনে নিচ্ছ। তিনি মেয়েদের মুক্তি দিচ্ছেন—কত কি করছেন! কিন্তু গরীব ঘরের মেয়ে একটু স্বাধীন হতে চাইলেই তোমরা সেটা ধরে নাও বজ্জাতি! সে যে মোটর এরোপ্লেন চড়ে না, ইংরাজীতে কথা কয় না, হোটেলে খানা খেতে জানে না!

সুভাগিনী রেগে বলে, সাধন!

সাধনও রেগে বলে, মা!

: আমাকে মারবি নাকি তুই? মার মার!

প্রতিমা বলে, তাই করো। একটা চাবুক এনে মাকেও মারো, আমাদেরও মারো।

সাধন আগে চা খেয়ে জলখাবার খায়। ভেজাল চায়ের স্বাদে তার নাকি মুখটা বিশ্রী হয়ে থাকে নইলে।

আধ ভর্ত্তি চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট সে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

বলে, আমি শুধু কথা বললাম। আমার কথা শুনেই তুমি বলতে পারছ আমি তোমায় মারতে পারি? প্রতিমা চাবুক দিয়ে মারতে বলছে। আমার কোন অপরাধ হয়েছে নিশ্চয়! কি অপরাধ করেছি বুঝতে পারছি না।

তার ভাব ভঙ্গি এবং কথা শুনে সকলেই একটু ভড়কে গিয়ে চুপ করে থাকে।

: আমি দু'দিন নির্জলা উপোস করব।

খানিকক্ষণ সবাই চুপ করে থাকে।

মহেশ্বরের ছেলে পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে পুরো দু'দিন সে নির্জলা উপোস করবে—এর পর কথা বলতে যাওয়া মুস্কিলেরই কথা।

সুরমা বলে, চা খাবারটা খাচ্ছিলে খেয়ে নাও?

: না। দুদিন কিছু স্পর্শ করব না।

সুভাগিনী হঠাৎ কেঁদে ফেলে, সেই মার তবে মারলি তুই আমাকে? একটু তোর মায়া দয়া হল না?

: আত্মশুদ্ধির জন্য উপোস করব। তোমাদের কি ক্ষতি করলাম?

সবিতাকে সাধন নিজে ঘরে ডেকে নিয়ে আসে। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও আহত মনে হয় তাকে।

বলে, বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

: তবেই সেরেছে! একটা কিছু দোষ করেছি নিশ্চয়!

মোটা মিলের শাড়ীতেও তার রোগা ছিপছিপে দেহটিতে যে অপরূপ সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব ঘটা সুরু হয়েছে সেটা চাপতে পারে নি। রঙ তার খুব বেশী উজ্জ্বল নয়, কোমল লাবণ্যে যেন চাপা পড়ে আছে।

মুখখানা শান্ত কোমল। দেখলে মায়া হয়।

দেখে কল্পনাও করা যায় না তার মধ্যে মেয়েলি লাজুকপনার কত অভাব, কত সুদৃঢ় তার আত্মপ্রত্যয়! মেয়ে হয়ে জন্মে কিভাবে ভিতরটা তার এভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে কে জানে!

: কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না?

সবিতা সরলভাবে হাসে।

: কিভাবে বলব ভাবছি। সোজাসুজিই বলি। ঘর খুঁজছ কেন?

: আমিও সোজাসুজি বলি। ঘরের ভাড়া খুব কম ধরেছেন।

: বাড়িয়ে দেব?

: সে আপনাদের ইচ্ছা। যত ভাড়া হওয়া উচিত, তত ভাড়া দিয়ে থাকতে পারব না।

: কত ভাড়া হওয়া উচিত তুমি ঠিক করলে কি করে?

: আরও দশজনে তো এ রকম ঘর ভাড়া নিয়ে আছে।

সাধন মাথা নাড়ে।

: এ যুক্তি ঠিক নয়। অন্য বাড়ীওয়ালা যদি ভাড়াটের গলা কেটে বেশী ভাড়া নেয়, আমরা সে অন্যায়টা করব কেন?

সবিতা হেসে বলে, দশজনে করছে, আপনারা না করলেই তার মানে দাঁড়াবে আমাদের খাতির করছেন।

: একটু খাতির করলে দোষ কি?

: অবস্থা বিশেষে দোষ আছে বৈকি। আমরা গরীব।

সাধন একটু চুপ করে থাকে।

: তুমিও বন্ধুত্ব স্বীকার কর না?

: করি না! আপনি তবে বন্ধু হলেন কি করে?

: বন্ধুর মনে কষ্ট দিয়ে কি করে চলে যাবে? শোন, তোমায় স্পষ্ট করে বলি—তোমরা গরীব বলে দয়া করে আশ্রয় দিই নি। তোমরা

গরীব কি বড়লোক আমি জানি না—তোমায় আমার ভাল লেগেছে। তোমরা চলে গেলে সত্যি আমার মনে কষ্ট হবে।

সবিতা একটু চুপ করে থাকে।

: একটা কথা আপনি বুঝলেন না। বাড়ীতে আপনি একা নন।

: তাতে কিছু আসে যায় না।

: এটা কি বলছেন আপনি? আসে যায় না মানে তো এই যে আপনার জন্য কেউ মুখে কিছু বলবেন না, মনে যাই হোক চুপ করে থাকবেন। আমরা এভাবে বেশী দিন ঘর জুড়ে থাকলে সবাই নিশ্চয় সেটা অপছন্দ করবেন, বিরক্ত হবেন। হবেন কেন, ইতিমধ্যেই হয়েছেন। কিন্তু আপনার জন্য উপায় নেই তাই সবাই মেনে নিয়েছেন আমাদের। ঠিকমত ভাড়া দিলেও বরং কথা ছিল!

সাধন আশ্চর্য্য হয়ে শোনে। মনে হয় যেন শিশুর মুখে সংসারের জটিল সমস্যার পাকা ব্যাখ্যা শুনছে—তার নিজের যেদিকটা খেয়ালও হয় নি।

সবিতা যে সত্য কথাই বলেছে তাও অস্বীকার করার উপায় নেই।

পরম উদারতার সঙ্গেই গোড়ায় সকলে সবিতাদের বাড়ীতে উঠিয়েছিল—একটা মহৎ কাজ করে খুসীই হয়েছিল সকলে। সবিতা ভাড়া দেবার কথা তোলায় সকলে অপমান বোধ করে। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। ক্রমে ক্রমে সাধন টের পেয়েছে যে ধীরে ধীরে উদারতা উপে গিয়ে প্রায় সকলের মধ্যেই এসেছে কম-বেশী বিরক্তির ভাব।

তাদের পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা গেলেও বরং কথা ছিল, সকলে এতটা বিরক্ত হত না। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তাদের সকলের মধ্যে একটা ঘর নিয়ে ওরা বাস করবে, তাদের পরিবারের কোন ব্যাপার ওদের

অগোচর থাকবে না, সারাদিন বাধ্যতামূলক মেলামেশা চলবে—এ কথা ভেবে মনটা বিগড়ে গেছে সকলের।

একটা পার্টিসন তুলে কোণের দিকের ঘরখানায় সবিতাদের থাকবার ব্যবস্থা করার কথাও উঠেছে ইতিমধ্যে।

সবিতা বলে, এবার বুঝলেন তো? এ রকম খাপছাড়া ব্যাপার কি সংসারে চলে? আমরা কেউ নই, সমান দরের লোকও নই, আমরা এসে বারো মাস ঘরের লোকের মত ঘর জুড়ে থাকব—এটা কেন বরদাস্ত করবে সবাই? অবশ্য আপনার কথা আলাদা।

সাধন বিমর্ষ হয়ে বলে, বস্তির ঘরে থাকতে পারবে?

: কেন পারব না? ওখানে মানুষ থাকে না? বস্তিতে সুবিধা না হয়, কাছের ওই কলোনীতে চলে যাব—একটা ঘর তুলে নেব। কলোনীর কথাই আমি বেশী করে ভাবছি।

: আমি যদি ব্যবস্থা করে দিই?

সবিতা একটু ভেবে বলে, দেবেন। কিন্তু ভুলবেন না যেন আমরা গরীব। সামান্য যে টাকা আছে খরচ করে ফেললে চলবে না। কতদিনে কি ব্যবস্থা হয় কিছুই ঠিক নেই।

সাধন তার ডান হাতটি চেপে ধরে বলে, না গো গণেশ, আমি তা ভুলব না। তোমাদের আমি টাকা দিয়ে সাহায্যও করব না, তোমরা যে গরীব তাও ভুলব না।

সবিতা বলে, আমি সত্যি গণেশ নই, মেয়েছেলে—এটাও ভুলবেন না যেন!

সাধন তার হাত ছেড়ে দেয়।

বস্তিতে অঘোরদের বাড়ীতে একখানা ভাল ঘর খালি ছিল। ইঁটের

দেয়াল খোলার চালের বাড়ী। এখানকার অর্দ্ধেক বাড়ী এই রকম, বাকী বাড়ীর দেয়াল কাঁচা।

খালি ঘরখানা ভাড়া করে সবিতারা উঠে যাবার ব্যবস্থা করে। মাসটা কাবার হবার জন্যও অপেক্ষা করে না।

পরমেশ্বর সবিতাকে বলে, বিদায় নিলে?

: হ্যাঁ। কাছেই আছি।

: কাজটা একটু ছেলেমানুষী হয়ে গেল।

তার মুখে কৌতুকের হাসি লক্ষ্য করে সবিতা বলে, এত কাছে থাকতে যাওয়াটা?

: যাওয়াটাই ছেলেমানুষী হল। তা তুমি ছেলেমানুষ বটেই তো, সাংসারিক জ্ঞান-বুদ্ধি পাকে নি। এ অবস্থায় এরকম একটা আশ্রয় পাওয়া গেলে ছাড়তে আছে? আমি হলে তাড়িয়ে দিলেও যেতাম না।

: বাঃ, কোন অধিকারে থাকব?

: এখানে যায়গা আছে, তোমার থাকার যায়গা নেই—এই অধিকারে।

সবিতা হেসে বলে, যায়গা তো কত বাড়ীতেই আছে, থাকবার যায়গাও কত লোকের নেই। তারা সবাই যদি জোর করে—

পরমেশ্বর তার মাথায় হাত দিয়ে বলে, সাধে কি ছেলেমানুষকে বলি ছেলেমানুষ? একদিকে টনটনে পাকা বুদ্ধি—অন্যদিকে স্রেফ বোকামি। তুমি কি জোর করে ঘর দখল করেছ? বিশেষ অবস্থায় তুমি বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেয়েছ, তুমি সেটা নেবে—অন্যদের কথা আলাদা।

সবিতা মাথা নাড়ে।

: নাঃ, আমার মন চায় না, করব কি!

: মনকে চাওয়াতে হয়। মনের ওপর জোর খাটাতে হয়।

প্রণব প্রতিদিন ভোরে অঘোরের বাড়ী দুধ আনতে যায়।

সামনে দোয়ানো দুধ না খেলে বিনোদের না কি পেট ফাঁপে। জল মেশানো দুধের চেয়ে খাঁটি দুধটা তার সহ্য হয় বেশী।

অন্য কেউ দুধ এনে দিলেও তার চলে না। একমাত্র নিজের ছেলেকে ছাড়া আর কারো প্রতি তার বিশ্বাস নেই। নিজেও মাঝে মাঝে যায়—প্রণবকেই যেতে হয় বেশীর ভাগ দিন।

বাড়ীতে গরু নিয়ে এসে অঘোর দুধ দুয়ে দিয়ে যেতে রাজী আছে—গরুর সবটা দুধ কিন্তু নিতে হবে। অনায়াসেই তা নিতে পারে বিনোদ, তার সংসারের লোকের হিসাব ধরলে দুটো গরুর দুধই তার নেওয়া উচিত, কিন্তু জমা টাকা খরচ করে সকলকে দুধ খাওয়াবার কথা ভাবতেও পারে না বিনোদ।

বিশেষতঃ আজকাল যা দাম দুধের।

সে হতাশ ভাবে বলে, পেনসনের পয়সায় কি আর ভাল ভাবে চালানো যায় আজকাল!

কিছু কিছু জমাতেও হয় পেনসনের টাকা থেকে।

তাই সে ছাড়া বড়রা কেউ দুধ খায় না। বড় মানে যাদের বয়স পাঁচের বেশী।

জবরদস্ত হাকিম ছিল বিনোদ। কড়া হাতে আন্দোলন দমন করে আর স্বদেশীদের জেলে পাঠিয়ে পদোন্নতির পথে মাইনে বাড়িয়ে পয়সা রোজগার করেছে, একস্‌টেনসেন টেনে টেনে অবশেষে পেনসন নিয়েছে দেশে ভাগের স্বাধীনতা আসবার বছর তিনেক আগে।

তার টাকার মায়া দাঁড়িয়েছে অদ্ভুত রকম। তার ঠিক কৃপণতা

নয়—সাধারণ কৃপণের পয়সা খরচ করতেই কষ্ট হয়। তার কিন্তু কতগুলি বিষয়ে হাত খুব দরাজ, অম্লানবদনে টাকা খরচ করে। আবার কতগুলি বিষয়ে সে কৃপণের চেয়েও অধম।

বাড়ীটি তার দামী আসবাবে সাজানো, রেডিও ইত্যাদির অভাব নেই, ছেলেমেয়েদের বেশ ভূষায় কৌলীন্যের ছাপ, বাড়ীতে সে চাকর রাখে এবং মালী দিয়ে বাড়ীর সামনের বাগানটির সৌন্দর্য্য বজায় রাখে।

কিন্তু পয়সা খরচের ভয়ে আত্মীয় বন্ধু কাউকে সে বাড়ীতে ডাকে না, কোন সম্পর্ক রাখে না—দু'একজন ছাড়া। নিজের বিবাহিতা মেয়ে দুটিকে পর্য্যন্ত সে দু'চার দিনের বেশী পুষতে রাজী হয় না—পেনসনের অজুহাতে মেয়েদের মারফতেই জামাইদের কাছ থেকে খরচ আদায় করে নেয়।

সাধারণ অবস্থার আত্মীয়স্বজনের বাড়ী সে বিয়ের নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত রাখতে যায় না, বাড়ীর লোককেও যেতে দেয় না—কিছু দিতে হবে এই জন্য !

নিজের মান বাঁচাতে তাকে দিতে হবে দামী জিনিষ—কিন্তু তার বাড়ীতে কোন কাজ হলে গরীব বলে ওরা নিমন্ত্রণ রাখতে আসবে হয় শূন্য হাতে, নয় সামান্য কিছু উপহার নিয়ে।

দু'চার জন আত্মীয় বন্ধু, যাদের কাছে সমান সমান প্রতিদান প্রত্যাশা করা যায়, তাদের সঙ্গেই সে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে।

এটাই আসল কথা তার কার্পণ্যের !

টাকা খরচ করলে প্রতিদানে তার কিছু পাওয়া চাই।

দুধ যে সে কাউকে খেতে দেয় না, মাছ মাঝে মাঝে শুধু একবেলার মত অল্প পরিমাণে আসে, সস্তা তরকারী দিয়ে রেশনের চাল রুটিতেই সকলকে পেট ভরাতে হয়, তার কারণও তাই।

শরীর তো সুস্থই আছে সবার। ভাল খাওয়ার জন্ম পয়সা খরচ করে লাভ কি?

মেয়ে সেজে গুজে বাইরে গেলে, ছেলে দামী সুট পরে কলেজে গেলে দশজনে সেটা দেখবে—বলবে এরা বিনোদবাবুর ছেলে মেয়ে।

কিন্তু কে দেখতে আসবে ঘরে বিনোদবাবুর রোজ পোলাও মাংস রান্না হয়?

দেখাবার যেদিন দরকার হয় সেদিন তাই হাত খুলে যায় বিনোদের, দামী দামী জিনিষ রান্না হয় সমারোহের সঙ্গে।

অঘোর আয়োজন করে দুধ দোয়ার।

উঠানে দাঁড়িয়ে মণ্টুকে প্রণব বলে, তোমাদের বুঝি নতুন ভাড়াটে এল?

মণ্টু বলে, হ্যাঁ।

পাশেই সবিতা তোলা উনান সাফ করে কয়লা সাজাচ্ছিল। তার দিকে চেয়ে থেকে প্রণব এবার বুনোকে বলে, তোমাদের যেন কোথায় দেখেছি খোকা?

বুনো চুপ করে থাকে।

সবিতা বলে, আমরা ঈশ্বরবাবুর বাড়ীতে ছিলাম।

: ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। দেশ থেকে মহেশ্বর বাবুদের সঙ্গে তোমরা এসেছ না?

সবিতা সায় দিয়ে বলে, আপনি হলুদ রঙের বাড়ীটাতে থাকেন না?

প্রণবও সায় দিয়ে সাগ্রহে বলে, তুমি সেই মেয়েটি না যে ছেলে সেজে এসেছিল?

সবিতা হেসে বলে, আপনি কার কাছে শুনলেন?

: পঙ্কজ বলেছে। এইখানে দুধ নিতে এসেই গল্প করেছিল। শুনে ভারি ইচ্ছা হচ্ছিল তোমার সঙ্গে আলাপ করি।

: গেলেন না কেন?

: ভাবলাম, কে জানে, মেয়েছেলে—যদি কিছু মনে করে! তুমি এমন আলাপী জানলে নিশ্চয় যেতাম।

ইতিমধ্যে পাত্র হাতে পঙ্কজ এসে দাঁড়ায়।

সবিতা বলে, আপনি বুঝি গণেশের গল্পটা দেশ শুদ্ধ লোককে শুনিয়ে বেড়িয়েছেন?

পঙ্কজ বলে, নিশ্চয় শোনাব! গাঁয়ের একজন সামান্য ব্যবসায়ীর মেয়ে এমন সাহসের পরিচয় দিতে পারে—এ গল্প সবার শোনা উচিত।

: লিখে ছাপিয়ে দিন।

বলে উনান ধরিয়ে দিয়ে সবিতা ঘরে চলে যায়।

প্রণব বলে, তুমি ভারি অন্যায় করছ ভাই। বেচারীকে বিপদে ফেলছ।

: কেন?

: সামনা-সামনি প্রশংসা করে আকাশে তুলে দিচ্ছ, ওর মাথা বিগড়ে যাচ্ছে। এর ফলে একগুঁয়েমি আসবে—নিজে যা ভাল বুঝবে তাই করতে চাইবে। একদম ভুলেই যাবে সংসারে একটু সামঞ্জস্য করে চলা দরকার।

ঘরে বিছানা তুলতে তুলতে সবিতা তার কথাগুলি কাণ পেতে শোনে।

মানদার জ্বর হয়েছে।

এখনো সে ওঠে নি। কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে এককোণে।

একটিমাত্র মশারি। তার নীচে মানদা ছেলেমেয়েদের শোয়ায়। ছোট মশারি, তিনজনকেই গাদাগাদি করে শুতে হয়। মানদা ভিন্ন শোয়—মশারি ছাড়া।

: তোমায় মশা কামড়াবে না ?

: কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুই না আমি ?

বুনো উঠেছে, বাইরে গেছে। নিজেই মুখ হাত ধুয়েছে। অপেক্ষায় আছে কখন খাবার পাবে।

বেলা উঠে ঘরের মধ্যে ক্ষীণ স্বরে কাঁদছে।

ওর মুখ ধুইয়ে দিতে হবে, ওকে খেতে দিতে হবে।

মানদার জ্বর বেড়েছে—গায়ে হাত দিয়ে না দেখলেও টের পাওয়া যেত। কারণ, জ্বর না বাড়লে মানদা কাঁথা মুড়ি দিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে পারত না—যেন সে মা নয়, তার যেন ছেলে মেয়ে নেই।

শুধু ভাই-বোন নয়, মার দায়িত্বটাও আজ পূরো মাত্রায় সবিতার।

বিছানা তুলতে তুলতে তাই সে প্রণবের কথাগুলি কাণ পেতে শোনে।

বিছানা তুলে বাইরে যখন যায় প্রণব আর পঙ্কজ দুজনেই দুধ নিয়ে চলে গেছে।

মণ্টুকে কাছের দোকান থেকে দু'পয়সায় মুড়ি আনতে পাঠিয়ে দাওয়ায় বসে ধোঁয়ানো উনানটার দিকে চেয়ে সবিতা ভাবে। ভাবে, প্রণবের কথাই কি ঠিক ?

আজ তাকে সব দায়িত্ব সব ভার বইতে হবে একা। শুধু ভাই বোন দুটির ভার নয়,—মার জ্বরের ভার পর্য্যন্ত।

সকাল বেলাই এত জ্বর—এ জ্বর কত বাড়বে ঠিক নেই।

সেই কর্ত্রী সব কিছুর। সে যা করবে তাই হবে।

তাই তাকে এদিকে ক্ষিদে মিটিয়ে বেঁচে বর্তে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে ভাই-বোন ছুটির, ওদিকে ডাক্তার এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে মার।

এসব নয় করল। সেজন্য সবিতা ভাবে না। এক মূহুর্তের জন্ত বিশ্রাম সে নয় না পেল, সেজন্য কিছু আসে যায় না।

সে সব কিছুই সামলে চলতে পারবে।

কিন্তু কত দিন পারবে?

হাতের টাকায় যে ক'টা দিন চলবে শুধু সে ক'টা দিন!

ছুরাশা কিনা জানে না, সে স্থির করেছিল চারিদিক বুঝে শুনে বিচার-বিবেচনা করে মাস ছু'য়েকের মধ্যে কোন একটা রোজগারের ব্যবস্থা করে নেবে। যত সামান্যই হোক—নিয়মিত একটা উপার্জ্জনের ব্যবস্থা। শাক-ভাত খেয়ে কোন রকমে হোগলার চালায় ভাই-বোন মাকে নিয়ে যাতে বেঁচে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা।

কিন্তু উনান ধরিয়ে বাসন মেজে খাদ্য আর পথ্য রেঁধে, ভাই-বোনদের নাইয়ে খাইয়ে, মার সেবা করে যদি তার দিনটা কেটে যায়—ব্যবস্থা সে করবে কি করে?

ঘরেই যদি সে আটকে থাকে, বাইরে না বেরোতে পারে—তার পক্ষে কিছু করা কি সম্ভব?

ধোঁয়াটে উনানের সামনে বাঁধানো রোয়াকে বসে তার মনে হয়, পরমেশ্বর যা বলেছিল প্রণবও যেন আবার তার কথারই প্রতিধ্বনি করে গেছে।

একটা মীমাংসা দরকার।

সে তো জানে যে শেষ পর্য্যন্ত তার দেহটাও বিক্রী করা দরকার হতে পারে!

মানদা জ্বরের ঘোরে ডাকে, সুবি!

রেখা কান্নার মধ্যে ডাক চালায়, ভিভি! ভিভি! মণ্টু সামনে দাঁড়িয়ে থাকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বালকের মত।

সব দায়িত্ব ফেলে সবিতা হঠাৎ বেরিয়ে যায়। তার খেয়ালও থাকে না যে ভদ্রলোকদের যে পাড়ায় সে যাচ্ছে সেখানকার মেয়েদের নিয়ম অনুসারে সকালবেলা গায়ে সে সায়া ব্লাউজ চড়ায় নি—মৃত বাপের একটা ধুতি দিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছে।

পরমেশ্বর দাওয়ায় বসে চা খাচ্ছিল।

কাপ নামিয়ে রেখে সে বলে, মা, সকাল বেলাই কালী হয়ে এলে? এসো, আমার ঘরে এসো। সুরমা, একটা সুজনী বা চাদর এনে দে তো চট করে।

সবিতা বলে, ফিরেই যাই তাহলে। একটা পরামর্শ চাইতে এসেছি—সুজনী এনে দে, চাদর এনে দে! আপনাদের কাছে পরামর্শ চাইতে আসাই বোকামি হয়েছে আমায়।

পরমেশ্বরের মুখের হাসি হঠাৎ মুছে যায়।

হাত জোড় করে সে বলে, মা, আমায় ক্ষমা কর।

: ক্ষমা করতে আমি আসি নি।

বলে সবিতা বেরিয়ে যায়।

পরমেশ্বরের মুখ গম্ভীর! গুম খেয়ে বসে সে যেন কি ভাবছে!

সুরমা ভয়ে ভয়ে বলে, কি হল জ্যাঠামশায়?

পরমেশ্বর হঠাৎ হেসে ফেলে।

: কি হল তাই তো বুঝতে পারছি না। একটা যেন অন্যায় করে ফেললাম মনে হচ্ছে। অন্যায়টা কি করলাম বল দিকি?

তার হাসি দেখে সকলেই স্বস্তি ফিরে পায়।

: ও মেয়েটার কথা বাদ দাও। ও এখন কত রকম কাণ্ড করবে।

পরমেশ্বর বলে, কেন করবে ?

: এইভাবে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

পরমেশ্বর ধীরে ধীরে বলে, সত্যি, এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। তোরা যেন সব বুঝে গিয়েছিস। সব যেন ছকে বাঁধা হয়ে আছে তোদের কাছে। কেউ হাসলেও তার মানে বুঝতে বাকী থাকে না। মানুষ যেন তোদেরি নিয়মে হাসে কাঁদে !

তারা নির্বাক হয়ে থাকে।

চা খেয়ে পরমেশ্বর ধীরে ধীরে বস্তির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে।

চটপট ভাই বোনকে খাইয়ে নিজে খেয়ে বেশ বদলে সবিতা মা'র জন্য ওষুধ আনতে বার হচ্ছিল। ভাবছিল পঙ্কজকে জিজ্ঞাসা করে যাবে কোন ওষুধের দোকানে গেলে ডাক্তারকে অবস্থা বলে ওষুধ আনা সুবিধা হবে।

পরমেশ্বর বলে, এই তো দিব্যি মানিয়েছে। ক্ষমা চেয়ে অন্যায় করেছিলাম, ফিরিয়ে নিতে এলাম। তোমার ও বেশে বাইরে যাওয়া সত্যি অন্যায় হয়েছিল।

: অতটা খেয়াল করি নি।

: সেটা বুঝেছি। খেয়ালও করনি, গ্রাহ্যও করনি ; কিন্তু করতে হবে। দায় ঘাড়ে নিয়েছ, তার মানেই দশজনের সঙ্গে তোমার মানিয়ে চলতে হবে। তোমায় দেখেই যদি লোকে নানা কথা ভাবে, তাতে তোমারি অসুবিধা।

সবিতা চুপ করে থাকে।

পরমেশ্বর হেসে বলে, আমি সহজে কাউকে উপদেশ দিই না, পরামর্শও দিই না। তোমায় দিয়ে ফেললাম। মুস্কিলটা কি হয়েছে শুনি ?

সব শুনে বলে, কারো কোন দায় নিই না, তোমারটা নিলাম। আমার নিয়ম উল্টে যাচ্ছে তোমার বেলা। ওষুধ আনিয়ে দিচ্ছি—পরে দাম দিও। জ্বর দেখেছ? থার্মোমিটার চেয়ে নিয়ে এসো আমার বাড়ী থাকে। সুরমা জানে কোথায় আছে।

সাত

পাড়ায় দু'জন দু'রকমের সব চেয়ে বড়লোক আছে।

সদাশিব সামাজিক ভাবে সস্তা, কারণ সে সুবিধা সুযোগ বাগিয়ে নিয়ে কালবাজারী ব্যবসায়ে টাকা করেছে। লোকে কি ভাবছে সে গ্রাহ্যও করে না। যার টাকা আছে তাকেই লোকে প্রণাম করে!

বিনোদ যত পারে কমিয়ে নিয়েছে সরকারী হাকিমী চাকরিতে বাহাল থাকার সময়কার চাল, এখন পেনসন নিয়ে তার সমাজ জীবনে প্রধান হবার সাধ।

বিনোদ বলে, আপনি বাড়ীতে পূজো করবেন?

মহেশ্বর বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

: বেশ তো, বেশ তো। পাড়ায় পূজো হবে এতো সুখেরই কথা। তা, পাড়ার ছোকরাগুলিকে না ডেকে বয়স্ক লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করলে ভাল করতেন।

মহেশ্বর সবিনয়ে জানায়, এ পূজোর ব্যাপারে পরামর্শ করার তো কিছু নেই! বছরের পর বছর পূজো হয়ে আসছে, কি করতে হবে কি করতে হবে না সব ঠিক করাই আছে। ছেলেদেরও সে পরামর্শ করতে ডাকে নি, ওরা নিজেরাই উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এসেছে কাজ করার জন্য, পূজাটা সুসম্পন্ন করার জন্য।

: নতুন এসে পড়েছি আপনাদের পাড়ায়, সবাই সাহায্য না করলে এ ভার নামাতে পারব কেন?

তার এই বিনয়ে খুসী হয় না বিনোদ। তার কাছে যে আসে নি মহেশ্বর, তার পরামর্শ আর সাহায্য চায় নি পাড়ায় দুর্গা পূজার মত একটা ব্যাপার করতে নেমে, এ বেয়াদবির ক্ষমা তার ধাতে আসে না!

মহেশ্বর পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে বিনোদ কথা বলে, সদর উঠানের ফালিটুকুতে দাঁড়িয়ে। মহেশ্বরকে ভেতরে ডেকে বসতেও বলে না।

সে চলে গেলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রণব বলে, বাড়ীটা বিক্রী করে বিধুবাবু এখন আপশোস করছেন—পদ্মার কাছে শুনলাম।

: আপশোষ কেন?

: নিজে ভাল মালমশলা দিয়ে বাড়ীটা করেছিলেন, কেনা বাড়ীতে গিয়ে দেখছেন, কাঁচা সস্তা মাল দিয়ে তৈরী।

বিনোদ শুনে পরিতুষ্ট হয়ে বলে, দেমাক হলে এমনিই হয়! পাড়ায় মানুষ একটু গেঁয়ো তো বটেই কিন্তু আমরাও তো আছি এ পাড়ায়! একটু গা বাঁচিয়ে চললেই হত। উনি একেবারে বাড়ী বেচে পাড়া ছেড়ে পালালেন! আমরা থাকতে পারি, উনি থাকতে পারেন না!

কি ভেবে বলা যায় না, হঠাৎ একদিন বিকালের দিকে বিনোদের বাড়ীর মেয়েরা বেড়াতে আসে মহেশ্বরের বাড়ীতে।

প্রণবের মা বলে সুভাগিনীকে, আপনি এত ভারি ভারি গয়না গায়ে রাখেন কি করে!

সুভাগিনী হেসে বলে, এবার তো তবু অনেক কম ওজোন। আগের দিনের দু'একখানা গয়না যা আছে গায়ে রাখা যায় না। এই অনন্ত জোড়া করেছিল আমার শাশুড়ীর শাশুড়ী।

প্রণবের বোন সন্ধ্যা বলে, আপনারা কি আর দেশে যাবেন না?

: কি আছে দেশে, কোথায় যাব?

: আপনাদের বাড়ীতে একটি মেয়ে কে গান শেখে—

সুভাগিনী অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। এক কথা থেকে আচমকা আরেক কথাতে যাওয়া শুধু নয়, এতদিনের প্রতিবেশীর বাড়ীতে কোন মেয়েটি গান শেখে সে প্রশ্ন এ জিজ্ঞাসা করছে তাকে!

এ খবরটাও রাখে না প্রতিবেশীর বাড়ীর ?

সবিতা উপস্থিত ছিল। বস্তির ঘরে উঠে গেলেও সে এদের উপকারও ভুলে যায়নি, সম্পর্কও তুলে দেয়নি। গান শিখতে গলা সাধতেও তাকে আসতে হয়।

সে বলে, গান শিখি আমি !

: কত মাইনে ওস্তাদের ?

: এমনিই শেখান।

: সত্যি ? আমিও শিখব তো !

অঘোরের বৌ ডুমুরের সঙ্গে আগেই সবিতার ভাব হয়েছিল—তাদের বাড়ীতে উঠে আসার আগে।

ডুমুর মাঝে মাঝে দুধ দিতে আসত।

গরু আছে, দুধ তারা নিজেরা এক ফোঁটাও খায় না। দুধ বেচে সংসার চলে।

অঘোর খরচ দেয়। তাতে তার নিজের খাওয়া খরচটা কুলিয়ে গিয়ে হয় তো বা ডুমুরের জন্য সামান্য কিছু বাড়তি থাকে।

সংসার চলে না।

দুধ বেচে ঘুঁটে বেচে আর মায়ে বেটিতে তিন বাড়ী ঠিকে কাজ করে কোনমতে তারা দিনপাত করে।

নলিনী আর সবিতা দু'জনেই খুব ভাব জমিয়ে ফেলেছিল ডুমুরের সঙ্গে।

নলিনী তার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

কতভাবে কতরকম প্রশ্নই যে সে করত ডুমুরকে! বলত, তুমি এই বয়সে লোকের বাড়ী কাজ কর, স্বামী আপত্তি করে না?

: করুক না আপত্তি। তবে তো বাঁচাই যেত। যা রোজগার করি দিতে হবে তো আপত্তি করলে,—নিজে খেতে পরতে দেবে না, আপত্তি করবে কোন মুখে ?

: তোমাদের ঝগড়া হয় না ?

: মাগ ভাতারে ঝগড়া হবে না ?

: সে ঝগড়া নয়—খারাপ ঝগড়া। সত্যি সত্যি যাতে রাগারাগি হয়ে যায়।

: তাও হয় ছ'একবার। নিজেই মিটিয়ে নেয়।

: কেন ?

ডুমুর হেসে ফেলত।

: নিজের দোষ তো বোঝে দিদিমণি ? হেথা রইবে, বদ খেয়ালে পয়সা উড়োবে, বৌকে পুষবে না—ঝগড়া করে শক্ত রইবে কিসের জোরে ?

: দোষ বোঝে ?

: বুঝবে না ? সবাই বৌকে পোষে, ও পুষছে না। এটা বুঝবে না পুরুষ মানুষ ? আমরা খেদিয়ে দিতে পারি অনায়াসে—দিই না সে তো আমাদের দয়া।

ডুমুর মুচকে হাসত, বলে, দয়া মানে আর কি, টান তো পড়েছে একটা। ফেলবার তো মানুষ নয়। বাড়াবাড়ি করে না, সামলে সুমলে চলে—কি আর করা যায়, আছে থাক। চলে গেলেও তো জ্বালা!

নলিনী গম্ভীর হয়ে বলত, তা নয়। উপায় নেই তাই তাড়াতে পার না। স্বামী ছাড়া তো গতি নেই আর—

ডুমুর আবার মুচকে হাসত।

: সে আপনাদের নেই দিদিমণি। মোদের কতটুকু আসে যায় ?

মানুষটাকে দূর করে দিয়ে যদি আরেকজনের সাথে থাকি, লোকে একটু উঁ আঁ করবে—বাস্। যেমন আছি তার চেয়ে ঢের ভালই থাকব!

: কদিন থাকবে?

ডুমুর চুপ করে থাকত।

: ছেলেপিলের কি হবে?

এবারও ডুমুর চুপ করে থাকত। সে বেশ একটু ভড়কে গিয়েছে বোঝা যেত।

নলিনী বলত, না তোমার হিসেব ঠিক নয়। স্বামীকে নিয়ে থাকার অনেক স্থবিধা, নইলে তুমি অনেক আগেই খেদিয়ে দিতে মানুষটাকে। বাড়াবাড়ি করে না, তোমার দিকটাও হিসেব করে চলে, তাই অবশ্য বরদাস্ত করে চলেছ।

তারপর নলিনী হঠাৎ কথা পাল্টে বলত, দুধে এত জল দাও কেন? আমার দুটো বাচ্চা তোমাদের দুধ খাচ্ছে মনে রেখো!

নলিনী আধসের দুধ রাখে, সে তাকে বসিয়ে রেখে জেরা করে আলাপ চালাতে পারে।

সবিতারা দুধ রাখে না।

কাজেই সবিতা তার সঙ্গে কথা কইবার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসত।

বলত, ভাইটার জন্য এক পো দুধ রাখব ভাবি, তা রাখব কি দিয়ে। তুমি তো ভাই দিব্যি নিজে রোজগার করে খাও, কাউকে কেয়ার কর না। আমার হয়েছে মুস্কিল।

: বিয়েই হল না, মুস্কিল কিসের গো?

: বিয়ে হলে তবু একটা লোক সম্বল থাকত! আমার যে কেউ নেই।

: বিয়ে বোস না তাড়াতাড়ি ?

: কে করছে বিয়ে ?

: পঙ্কজ বাবু—?

সবিতা ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করতে করতে তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে পুকুর ঘুরে বস্তিতে চলে যেত।

বদনাম রটেছে তার আর পঙ্কজের নাম জড়িয়ে? কিন্তু কেন? কিজন্য তাদের এমন কলঙ্ক রটল যা গিয়ে বস্তিতে পর্য্যন্ত পৌঁচেছে? অথবা শুধু বস্তিতেই গিয়ে পৌঁচেছে ?

ডুমুর বলত, হবে না বিয়ে? ওই দিদিমণি বল্লে কিনা, তাই বলছি।

: কে বললে ?

: ওই তোমাদের ওঘরের প্রতিমা দিদিমণি। বল্লে যে পঙ্কজবাবু ওস্তাদ রেখে গানটান শিখিয়ে নিচ্ছেন বিয়ে করার জন্য !

ডুমুর হেসে ফেলেছিল।

: বাবা, বিয়ের আগে বৌকে তৈরী করা !

প্রতিমা এমন কথা বলেছে ডুমুরকে? সাধনের চেষ্টায় তার বন্ধু অসীম তাকে গান শেখায় জেনেও? ব্যাপারটা এমন রহস্যময় মনে হয়েছিল সবিতার !

এক বাড়ীতে এখন দু'জনের গলায় গলায় ভাব। যখন তখন তাদের ঘরে গিয়ে বসে সবিতা।

অঘোর কাজে যাবার আয়োজন করতে করতে আড় চোখে তাকায়।

ডুমুর মুচকে হেসে বলে, সুবিধে হবে না। সে চিজ্ নয়। দু'পাঁচ হাজার দিয়ে লোকে চেষ্টা করেছে, পারে নি।

পিঁড়ি পেতে সবিতাকে বসতে দেয়।

পুকুরে ডুব দিয়ে এসে অঘোর মাথা আঁচড়াচ্ছিল, ভাতের থালার সামনে পিঁড়িটাতে উবু হয়ে বসে সযত্নে সস্নেহে ভাত ভাঙতে ভাঙতে সে বলে, পারবে কি করে? মানুষ কি পয়সায় বিকোয়?

সবিতা বলে, বিকোয় না? মানুষ পয়সায় বিকোয় বলেই তো আমাদের এই দুর্দ্দশা। ব্যাপারটা বুঝিনে ভালো। গরীব মানুষ আছে, পয়সাওলা মানুষ আছে। তাই ধাঁধাঁয় পড়ে গেছি। চারটে পা না থেকে হাত পা থাকলে মানুষ হয় এটা বুঝেছি, কিন্তু পয়সা থাকলে কি করে মানুষ হয়, সেটা মাথায় ঢোকে না।

ডুমুর বলে, এই নিয়ে কত বড় বড় মাথা খাটছে, কত মাথা দিনরাত শুধু ঘামছে। মাথায় ঢোকে কি ঢোকে না তা নিয়ে আর মাথা ঘামিও না।

সবিতা বলে, কেন?

ডুমুর বলে, মাথা যারা ঘামায় তারা মাথা ঘামিয়ে পয়সা কামানোর চেয়ে ওটা একটু উঁচুতে রাখতে চায়—মাথা ঘামিয়ে পয়সা কামানো বড্ড সম্মানের ব্যাপার, বড্ড উঁচুদরের ব্যাপার!

পূজা প্রায় এসে গেছে।

অভাব সব কিছুরই। পূজার আগে জামা-কাপড়ের অভাবটা আরও বীভৎস লাগছে মানুষের।

কিন্তু এ এলাকার সকলে আশ্চর্য্য হয়ে যায় এই জন্য যে জামা-কাপড়ের অভাবের প্রতিবাদে মিটিং করার তাগিদটা সব চেয়ে বেশী দেখা যায় সদাশিবের!

তিনতলা বাড়ীর মালিক পয়সাওয়ালা সদাশিবের।

এবং তাগিদটা যেন হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে!

নিজের বাড়ীতে সে একটা বৈঠক ডাকে মিটিং করা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। পাড়ার কয়েকজনকে ডাকে—বস্তির জিতু অঘোর মাখনকেও ডাকে!

একটা প্রতিবাদ সভা ডাকার ভূমিকা হিসাবে যে এমন জমকালো বৈঠকের দরকার হয় এটা কারো জানা ছিল না এতকাল। সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে যে ব্যাপার কি?

অল্প-বিস্তর অস্বস্তি বোধ করে।

কে জানে সদাশিবের আসল মতলবটা কি!

সদাশিব বলে, দেখুন, এমনি না হয় সারা বছর ন্যাংটো হয়ে কাটানো যায়, পূজোর সময় নতুন জামা-কাপড় ছাড়া কি বাঙালীর চলে? আমাদের এদিকে কম দামে জামা-কাপড় দেবার কোন ব্যবস্থাই হয় না। চুপচাপ থাকলে কিছুই হবে না। একটা খুব জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

জিতু নানা আন্দোলনে জড়িত থাকে। কিছুদিন জেলও খেটেছে।

জিতু বলে, শুধু জামা-কাপড়ের জন্য আন্দোলন?

: জামা-কাপড়টাই হোক না!

: ভাতের আন্দোলনটা যোগ করুন ওর সঙ্গে? ভাত কাপড়ের আন্দোলন হোক।

: আহাঃ, জামাকাপড়টাই হোক না পূজার সময়!

কিন্তু সদাশিবের চেষ্টা সফল হয় না। শুধু জামাকাপড়ের জন্য মিটিং ডাকার আলোচনা পরিণত হয় সব রকম জরুরী জিনিষের দাবী নিয়ে মিটিং করা হবে কি না তারই বিতর্কে। বৈঠকে উঠে পড়ে দেশের মানুষের খাদ্যবস্ত্র বেকারি থেকে সুরু করে আরও অনেক সমস্যা।

দক্ষিণে ভরা ডোবাটার দিকে চওড়া বারান্দা, যেখানে বসেছে এতগুলি ভিন্ন স্তরের ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। আর কিছু না হোক, শুধু এই সমাবেশটাই খুসী রেখেছে পঙ্কজকে।

সদাশিব চা আর সিঙ্গাড়া আনায়। প্রচুর পরিমাণে!

সবিনয়ে জানায়, এত বেলা হয়ে যাবে বোঝা যায় নি, দেরী হয়ে গেছে। চা আর সিঙ্গাড়া দিয়ে একঘণ্টা চালিয়ে দিন। ঘরে ভাজা জিনিষ।

মাখন বলে, আবার খেতে হবে নাকি এখানে? লুচি খেলাম, কচুরি খেলাম—

সদাশিবের মুখ লাল হয়ে যায় তার কথা বলার ভঙ্গি আর তার ইঙ্গিতে।

শশধর বলে, এটা তুমি অন্যায় বললে মাখন। নিজেকেই ছোট করলে। সদাশিববাবু কি বড়মানুষী চাল দেখাচ্ছেন? উনি বড়লোক মানুষ, পয়সা আছে, এতো আর মিছে নয়! ওঁর ঘরে এয়েছি, ওঁর যেমন অবস্থা সেইমত আদর যত্ন করতেই হবে। মুড়ি মুড়কি খেতে দিলে ভাল হত?

অঘোরও তার পক্ষ নিয়ে বলে, শুধু পয়সাটা দেখো না মাখন, মানুষের মনটাও দেখো।

মাখন হাত জোড় করে বলে, এই ঘাট মানলাম। অত ভেবে বলিনি কথাটা।

কিন্তু আসল কথার কি হবে? আরও কি আলোচনা হবে একটা জনসভা ডাকা নিয়ে?

সদাশিব বলে, তুমি কি বল পঙ্কজ?

পাড়ায় এবং ইতিমধ্যে এ বৈঠকে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন না করে থাকলে শেষ কথা বলার জন্য তাকে মধ্যস্থ মানার ফলে প্রণব অন্ততঃ খুব চটে যেত।

কিন্তু পরিষ্কার টের পাওয়া গেছে যে হাল্‌কা আল্‌গা কথা পঙ্কজ বলে না। সকলে তার কথা শোনার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে।

নতমুখে পঙ্কজ খানিকক্ষণ ভাবে।

ঃ কি বলব বলুন? মনের কথা বুঝিয়ে বলতে পারব ভরসা নেই। শুধু কথায় বোঝানো যায় না।

ঃ পরে কাজে বুঝিয়ে দেবেন। আজ কথায় যতটা পারেন বলুন।

কথাটা বলে প্রণব।

ঃ আজ কথায়, কাল কাজে? তাই তো বলছি, ওইখানে আমার মুস্কিল। এটা সে জিনিষ নয়, কথায় কাজে ফারাক রেখে বোঝানো যায়। যাকগে, আমি বলি কি, খাদ্য আর বস্ত্র দুটো দাবী নিয়ে মিটিং হোক।—

প্রণব সশব্দে হেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নেয়।

পঙ্কজের কোন ভাবান্তর দেখা যায় না।

ঃ সেই মিটিং-এ ওই তারিখে আপনারা সবাই বলুন। পূজার সময়টা অন্ততঃ ভাতকাপড়ের রেশন বাড়িয়ে সস্তায় কাপড় জামা দেওয়া হোক।

জিতু বলে, আমিও তাই বলি।

একটু থেমে সে যোগ দেয়, আরও সোজাসুজি বলি, নিজের নিজের মন না হাতড়ে মিটিং-এ যারা শুনতে আসবে তাদের দিকে তাকান, তাদের কথা ভাবুন,—যার যা বলার আছে ওদের ভাষায় বলুন।

ক্ষণিকের জন্য আবার সে থামে। চোখ দুটি জ্বল জ্বল করে।

পঙ্কজ বলে, অ্যাদ্দিন চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসত নতুন জগতের নতুন ভাব, শিখে পড়ে দু'চার জনে ভাবুক হতাম। অন্যরকম মানুষ হতাম দেশের মানুষের চেয়ে। উপর থেকে উপদেশ আর হুকুম দিতাম এদিক চল

ওদিক চল। এবার তো আর তা চলবে না। নতুন ভাবের বন্যা এনে দেশ ভাসাতে হবে, মুখ্যু অমানুষগুলোকে ভাবুক করে ভাবাতে হবে। নিজেরা ক'জন ভাবলে চলবে না।

: অমানুষ পঙ্কজ? আমার দেশের মানুষ মুখ্যু বটে, কিন্তু অমানুষ? সধাশিব যেন গভীর বেদনার সঙ্গে বলে।

: আহাঃ, অমানুষ মানে কি শুধু বজ্জাত? পশুর মত যাদের জীবন তারা অমানুষ বৈকি?

জিতু ক্ষোভের সঙ্গে বলে।

চারিদিকে সকলের মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে জোরের সঙ্গে বলে যায় এও আমাদের আরেকটা দোষ। দেশের মানুষ বলতে গদগদ হয়ে উঠি, তারা যা নয় তাই বানিয়ে বলি। কতকাল ধরে পাঁকে গড়াচ্ছে, খেতে পায় না, নেংটি পরে—

জিতু আচমকা থেমে যায়।

: কিছু মনে করবেন না। বড় রাগ হয় আমার। নিজের দেশের মানুষ চিনি না, তাদের উদ্ধার করব। একি ছেলেখেলা? হয় তাদের বাড়িয়ে ভাবব, নয় গরুছাগল বলে ধরে নেব। তারা ঠিক যেমন তেমনটি ভাবব না কিছুতেই।

নালিশ করল না উপদেশ দিল জিতু? এমন ভাবে জোরের সঙ্গে সে কথা বলে গেল যেন দেশের অগণিত জনগণ তাকে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল সদাশিবের বাড়ীতে এই তুচ্ছ বৈঠকে।

সকলের মনকেই সে নাড়া দিয়েছে, যদিও প্রতিক্রিয়া হয়েছে বিভিন্ন। মনের কথাটা তার সত্যই পরিষ্কার ধরতে পারে নি একজনও, একমাত্র পঙ্কজ ছাড়া। জিতু যা বলেছে সেটা পঙ্কজকে সমর্থন করার জন্যই।

পঙ্কজ আর জিতুর এই মানসিক সমতার ভাবটা খেয়াল হয়েছে অনেকের। অন্যভাবে বললেও তার কথা সকলে ঠিক ধরতে পারবে না সেটা জেনেই যেন পঙ্কজ আগে থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে বুঝিয়ে বলতে পারবে এ ভরসা তার নেই!

তার মানে যেন এই যে দেশের মানুষকে আরও ভালভাবে আরও সঠিক ভাবে না জানলে আমার কথা বুঝবার সাধ্য তোমাদের হবে না— যতই তোমরা বিদ্বান হও, চিন্তাশীল হও, যতই তোমাদের অভিজ্ঞতা থাক সংসারের।

পঙ্কজের নয় একথা বলা সাজে। সে নিজে বিদ্বান এবং চিন্তাশীল— সংসারের অভিজ্ঞতা যতই তার কম থাক।

তার বলার বিনীত ভঙ্গিটাই সব চেয়ে বড় প্রমাণ যে কেউ বুঝুক না বুঝুক মনের কথা বলার অধিকার তার আছে।

সে যাই বলুক যেন গায়ে লাগে না।

কিন্তু সামান্য লেখাপড়া জানা জিতু কোন সাহসে কথাটা এমন সহজসাদা স্পষ্ট ভাষায় বলে? সদাশিবের দাওয়ায় বসে পাড়ার এতগুলি গণ্যমান্য ভদ্রলোকের সামনে?

সে কি জানে না যে এই বৈঠকে সদাশিব তাকে শুধু এই জন্য ডেকেছে যে সভায় সাধারণ মানুষের ভিড় জমানোর একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা তার অছে?

জনতা খানিকটা না জমলে কর্তারা সভাকে মর্য্যাদা দেয় না?

অনেক ভেবে চিন্তে পাড়ার মান্যগণ্য ভদ্রলোকের এই বৈঠকে সদাশিব তাকে ডেকেছে।

এ সম্মান পেয়েও তার এমন স্পর্দ্ধা!

কিন্তু অন্যেরা অনেকে ভাবে এটা যে স্পর্দ্ধা বস্তিবাসী মানুষটার

তাই বা কি করে বলা যায় ? সে তো বাহাদুরী করার কোন চেষ্টাই করে নি। তার আন্তরিকতায় একটুকু ফাঁকি ছিল না।

সামনের পথ দিয়ে পরমেশ্বরকে যেতে দেখে বৈঠকের কয়েকজন সমস্বরে তাকে আহ্বান জানায়।

: আসুন আসুন ঈশ্বরবাবু। আপনার মতটা বলুন।

: আমার কোন মত নেই। মতামতের ধার ধারি না। বৈঠকটা কিসের ?

: সদাশিববাবু জামা-কাপড় সস্তায় পাবার জন্য একটা মিটিং ডাকতে বলছেন। আপনার মত কি ঈশ্বরবাবু ?

: ঈশ্বরকে বাবু বলে ডাকলেই কি তার মতামত তৈরী হয়ে যায় ? ঈশ্বরের মতও নেই, অমতও নেই। ঈশ্বরবাবু মতামত কোথায় পাবেন ? তা আপনাদের—

সদাশিব বলে, পূজোর সময় মানুষের জামাকাপড়ের দরকারটাই বেশী হয়, না কি বলেন ঈশ্বরবাবু ? জামাকাপড় সস্তায় না পেলে দেশের লোকের পূজোটাই মাটি হয়ে যাবে।

জিতু বলে, আমরা মানে আমি আর পঙ্কজবাবু বলছিলাম, পেটটা ভরা না থাকলে শুধু সস্তা জামাকাপড় পেলেই কি পূজার আমোদ জমবে? চীন থেকে চাল এনে পেট ভরাবার ব্যবস্থা হোক। ওরা সস্তায় চাল দিতে চায়। আগে পেটে খাই তবে তো ভাল জামাকাপড় পরে পূজার আমোদ করা যাবে।

সদাশিব চটে বলে, ভাল জামাকাপড় মানে ? ভাল দামী জামা-কাপড়ের কথা কে বলছে ? দেশের মায়েরা লজ্জা নিবারণ করতে পারছেন না খবর রাখোনা তুমি ? না খেয়ে তো মানুষ বাঁচেই না।

সেটা আর নতুন কথা কি। কিন্তু মেয়েরা মায়েরা কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ হয়ে থাকবেন সে দৃশ্য দেখার চেয়ে আমাদের না খেয়ে মরাই ভালো।

পরমেশ্বর মৃদু হাসে।

: জোটাতে পারেন নি বুঝি সদাশিববাবু? ফস্কে গেছে? তাই চাপ দিয়ে আদায়ের চেষ্টা করছেন?

সবাই থ' বনে থাকে। সদাশিবের মুখের ভাব অবর্ণনীয়।

একটু সামলে সে বলে, অন্ততঃ এ এলাকাতেও ছিট-কাপড় দেবার ব্যবস্থা যদি করতে পারি, ক্ষতি আছে কিছু?

: তাই বলছি। ব্যবস্থা করার লাইসেন্সটা আপনাকেই দিতে হবে।

বৈঠক শেষ হয়।

অনিশ্চয়তার মধ্যেও কিন্তু সদাশিবের উৎসাহ কিছুমাত্র কম দেখা যায় না। নিজে সে পয়সা খরচ করে সভার জন্য হ্যাণ্ডবিল আর পোষ্টার ছাপায়।

সভা কিন্তু হয় না—স্থগিত হয়ে যায়। কারণ, তার আগেই সদাশিব যা চাইছিল পেয়ে যায়, সোজাসুজি নিজে না হলেও ভাগ্নের মারফতে।

আট

পুজোয় সমারোহ করে মহেশ্বর।

পাড়ার লোক খুসী হয়। এ বছর আরও প্রত্যক্ষভাবে ঘনিষ্টভাবে পূজার আনন্দ উপভোগ করে।

দশ বার বছর আগে কাছাকাছি পূজা হত শুধু সরকারদের বাড়ী আর সাহাদের বাড়ী। তারপর আশে পাশে একে একে আরও কয়টি পূজা বেড়েছে।

কারো ব্যক্তিগত পূজা নয়—সার্বজনীন।

কিন্তু ঠিক এই পাড়াতে—বস্তি, ফাঁকা জমি আর ডোবাটা এবং মোটামুটি ত্রিশ বত্রিশখানা ছোট বড় বাড়ী নিয়ে পঙ্কজদের এই ছোট পাড়াতে—আজ পর্য্যন্ত পূজা হয় নি।

পাড়ার প্রায় কেন্দ্রীয় স্থানে বিধুভূষণের বাড়ীতে পূজা হওয়ায় পাড়াটা এবার সরগরম হয়ে উঠল।

ছোট ছেলেমেয়েদের সীমা রইল না আনন্দের।

মনে হল পূজা বুঝি তাদেরই, বিধুভূষণ শুধু পূজাটা সম্পন্ন করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে।

কিন্তু শুধুই কি আনন্দ?

কয়েকটা বুকে জ্বলেছে ঈর্ষারও আগুন!

কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে—এসেই পাড়ায় আরম্ভ করবে দুর্গাপূজা!

পাড়ায় কি আর মানুষ ছিল না?

বিনোদ বলে, আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করল না? নিজের বাড়ীতে পূজো করবে তাতে কি হয়েছে? ব্যাটা জানে না যে ইচ্ছা করলে আমি ওর বাড়ীতে হামলা করাতে পারি, প্রতিমা বিসর্জন ঠেকিয়ে দিতে পারি—

প্রণব বাপের জন্য বস্তি থেকে সামনে দোয়ানো দুধ এনে দিয়ে খোলা ছাতে ডন বৈঠক সেরে ভিজানো ছোলা চিবোতে চিবোতে নীচে নেমে এসে বাপের মন্তব্য শুনে চটে যায়।

বলে, কি সেকেলে হাকিমী চাল চলছেন আপনি? একজন নিজের বাড়ীতে পূজো করবে, তাও আপনি ঠেকাতে পারেন এখন?

বিনোদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, চা আর পুষ্টিকর বিদেশী বিশেষ দুগ্ধ জাতীয় খাদ্যের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী করা পানীয়ে চুমুক দিয়ে বলে, পারতাম। তোমায় মত সন্তান না হলে পারতাম।

: আমায় তাড়িয়ে দিন।

বিনোদ চা প্লাস ফুডের ঈষদুষ্ণো পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে বলে, পারলে দিতাম। পারলে দিতাম রে হারামজাদা, পারলে দিতাম।

তেতালা বাড়ীর সদাশিব বলে, এ যে পাড়াতে ঢুকেই সকলের উপর টেক্কা দিতে চায়!

প্রৌঢ় রমেশ বলে, টেক্কা কি মশায়?

: পূজা করবে—এত বাহাদুরী কেন?

: বাহাদুরী? এটা ওঁদের সাতপুরুষের পূজা!

রবীন্দ্র সরকার বলে, সেদিন দুঃখ করছিলেন ভদ্রলোক, দেশে স্থায়ী পাকা দালানে এসে মা পূজা নিতেন—মাকেও এবার ঠাঁই নাড়া হতে হল।

পঙ্কজ বলে, খেতে না পেলেও এ পূজো ওঁকে চালিয়ে যেতে হবে।

সদাশিব চুপ করে থাকে।

কিন্তু গায়ের জ্বালা তার কমে না। একজনের সাতপুরুষের পূজা আছে—এটাও তার কাছে গায়ের জ্বালার একটা মস্ত কারণ। তার কোন পুরুষেই কিছু ছিল না গর্ব করার মত, না টাকা পয়সা, না বংশ গৌরব, নিজের চেষ্টায় সে তিনতলা বাড়ী তুলেছে, চোরা বাজারের কৃপায় দুর্গাপূজাও যে বাড়ীতে একটা লাগিয়ে দিতে না পারে এমন নয়, কিন্তু নিজের চেষ্টায় উন্নতি করে সেজন্য গর্ব বোধ করতে গেলেই তাকে যেন ঠোক্কর খেতে হয়।

লোকে যেন কিছুতেই এটাকে তার বাহাদুরী মনে করতে রাজী নয়—দু'চারজন অনুগত ব্যক্তি ছাড়া।

তারাও মুখে যাই বলুক মনে মনে কি ভাবে কে জানে!

বিপিন আরও বাড়িয়ে দেয় সদাশিবের গায়ের জ্বালা।

সে মন্তব্য করে, প্রশংসাই করতে হয় ভদ্রলোকের। দেশ ঘর ছেড়ে এসেও এ অবস্থায় ভদ্রলোক তবু পূজোটা করছেন। কালো পয়সার পাহাড় জমিয়েও অনেকে আনন্দ উৎসবে দুটো পয়সা খরচ করতে নারাজ!

বিপিন ছ'মাস সদাশিবের একতলার ভাড়াটে ছিল। যত ভাড়া হওয়া উচিত তার তিনগুণ ভাড়ায়।

এমনিতে এত বেশী নিরীহ অমায়িক মানুষ বিপিন যে সদাশিব ধারণাও করতে পারে নি সে আবার দরকার পড়লে অমন ভয়ানক গোঁয়ারও হয়ে উঠতে পারে!

তাহলে হয় তো সে জল নিয়ে প্যাসেজ নিয়ে এটা ওটা খুঁটিনাটি ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাকে ক্ষেপাতে যেত না।

যতটা তার সয় সেইখানেই সীমা রাখত।

দু'মাসের মধ্যে বাড়ীওলা আর ভাড়াটের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শত্রুতায়! শুধু কলহ বিবাদের শত্রুতা নয়, একেবারে যতদূর সম্ভব পরস্পরের ক্ষতি সাধন করার শত্রুতা।

সদাশিব বিশেষ কিছু করতে পারে নি বিপিনের। বিপিন নালিশ করে ভাড়া কমিয়ে নিয়েছিল তিনভাগের একভাগ। পুরো দু'টি বছর সদাশিবের বাড়ীতে জেঁকে বসে থেকে ধীরে ধীরে নিজের ছোটখাট বাড়ীটি তুলেছিল।

তারপর রেহাই দিয়েছিল সদাশিবকে।

সদাশিবের রাগ আজও কমে নি।

মহেশ্বর বাড়ী বাড়ী গিয়ে সকলকে বলে আসে। পাড়ার যুবকদের কাছে আবেদন জানায় তার পূজা সুসম্পন্ন করতে তাকে সাহায্য করতে।

বলে, এটা তোমাদেরি পূজা। আমি নিমিত্ত মাত্র।

পঙ্কজ বলে, আপনাকে বলতে হবে কেন বিধুবাবু? আমরা সব ঠিক করে দেব।

পরমেশ্বর বলে, সাত-পুরুষের পুজো কিন্তু, বেদখল করে ফেলো না।

মহেশ্বর বলে, তুমি পরিহাস করছ দাদা!

পরমেশ্বর বলে, তুমি তো জানো আমি সব বিষয়েই পরিহাস করি! তোমার মা কি হাসি ভালবাসেন না?

: মা কি শুধু আমার?

: তবে বিষণ্ণ হচ্ছ কেন? মাকে তুমি নিজের করে রাখতে পার—কারো আপত্তি নেই। কোন দোষও নেই। তোমার অধিকার তুমি খাটাবে, কার কি বলার আছে? কিন্তু অন্যের অধিকারও মানবে তো তুমি!

সমীর আর পদ্মা পূজার আগে এ পাড়ায় বেড়াতে আসে।

পাড়ার লোকের সঙ্গে খাপ খায় নি বলে পাড়ার লোক মিশুক নয় বলে তারা উঠে গিয়েছে সহরের আরও জমজমাট অংশে কিন্তু এ পাড়ার জন্য মন কেমন করার হাত থেকে তারা রেহাই পায় নি।

মেলামেশা ঠিকই হত—তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি!

পদ্মা বলে, কেমন আছেন?

সাধন শুধু মাথা হেলায়। অর্থাৎ সে ভালই আছে।

: আপনি নাকি কবিতা লেখেন?

ভড়কে গিয়ে এবার মুখ খুলতে হয় সাধনকে।

: কবিতা? কে বললে?

: এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম—লেখেন কি না। এত চুপচাপ থাকেন আপনি যে মনে হয়েছিল কবিতাই বোধ হয় ভাবেন সব সময়।

সাধন একটু হাসে।

পদ্মা একটু ভাবে।

তারপর বলে, আসুন, নিরিবিলি বসে আপনার সঙ্গেই আজ একটু গল্প করি।

মতলবটা তার ছিল সাধনের নীরবতা ভঙ্গ করে তাকে দিয়ে কথা বলাবার। ভেবেছিল, খুবই বুঝি কঠিন হবে কাজটা বেছে বেছে এমন সব কথা বলতে হবে প্রশ্ন করতে হবে যাতে মুখ খুলে কথার জবাব না দিয়ে সাধনের উপায় না থাকে, একটু হেসে বা একটু মাথা হেলিয়েই কাজ না চালিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু দেখা যায় চেষ্টা বিশেষ তার করতে হয় না, দরকার হলে কথা বলতে মোটেই আটকায় না সাধনের!

পদ্মা বলে, চারদিকে পূজার সমারোহ সুরু হয়েছে। দেশের এই অবস্থায় পূজায় হৈ চৈ করা কি উচিত ?

সাধন বলে, আপনি আমি অনেকক্ষণ তর্ক করে নয় ঠিক করব এটা উচিত কি অনুচিত। তাতে কি আসবে যাবে ? লোকে ওসব উচিত অনুচিত ভাববে না। যতটা পারে পূজার সময় আনন্দ করবে।

ঃ সে চেতনা এখনো আসে নি লোকের ?

ঃ কোন চেতনা ?

ঃ দেশের লোকের ভাত নেই, কাপড় নেই, অনাচার অত্যাচারের সীমা নেই—এ অবস্থায় পূজার আনন্দে মাতা উচিত নয় ?

ঃ যাদের নেই তারাই তো মাতছে ? নতুন কাপড় না পারুক, একটা গামছা কিনবে। তাও না পারে ছেঁড়া কাপড় পরে ঘুরে ঘুরে অন্তত: কদিন প্রতিমা দেখে বেড়াবে।

ঃ পূজো পয়সাওয়ালা লোকেরা করে, ওরা করে না। আমি পয়সাওয়ালা লোকের কথা বলছি।

একটু থেমে পদ্মা বলে, আপনার বাবার সমালোচনা করছি ভাববেন না কিন্তু, সাধারণভাবে সকলের কথাই বলছি।

ঃ পূজোটা সকলেই চায়। একজন পয়সাওয়ালা না পারে, দশজনে চাঁদা তুলে করে। এর মধ্যে উচিত অনুচিতের প্রশ্ন টানা যায় না। একটা আন্দোলন যদি করতে চান সে আলাদা কথা—কিন্তু লোকে আপনার আন্দোলন ওভাবে নেবে না। না খেয়ে লোক মরছে, এবার পূজো বন্ধ থাক, কিম্বা এবার আমোদ-প্রমোদ বাদ দিয়ে সাদামাটা পূজো হোক—এ কথা বললে লোকে ধরে নেবে না খেয়ে মরার বিরুদ্ধে আপনি আন্দোলন করছেন। না খেয়ে মরার সঙ্গে পূজার আনন্দের কোন সম্পর্ক নেই। লোকে না খেয়ে মরছে সেটা অন্যায়, এ অন্যায়ের

প্রতীকারের জন্য দরকার হলে জেল খাটতে পারি, প্রাণ দিতে পারি—পূজার ফুর্তি বাদ দিতে যাব কেন? আনন্দ বাদ দিয়ে সবাই মিলে মুখ গোমড়া করে থাকলেই কি দেশের সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে? আপনি কথাটা বলছেন ঘরোয়া হিসাব থেকে। বাড়ীতে একজনের কঠিন অসুখ হলে হাসাহাসি বন্ধ থাকে। কিন্তু পরিবার আর সমাজে অনেক তফাৎ। পরিবার প্রথা না থাকলেও সমাজ থাকতে বাধা নেই—বাধা নেই কেন, সমাজ থাকবেই।

পদ্মা গালে হাত দিয়ে বলে, আপনি নাকি কথাই বলেন না, চুপ করে থাকেন! এই নাকি তার নমুনা?

সাধন হেসে বলে, আপনি বলালেন—

ঃ বুঝেছি, বাজে কথা বলেন না। বাক্‌-সংযমী মানুষ!

সাধন মৃদু একটু হাসে। বোঝা যায় সে আবার চুপ হয়ে গেছে।

পদ্মা বলে, আজ থেকে আমরা বন্ধু, কেমন?

সাধন মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

মুখেও বলে, বেশ তো!

কেবল লক্ষ্মীর নয়। তার মত যারা নিয়ম-নীতির ধরা-বাঁধা পথে বাঁচতে চায়, বড় হবার আর বড় কিছু করার ইচ্ছাটাকে স্বপ্ন করে রেখে খানিকটা সুখ-সুবিধা আরাম বিলাস নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারাই যথেষ্ট মনে করে, চেনা-জানা এরকম সমস্ত মানুষের সঙ্গ ক্রমে ক্রমে যেন অসহ্য হয়ে উঠছে পদ্মার।

আত্মীয়স্বজন পর্য্যন্ত।

সে অনুভব করে, এরা শুধু নিজের কথা ভাবে, নিজের আরাম বিলাসের চিন্তাতেই এরা ব্যাকুল।

সুরঞ্জন যে তাকে চায় এই চাওয়াটাই আসল কথা প্রধান কথা নয় সুরঞ্জনের কাছে। তার প্ল্যান করা জীবনের একটা অঙ্গ হিসাবে পদ্মাকে তার প্রয়োজন, তাই তাকে পাওয়ার জন্য তার এত আগ্রহ।

চাকরীটা যেমন প্রয়োজন ছিল সেও তেমনি আরেকটা প্রয়োজন—হয় তো তুলনায় ছোট প্রয়োজন।

নিজেকে একা মনে হয় পদ্মার। ধরা-বাঁধা নিয়মে যন্ত্রের মত তার সঙ্গে মিলুক মিশুক, বন্ধুত্ব করুক, স্নেহ আর দরদ দেখাক, প্রেম দিয়ে জয় করতে চাক, সবাই যেন আসলে নিজেকে নিয়ে বিব্রত, নিজের চিন্তা নিয়েই মশগুল।

সত্যিকারের আপন মানুষ তার কেউ নেই। এই চিন্তা এই অনুভূতি জোরালো হওয়ার সঙ্গে ক্ষোভ আর বিতৃষ্ণা দিন দিন বেড়ে চলেছে পদ্মার।

পরমেশ্বরের উপরেই তার গায়ের জ্বালাটা সব চেয়ে বেশী। সর্বদা তার মনে হয় যে এই মানুষটা তাকে হালকা প্রকৃতির ছ্যাবলা মেয়ে ভাবে, তার সেদিনকার দুপুরবেলার কীর্ত্তি স্মরণে এলে মনে মনে হাসে।

অথচ, আশ্চর্য্য এই, অন্যদের সঙ্গ অস্বস্তিকর লাগলেও, সকলকে এড়িয়ে চলবার সাধ জাগলেও, পরমেশ্বর তাকে আকর্ষণ করে।

আকর্ষণটা হয় দু'রকমের।

কখনো সাধ হয় গিয়ে নিজের কথা ব্যবহার চালচলন দিয়ে পরমেশ্বরের ধারণাটা বদলে দেবে যে সে মোটেই হাল্কা ফাজিল মেয়ে নয়।

আবার কখনো সাধ যায়, গিয়ে তর্ক করবে, ঝগড়া করবে পরমেশ্বরের সঙ্গে। ব্যঙ্গ করে খোঁচা দিয়ে তীব্র অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধা দেখিয়ে পরমেশ্বরকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবে সে কি রকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন সেকেলে মানুষ, আজকের দিনে কত তুচ্ছ আর হাস্যকর হয়ে গেছে তার মত মানুষেরা।

অর্থাৎ কখনো ভাবে নম্রভাবে গিয়ে পরমেশ্বরের মন ভুলিয়ে তার খারাপ ধারণাটা নাকচ করে দেবে, আবার কখনো ভাবে অশ্রদ্ধা আর অপমান দিয়ে জর্জ্জরিত করে দেবে পরমেশ্বরের মন, সে টের পাবে যে যাই সে ভাবুক পদ্মার সম্পর্কে পদ্মা গ্রাহ্যও করে না।

ভাবতে ভাবতে অধীর হয়ে ওঠে।

আচমকা বিধুভূষণকে বলে, আমি একটু গাড়ীটা নিয়ে বেরোচ্ছি বাবা। শীগগির ফিরব।

ঃ একা তুমি রোজ রোজ এভাবে গাড়ী নিয়ে গেলে—

ঃ আমার আজ বিশেষ দরকার।

ঃ কোথায় যাবে?

ঃ রঞ্জনদের বাড়ী।

বিধুভূষণ নির্বিকার ভাবে বলে, আচ্ছা যাও।

স্থরঞ্জনের বাড়ীর অবস্থা আরেকটু ভাল হলে কোন কথাই ছিল না, শুধু এই একটা বিষয়ে মনটা একটু খুঁত খুঁত করে বিধুভূষণের। তবে আপত্তি করার ইচ্ছাও তার নেই। এক ছেলে, ছেলেটি ভাল, ভবিষ্যৎ আছে।

কান্তিলাল গাড়ী চালায়।

একা গাড়ীতে চাপলে পদ্মার নিজেকে একা মনে হয় না, নিজেকে ছোট মনে হয় না, অস্বস্তি আর আত্মগ্লানির বিশ্রী অনুভূতিটা টেরও পায় না।

মনটা আশ্চর্য্যরকম শান্ত হয়ে যায়।

নিজেকে সজীব মনে হয়। সে কেন তুচ্ছ হতে যাবে? সে স্বাধীন মানুষ নয়? নিজের ইচ্ছামত বাঁচার অধিকার তার নেই?

নিশ্চয় আছে।

: আচ্ছা কান্তিবাবু, সেদিন যে বলছিলেন সংসারে আপনার কেউ নেই, তা কখনো হতে পারে? মানুষের আত্মীয় বন্ধু থাকেই কেউ না কেউ।

কান্তিলাল স্পিড কমিয়ে দেয়।

: তা থাকে বৈকি। আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দেশের বাড়ীতে আমার নিজের লোক কে কে আছে, বাপ মা ভাইবোন বৌ ছেলেপিলে এদের কথা। তাই বলছিলাম কেউ নেই। বাবা ছেলেবেলা মারা গিয়েছিলেন, আমার বিয়ের পর মা মারা যায়। তারপর বৌ মরেছে— ছেলেপিলে হয় নি। আমার নিজের দুটি বোন আছে, দুজনেরি অনেক-কাল বিয়ে হয়েছে, নিজের নিজের সংসার নিয়ে থাকে। আগে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী আসত, মা আর আমার বৌ মরবার পর কদাচিৎ আসে।

: কার কাছে আসে? দেশের বাড়ীতে কেউ নেই বললেন—

: কেউ নেই কখন বললাম? আমার খুড়ো থাকে। তার মস্ত সংসার। একটি খুড়তুতো বোন এসে আশ্রয় নিয়েছে, তার চারটি বাচ্চা।

গাড়ীর স্পিড আরও কমিয়ে আনে কান্তিলাল কথা বলতে বলতেই। তার সম্পর্কে পিছনের সিটের একজনের কৌতূহল মেটাতে গিয়ে কি কলকাতার রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে বসবে!

সে বলে যায়, আমার আর আমার খুড়তুতো ভায়ের বিয়ে হয়েছিল একসাথে। পর পর তার তিনটি মেয়ে হয়েছিল। কালকে কাকার চিঠি পেয়ে জানলাম, এবার একটি ছেলে হয়েছে সৌভাগ্যক্রমে।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখ বুজে গাড়ীটা এই গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত ফাঁকা রাস্তাটা। ষ্টিয়ারিং হুইলে হাতটা স্থির রেখে মুখ

ফিরিয়ে পদ্মার মুখের দিকে চেয়ে কান্তিলাল বলে, বাড়ীতে গিজ গিজ করছে ছেলেমেয়ে।

সেকেণ্ড দুই লাগে তার কথাটা বলতে। সেকেণ্ড খানেক লাগে পদ্মার মুখের ভাব দেখতে।

সামনে রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বুঝতে পারে আরও সেকেণ্ড দুই পদ্মার দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে থাকলে কোন অ্যাকসিডেণ্ট ঘটত না। সোজা রাস্তা—হাত তার ঠিক চেপে ধরে আছে হুইলকে! ফুটপাতের দিকেও একটু বাঁকেনি গাড়ীটা, ডাইনেও দু'চার ইঞ্চির বেশী সরে যায় নি।

ঃ ছি ছি, ছি ছি! আপনার টাকা না পেলে যাদের খাওয়া জোটে না তারা এরকম ভাবে ছেলেমেয়ে জন্মায়!

পরক্ষণে লজ্জিত হয়ে পদ্মা বলে, কিছু মনে করবেন না। এসব ব্যাপার আমি ধারণাই করতে পারি না।

কান্তিলাল বলে, আমি ভাবি অন্য রকম। গরীব দেশের লোকবলটাই আসল বল। যত লোক বাড়ে ততই ভাল।

ঃ না খেয়ে মরবে যে?

ঃ মানুষ কি না খেয়ে মরতে জন্মায়?

ঃ মরে তো ঢের।

ঃ সে অন্যেরা মারে বলে।

কান্তিলাল সম্পর্কে জানবার কৌতূহল থেকে কথা সুরু হয়ে এমনি সহজ সাদামাটা আলাপে এসে দাঁড়ায়।

ড্রাইভারের সঙ্গে বাড়ীতে আলাপ করা যায় না, গাড়ীতে অন্য কেউ উপস্থিত থাকলেও করা যায় না।

শুধু একা কোথাও যাতায়াতের সময় তাদের আলাপ জমে। সংসারের

নিয়মনীতি অনিয়ম কৃত্রিমতার চাপ যেন পদ্মাকে জোর করে এইভাবে কান্তিলালের সঙ্গে ভাব করায়।

সংঘাতের পীড়নে জর্জ্জরিত কাঁচা মনটা কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পায়।

পরমেশ্বর বলে, এসো মা, এসো। আজ যেন বেশ তাজা তাজা লাগছে মাকে আমার!

ঃ আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম কিনা তাই।

হাসি মুখে কথাটা বলেই পদ্মার মনে খটকা লাগে, বলা কি উচিত হল কথাটা? কে জানে পরমেশ্বর ভাবছে কিনা যে ছুঁড়িটা আমার সঙ্গে ইয়ারকি দিচ্ছে!

পরমেশ্বরকে বশ করা বা আঘাত করার কোন সাধটাই আর বাস্তব বা সম্ভব মনে হয় না এখন। কি রকম কথাবার্ত্তা চালচলন তার পছন্দ কে জানে! কি করলে মনে মনে খুসী হয়ে সে তার প্রশংসা করবে তাই যে তার জানা নেই।

একা এমনি ভাবে এসেছে বলেই হয় তো পরমেশ্বর যা তা ভাবছে তার সম্বন্ধে!

আঘাত করা? অবজ্ঞা আর অপমানে বুকের মধ্যে জ্বালা ধরিয়ে দেওয়া?

নিজের বুকটাই জ্বালা করে পদ্মার। এই মানুষটাকে অবজ্ঞায় কাবু করার সাধ্যই যদি তার থাকত এমন ব্যাকুল হয়ে সে যেন ছুটে আসত গায়ে পড়ে একে অবজ্ঞা করতে!

এটাই কি প্রমান নয় যে সত্যই সে ছ্যাবলা মেয়ে? তবু কথা কইতে হয়, মুখ গোমড়া করে চুপ করে থাকলে আরও বিশ্রী হবে। বুঝতে পারে এলোমেলো আবোল তাবোল কথা কইছে, তবু যেন থামতে পারে না।

হঠাৎ বলে, আচ্ছা যাই এবার।

পরমেশ্বর বলে, মন শান্ত হল না মা ? চব্বিশ ঘণ্টা সবাই মিলে ঝড় তুলে দিচ্ছে, বোকা ছেলের কি সাধ্য আছে দু'দণ্ডে ঝড় থামিয়ে দেব ?

পদ্মা তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সুরঞ্জনের নাম করে গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছে. দু'চার মিনিটের জন্ম হলেও দেখা করে যাওয়া উচিত।

সুরঞ্জন বাড়ী নেই শুনে কি স্বস্তিটাই যে পদ্মা বোধ করে !

সুরঞ্জনের মার মুখ একটু গম্ভীর দেখায়।

ঃ একলাই এসেছ ? বাড়ীর গাড়ীতে এসেছ ?—ও !

অচিন্ত্য বলে, কিছু বলতে হবে রঞ্জনকে ?

ঃ না, কিছু বলতে হবে না।

গাড়ীতে উঠে পদ্মা বলে, গঙ্গার ধারে চলুন। বাড়ী ফিরতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

ঃ বাবুর আপিসের টাইম হয়ে যাবে।

পদ্মা হেসে বলে, সে ভাবনা আপনার কেন ? টাইম হয়ে যায় বাবা ট্রামে, বাসে আপিসে যাবে। দু'দিন আগেও তো তাই গিয়েছে।

বড় রাস্তায় খানিকটা যাবার পর পদ্মা গাড়ী থামিয়ে সামনের সিটে কান্তিলালের পাশে এসে বসে।

ঃ আপনার সঙ্গে আজ ভাল করে আলাপ করতে হবে।

শুধু পুজো দেখে যাবার নিমন্ত্রণ ছিল সমীরের। এক সুরমা ছাড়া তাকে বিশেষভাবে কেউ নিমন্ত্রণ করেনি। কর্তাব্যক্তিদের পক্ষ থেকে সাধারণ ভাবে তাদের সমগ্র পরিবারটিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

সপ্তমীর দিন সকালে ভদ্রতা রক্ষার জন্য শুধু উঁকি দিয়ে যেতে এসে সমীর এখানে আটকে যায়।

সে ধারণাও করতে পারে নি মহেশ্বর এমন সমারোহের সঙ্গে পূজা করবে—করতে পারবে।

চার বছর এ বাড়ীতে কাটিয়েছে, পাড়ার মেয়ে পুরুষ সে চার বছর যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে তাদের এই বাড়ীটাকে। পরস্পরের বাড়ীতে এসেছে গিয়েছে কিন্তু তাদের বাড়ীতে আসতে যেতে ভরসা পায় নি গেঁয়ো মানুষগুলি।

সেই বাড়ীতে পূজা উপলক্ষে ভিড় করে এসেছে সমস্ত পাড়া!

নিদারুণ অপমানের মতই এটা মনে হয়েছে সমীরের। কিন্তু সে সব চেয়ে অবাক হয়ে গেছে মহেশ্বরের কৃতিত্বে।

এত টাকা দিয়ে তাদের বাড়ী কিনে এত টাকা খরচ করে এমন সমারোহের সঙ্গে পূজা করছে মহেশ্বর! তার টাকাও আছে, সে খরচও করতে পারে টাকা!

স্থরমা ব্যস্ত ও বিব্রত হয়ে আছে। কাজের তার অন্ত নেই।

প্রতিমাও দেখায় যে সেও বাড়ীতে পূজার কাজে সাহায্য করছে। কিন্তু আসলে তার শুধু সখের টুকটাক কাজ করা—চারিদিকে অবিরত পাক খেয়ে বেরিয়ে মজা উপভোগ করাই তার আসল কাজ।

স্থরমা দায়িত্ব নেয়।

নিজের হাতে করুক বা অন্যকে দিয়ে করাক, দরকারী কাজটা করিয়ে দেবার দায়িত্ব সে পালন করে। সে তাই সত্য সত্যই ব্যস্ত হয়ে থাকে।

পূজার দিন তিনেক আগে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সমীর এলে প্রতিমা হেসে বলেছিল, দিদিকে খুঁজছেন? ওই তো দিদি পূজোর বাসন মাজছে।

তাই বটে। কলতলায় তুলসী আর ভাদুর সঙ্গে স্থরমা নিজে বাসন

মাজতে বসেছে। ওরা দুজনে মাজছে ডেকচি গামলা থালা বাটি, সে শুধু মাজছে পূজার জন্য দরকারী কয়েকটি তামার পাত্র।

ধীরে ধীরে সমীর কাছে গিয়া দাঁড়িয়েছিল।

: এ আবার কি সখ?

: সখ? এগুলো পড়ে থাকে, জং ধরে গেছে। অনেক কায়দা করে মাজতে হয়। একেবারে নতুনের মত চকচক্ না করলে বাবা রক্ষা রাখবে না।

সেদিনও সমীর বুঝতে পারে নি উৎখাত হয়ে এলেও কত সমারোহের সঙ্গে মহেশ্বর পূজার আয়োজন করছে। পূজোর দিন তিনেক আগে সে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন সুরমা বিশেষভাবে তাকে নিমন্ত্রণ করেছিল, পূজোর দিন নিশ্চয় আসবেন কিন্তু। না এলে রাগ করব।

পূজোর দিন বিকালে এসে পূজা মণ্ডপে বেঞ্চে প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে থেকে সে সব লক্ষ্য করে। পাড়ার লোকের আনাগোনা, সকলকে মহেশ্বরের অভ্যার্থনা, পাড়ার ছেলেমেয়েদের ভিড় করে দাঁড়িয়ে আনন্দের কলরব তোলা—প্রতিমা, পূজার আয়োজন আর সুসজ্জিত পূজামণ্ডপ।

সে ভাবে, এত বড়লোক ছিল মহেশ্বর? এত টাকা সে নিয়ে এসেছে? খুব বেশী পরিমাণে টাকা না থাকলে তো আয়ের ব্যবস্থা বন্ধ হবার পর জমানো টাকা থেকে মানুষ এত খরচ করতে পারে না। পূজার জন্য!

ছোট একটি ছেলে এসে সমীরকে জানায়, ভিতরে তাকে ডাকছে।

ভিতরে যেতেই সুরমা বলে. বসুন, চা দিচ্ছি। সারাদিন থাকতে হবে, একেবারে রাত্রে খেয়ে যাবেন।

: রাত্রেই বা যাব কেন? থাকলে চলবে না?

: সে কি আর আপনি থাকবেন !

: এই রইলাম। শুধু আজ নয়, পূজোর ক'দিন তোমাদের এখানে কাটিয়ে যাব। তোমাদের সঙ্গে আনন্দ করব !

তার উৎসাহ দেখে খুসী হয়ে সুরমা বলে, আমাদের আনন্দও বাড়বে !

সমীর খাবার খেতে খেতে বলে, বাইরে থেকে প্রতিমা দেখেছি আর প্রসাদ খেয়েছি। একেবারে পূজার হৈচৈ-এর মধ্যে কখনো থাকি নি। এবার সে অভিজ্ঞতা হবে।

একটু হেসে বলে, আমায় অতিথির মত বসিয়ে রেখে শুধু আদর কোরো না কিন্তু ! আমাকেও খাটিয়ে নিতে হবে।

: কাজের তো অন্ত নেই, আপনি লেগে যাবেন।

অনেকক্ষণ মনের মধ্যে যে কথাটা ঘুরছিল এবার সমীর সেই কথাটা পাড়ে। বলে, তোমাদের তো খুব সমারোহ হয় পূজায় !

: এ আর কি দেখছেন ? দেশের বাড়ীতে আরও কত লোকজন আসত, আরও কত বেশী হৈ চৈ হত ক'দিন ধরে। দশ বারটার কমে ঢাক না বাজলে বাবার মন উঠত না।

একটু থেমে বলে, বাবার কাছে এই পূজোর চেয়ে বড় কিছু নেই। আর সব ছাড়তে পারেন, পূজো বাদ দিতে পারবেন না।

পরমেশ্বরকে সমীর বলে, যেচে নেমন্তন্ন নিলাম—পূজার কদিন এখানে থাকব।

: এই তো চাই। আনন্দ করতে কি নেমন্তন্নের মুখ চেয়ে থাকতে আছে ? যেচেই যোগ দিতে হয় !

: এত হৈ চৈ আপনার ভাল লাগে ?

: সবাই আনন্দ করছে—ভাল লাগবে না ?

রাত্রে খেতে বসে সমীর বলে, প্ল্যানটা একটু বদলাতে হল।

স্বরমা বলে, কেন ?

: আজ বাড়ী ফিরতে হবে। বলে আসি নি—বাড়ীতে ভাববে। তাছাড়া জামা কাপড়ও আনতে হবে তো।

কয়েকজন একসাথে খেতে বসেছে, মহেশ্বর সামনে দাঁড়িয়েছিল।

সে বলে, জামা কাপড়ের জন্য আটকাত না—কিন্তু বাড়ীতে যখন ভাববে, আজ ফেরাই উচিত। কাল আসবে কিন্তু।

স্বরমা বলে, সকালেই আসবেন।

পরদিন সকালে ছোট একটি স্যুটকেশ হাতে নিয়ে সমীর ফিরে এলে স্বরমা হাসিমুখে তাকে জানায়, আপনি নিজে থেকে পূজোর কদিন থাকতে চেয়েছেন শুনে বাবা খুব খুসী হয়েছেন।

: তুমি ?

স্বরমা শুধু একটু হাসে।

দিনরাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যায়।

সমীর সত্যই একেবারে যেন ঘরের ছেলে বনে গিয়ে কোমর বেঁধে সকলের সঙ্গে পূজার কাজে ভিড়ে যায়।

প্রতিমা তামাসা করে বলে, এ তো আপনাদের বাড়ী ছিল এই সেদিন পর্য্যন্ত—আপনাদের বাড়ীর পুজোই হচ্ছে ধরে নিন্!

সমীর বলে, ধরে নিতে হবে কেন ? তাই তো সত্যি সত্যি হচ্ছে!

: আপনি যেন বড্ড বেশী আপন হয়ে যাচ্ছেন!

: হবই তো! আরও আপন হব।

প্রতিমা দেখতে এসে লোকে আলোচনা করে, ন'পাড়ার সার্ব্বজনীন পূজা ছাড়া কাছাকাছি এত বড় প্রতিমাও হয়নি; এমন স্বন্দর সাজানো আর সমারোহও হয় নি।

পরমেশ্বর বলে, সার্ব্বজনীন পূজার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে মহেশ্বর। দশজনের বোঝাটা একা বইতে চাইছে।

মহেশ্বর বলে, সমস্তই মার দয়া!

সমীর বলে, কলকাতায় পূজো অনেক বেড়ে গেছে।

পঙ্কজ বলে, দশজনে মিলে চাঁদা তুলে পূজো করতে শিখেছে যে।

পরমেশ্বর বলে, দশজনকে নিয়েই তো পূজা করা। সবাই আসছে যাচ্ছে তাই না আমাদের পূজা সার্থক।

দশমী আসে।

প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে আসার পর ঘনিয়ে আসে গভীর শ্রান্তি আর অবসাদ, সেই সঙ্গে মনে হয় সব যেন শেষ হয়ে গেছে।

সকলের আগেই ফিরে আসে সমীর।

মেয়েদের মধ্যে প্রতিমা ছাড়া আর কেউ প্রতিমার সঙ্গে যায় নি।

সুরমা জিজ্ঞাসা করে, আগে ফিরে এলেন?

ঃ মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল।

ঃ সত্যি। উৎসব শেষ হলে এমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আবার সেই একবছর পরে পূজো।

সমীর বলে, আমি এখুনি চলে যাব ভাবছি।

ঃ কেন?

ঃ বাড়ীতে লোক নেই? বিজয়ার দিন না গেলে তাদের মনে কষ্ট হবে না?

ঃ তা হলে খেয়ে যান।

খেতে বসে সমীর বলে, তোমায় একটা কথা বলব ভাবছিলাম।

ঃ বলুন।

: আবার সেই একবছর পরে পুজো। এক কাজ করবে, তার আগেই বাড়ীতে আরেকটা উৎসব করাবে? যত শীগ্‌গিরি সম্ভব হয়?

সুরমা বুঝতে পারে। তাই চুপ করে থাকে।

: জবাব দিলে না যে?

: উৎসব করানো কি আমার হাতে?

: উৎসব তোমার বাবা করবেন। তোমার অমত নেই তো?

একবার চোখ তুলে চেয়ে সুরমা মাথা নাড়ে।

নয়

খুসীই হয় সকলে।

অবস্থা ভাল, ছেলেটি ভাল, চাকরীও করে।

পঙ্কজ ভাবে, কে জানে কি ভাবে এর বিচার করা উচিত?

সুরমা বুদ্ধিমতী। বিপন্ন বাপকে বর খুঁজে আনবার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছে, বাপের একটা ভার লাঘবের ব্যবস্থা করেছে।

যত সমারোহের সঙ্গেই মহেশ্বর পূজা করে থাক, পঙ্কজ তার অবস্থা জানে।

এভাবে তার পূজা না করাই উচিত ছিল।

সাধন বাপকে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু মহেশ্বর গা করে নি। বলেছিল, মার পূজো করে কেউ ফতুর হয় না। পূজার ব্যবস্থা মা নিজেই করে নেবেন। ক্ষমতা যখন আছে আজ, কেন করব না।

: ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে তো!

: পূজার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?

সাধন পরমেশ্বরকে বলেছিল, সে বুঝিয়ে বললে হয় তো মহেশ্বরের চৈতন্য হবে, পূজার খরচ কমিয়ে দেবে।

পরমেশ্বর বলেছিল, আমি তো কাউকে কিছু বলি না। আজ আমি বলব পূজায় কম খরচ কর, একবছরের মধ্যে ব্যবসা করে কিংবা অন্য উপায়ে ঢের টাকা করবে, সামনের পূজোয় আরও বেশী খরচ করতে পারবে। কিন্তু আয়ের ব্যবস্থা যদি না হয়? আমার তখন মুখ থাকবে কোথায়? না বাবা, আমি কোনদিন দায়িত্ব খাটাই নি, আজও খাটাব না!

সুরমা আর সমীরের বিয়েটা অতি সাধারণ এক ঘটনা। দু'জনে যদি জানাশোনা না থাকত এবং মহেশ্বর খোঁজ পেয়ে বিধুভূষণের কাছে প্রস্তাব করে সমীরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে যা ঘটত একটু অন্যভাবে ঠিক সেই অতি সাধারণ ঘটনাটাই ঘটেছে।

কিন্তু অন্যভাবে এটা ঘটা কি উচিত? এইখানেই পঙ্কজের খটকা।

ভালবাসার জন্য নয়, সুবিধা পেয়ে শুধু বিয়ের জন্য একটি উপযুক্ত পাত্রকে বশ করা?

প্রেম যে তাদের হয় নি পঙ্কজ জানল কি করে?

ওটা জানা আর কঠিন কি!

সুরমা যে যেচে যেচে বেশ খানিকটা খাতির করেছে সমীরকে, তাকে বিশেষভাবে পছন্দ করার, তার আপন হওয়ার ভাব দেখিয়েছে এটা নজরে পড়েছে প্রতিমারও।

হৃদয়ে প্রেম এলে এটা সম্ভব হত না সুরমার পক্ষে।

তখন অন্যভাবে একেবারে অন্যরকম সম্পর্ক গড়ে উঠত তাদের মধ্যে।

অবশ্য পরস্পরকে তারা যে পছন্দ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

সংসারে এত যে গণ্ডা গণ্ডা ভালবাসার বিয়ে হয়, দু'পক্ষ ধরে নেয় তাদের খাঁটি প্রেম হয়েছে, পঙ্কজ জানে যে তার বেশীর ভাগ নিছক পছন্দের ব্যাপার।

পরস্পরকে ভাল লাগা আর ভালবাসা হওয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ।

এদেরও শুধু পছন্দের বিয়ে হয়েছে বলে বলার কিছু নেই। কিন্তু সুরমা যে গায়ে পড়ে সমীরের মনে তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা জাগাবার চেষ্টা করেছে, এটা কিভাবে নেবে পঙ্কজ বুঝে উঠতে পারে না।

সুরমা ওই চেষ্টাটুকু না করলে এত তাড়াতাড়ি বিয়ের প্রশ্ন সমীরের মনে আসত না। হয় তো আরও বেশ কিছুকাল মেলামেশা চলতে চলতে

ধীরে ধীরে তার মনে জাগত সুরমাকে বিয়ে করার সাধ—হয় তো কোনদিন এটা তার খেয়ালও হত না।

সমীরের মনপ্রাণ কোন্ উচ্চাশা জুড়ে আছে তার খবর পঙ্কজ রাখে। তার বড়লোক হওয়ার সাধটা অত্যন্ত প্রবল।

বিধুভূষণের অবস্থা আগে আরও অনেক ভাল ছিল, নানাভাবে এখন অবস্থা পড়ে গেছে। আগে তাদের নাকি দুটো মোটর গাড়ী ছিল।

সমীর আগের সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চায়।

: কেবল আমার জন্য নয়। বাপের জন্যও একটা কর্তব্য আছে তো ছেলের ?

খানিকটা পাগলামিই মনে হয়েছে সমীরের এই ঝোঁকটা পঙ্কজের কাছে। যে টাকা করতে চায়—অনেক টাকা করতে চায়—সে যে কি করে শ'তিনেক টাকা বেতনের চাকরী পেয়েই সাগ্রহে সেটা নিয়ে নেয়, আবার তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে করে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চায় পঙ্কজ বুঝতে পারে না। মহেশ্বরের ঘটা করে পূজা করা দেখে তার প্রচুর টাকা আছে ভেবে যে সমীর তাড়াতাড়ি সুরমাকে বিয়ে করেছে এটা তার খেয়ালে আসে না।

পরমেশ্বরকে সে বলেছিল, এও একটা চাল হবে ছেলেটার।

: নিজের অজান্তে চাল দেয়—বেচারার দোষ নেই।

: যেমন শিক্ষা পেয়েছে সেটা যাবে কোথায় ?

: এদেশে ভাল শিক্ষা কে পায় বল ?

: এমনি ভাল ছেলে কিন্তু এইরকম কতগুলি পাগলামি আছে ওর। তিনশ' টাকার চাকরী করে সে লাখপতি হবে।

পরমেশ্বর হেসে বলেছিল, সমীর যদিবা কোনদিন লাখপতি হয়, তুমি কখনো হতে পারবে না!

ঃ কি রকম ?

ঃ তুমি টাকার মর্য্যাদা জান না ! বি,এ পাশ করেই ও সুযোগ পেল মাসে মাসে তিনশ' টাকা রোজগারের—সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ নিয়ে নিলে। নইলে কি হত? আরও হু'বছর ঘরের পয়সা খরচ করে এম,এ পড়ত। হু'টি বছর সময় নষ্ট, পয়সা নষ্ট। তিনশ' টাকার চাকরী নিয়ে ভাল করে নি ?

কিন্তু তবু পঙ্কজ মানে বুঝতে পারে না তার চাকরী করার। চাকরী করার বদলে ছোটখাট একটা দোকান দিয়ে বসলে বরং সে বিশ্বাস করতে পারত যে সমীর দোকানদার থেকে ব্যবসাদার হবার সঠিক পথ ধরেছে।

প্রতিমার মধ্যে কেমন একটা অস্থিরতা, উন্মনা ভাব দেখা যাচ্ছিল। মেজাজটা যেন এলোমেলো হয়ে উঠছিল তার।

পূজার সময় পঙ্কজ হুটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সবিতার গান গাইবার ব্যবস্থা করে দেয়।

নতুন যে গান শিখেছে সে গান নয়।

তার বাপের রচিত পূর্ব বাঙ্গালার গ্রাম্য গান।

গান শুনিয়ে সবিতা জীবনে প্রথম রোজগার করে, হু'টি আসর থেকে কড়কড়ে পঁচিশটা টাকা।

পঙ্কজ বলে রেখেছিল কিন্তু অনুষ্ঠান হু'টির উদ্যোক্তাদের মনে যথেষ্ট খটকা ছিল। সবিতা গান গাওয়ার পর খুসী হ'য়ে তারা গানের দাম দিয়েছে—টাকার পরিমাণটা কম বলে লজ্জিতভাবে সবিতাকে বলেছে সে যেন কিছু মনে না করে !

প্রথম আসরে হু'খানা গানের জন্য দশটাকা দিয়েছিল। দ্বিতীয় আসরেও দশটাকা মজুরিতে তার হু'খানা গান গাওয়ার কথা ছিল।

শ্রোতাদের দাবীতে আরেকটা গান গাইতে হয়। দশটাকা পেলেই সে

খুসী হত। কিন্তু সে সভার উদ্যোক্তারা সানন্দে তাকে পনের টাকা দিয়েছিল।

পঙ্কেজের সঙ্গে প্রতিমাও গিয়েছিল এ দু'টি আসরে।

তারপরেই যেন বেড়ে গিয়েছিল তার অস্থিরতা আর মেজাজ বিগড়ে যাওয়া।

সুরমার বিয়ের দু'দিন আগে গায়ে পড়ে কি অপমানটাই সে করে বসল সবিতাকে!

একটি অসহায় নিরুপায় উদ্বাস্তু মেয়েকে সাধনের বন্ধু অসীম বিনা পয়সায় নিয়মিত বাস ভাড়া দিয়ে তাদের বাড়ী এসে গান শেখাবে—এ পর্য্যন্ত তার যেন সহ্য হয়েছিল। কিন্তু পঙ্কজ তার গেঁয়ো বাপের গেঁয়ো গান দশজনের আসরে শোনাবার ব্যবস্থা করে তাকে কয়েকটা টাকা পাইয়ে দেবে এটা যেন সহ্য হয় না প্রতিমার।

কিন্তু সেটা বোঝা খুব কঠিন হয় আত্মীয় স্বজনের পক্ষে—পঙ্কজের পক্ষেও।

কারণ, ঠিক এই সময়েই আচমকা ঠিক হয়ে যায় সুরমা ও সমীরের বিয়ের কথা।

কথাটা ঠিক হওয়া মাত্র সে যেন কোমর বেঁধে সুরু করে বোনের সঙ্গে ঝগড়া।

উঠতে বসতে সুরমাকে খোঁচায় রাগায় অপমান করে।

এতখানি মাত্রা চড়িয়ে করে যে পরমেশ্বরকে পর্য্যন্ত বলতে হয়. তুই একটা কড়া জোলাপ খাবি না আমাকে তাড়াবি বাড়ী থেকে?

: জ্যাঠামশাই! কি বলছ তুমি?

তার পায়ের কাছে যেন আছড়ে পড়ে প্রতিমা।

চশমাটা অল্পের জন্য বেঁচে যায়।

পরমেশ্বরের পা জড়িয়ে ধরে বলে, আমাকে সবাই এমন তুচ্ছ করে কেন বলত ?

পরমেশ্বর তার মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলে, তুই পরে বড় হবি তাই তোকে আজ তুচ্ছ করে।

প্রতিমা উঠে বসে। আঁচল খসে গেছে, ব্লাউজ ফেঁসে গেছে।

পরমেশ্বর বলে, থাক থাক, লজ্জা পেতে হবে না অত। তোকে আমি ন্যাংটো দেখেছি। সুরমাটা বোকা—ওর অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে। কিন্তু দুঃখ পেয়ে পেয়ে ও সামলে উঠতে পারবে। তুই বাঁকা পথে চলছিস, ডুবে যাবি বয়ে যাবি। তোর এই বিকারের চেয়ে বড় অভিশাপ মেয়েদের আর হয় না।

এই ধিক্কারে সামলে গিয়েছিল প্রতিমা।

ধীরে ধীরে উঠে বসে গায়ে আঁচল জড়িয়েছিল। আছড়ে পড়ার জন্য কপাল কেটে রক্ত পড়ছিল টের পেয়েই বুঝি মুহূর্ত্তের মধ্যে মাথাটা কাত করেছিল।

বাঁদিকের কাণের উপরে মাথাটা কেটে গিয়ে—ফেটে যায়নি—ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে।

হাতে ওই রক্ত মাখিয়ে চুলটা ঠিক করতে করতে প্রতিমা বলেছিল, উঃ! তুমি যদি মরে যেতে জ্যাঠামশায়! আমরা একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচতাম।

পরমেশ্বর উচ্ছাসিত ভাবে হেসে উঠেছিল। আমাকে মেরে বাঁচতে চাস? আমি মরব তবে তুই বাঁচবি? বেশ বুঝেছিস তো বাঁচার নিয়ম!

প্রতিমা গায়ে পড়ে অপমান করার পর সবিতা গান শিখতে আসে না।

দু'সপ্তাহে অসীম দু'বার এসে ফিরে যায়—তার একটি মাত্র বিনে পয়সায় শেখাবার ছাত্রী ও বাড়ীতে এসে তার কাছে বিনা পয়সায় গান শিখবে না।

শেখাতে হলে ওই বস্তিতে গিয়ে শেখাতে হবে।

পরমেশ্বর বলে, ওর একটা কিছু ভবিষ্যৎ হিল্লে করতে তুমি হপ্তায় একদিন বাসের পয়সা খরচ করে মেয়েটাকে গান শেখাতে আস। এ সংসারটা ভেঙ্গে গিয়ে তোমার ওই ভবিষ্যৎ গড়ছে, বড়ই আনন্দের কথা। তুমি বরং এক কাজ কর। পঙ্কজের বাড়ীতে মেয়েটাকে গান শেখাও।

সুরমার বিয়ের দু'দিন আগে প্রতিমা শুনতে পায় পঙ্কজের পড়ার ঘরে অসীম গান শেখাচ্ছে সবিতাকে।

আধুনিক গান শেখাচ্ছে।

সন্ধ্যার পর পড়ার ঘরে গিয়ে প্রতিমা হাসিমুখেই পঙ্কজকে বলে, বাপ জ্যাঠা সবাইকে ডিঙ্গিয়ে দিদি কেমন নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন!

: ভালই তো, বাপ জ্যাঠার ঝন্‌ঝাট চুকে গেল।

: সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগছে কি জানো? বাবা কোন আপত্তি করলেন না! বাবার কাছে ওদের সংসারটা তো ম্লেচ্ছের সংসার, এরকম একেলে সংসারে গিয়ে দিদি তো বিপাকে পড়ে যাবে! এসব কোন কথা একবার মনেও আনলেন না! জ্যাঠাকে একবার শুধু জিজ্ঞেস করলেন, আপনার আপত্তি নেই তো? তারপরেই মত দিলেন। অবস্থার সঙ্গে বাবার মনটাও কি পালটে গেল?

: তা কিছুটা যাবে না? ক্রমে ক্রমে আরও যাবে। কিন্তু তুমি কি এসব কথা মহেশ্বর বাবুকে মনে করিয়ে দিয়েছিলে?

: আমার কি গরজ?

: আজ বিয়ের সব ঠিক হবার পর এসব কথা নিয়ে তবে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?

: দিদির কি অবস্থা হবে ভাবছি। সমীরবাবুর বাড়ীর যারা আসে তাদের সাজ-পোষাক চালচলন দেখেছ? আমাদের গেঁয়োমি দেখে হাসাহাসি করছে। দিদি আর সমীরবাবুর সত্যিকারের ভালবাসা হলেও বরং কথা ছিল। ক'দিন ধোপে টিকবে?

খানিক থেমে প্রতিমা আবার বলে, ক'মাসের আলাপেই ওনাদের ভালবাসা জন্মে গেল! দেরী সয় না, তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়া চাই!

পঙ্কজ একটু হেসে বলে, তোমার বাবার চেয়ে তোমার খুঁতখুঁতানিই দেখছি বেশী। হিংসে হচ্ছে নাকি? এই সঙ্গে তোমার হলেও চুকে যেত? কিন্তু তুমি এখন বিয়ে করবে না, পড়বে, এতো জানাই আছে।

: কে বললে?

: বল কি! বিয়ের সাধ জেগেছে নাকি তোমার?

: সাধ জাগলেই বা আমায় বিয়ে করছে কে?

পঙ্কজ সত্যই আশ্চর্য্য হয়ে যায়। তার পড়ার ঘরে এসে এভাবে প্রতিমা কথা বলছে! গত কয়েকদিনের পাগলামি আর আজকের এরকম গ্রাম্য ভাব তার কেন এল কোথা থেকে এল কে জানে!

পঙ্কজ হাসিমুখেই বলে, লোকের কি অভাব আছে? বাবাকে জানালেই ছেলে খুঁজে এনে বিয়ে দিয়ে দেবেন! সেবার অত ভাল সম্বন্ধ এল, তুমি ঝগড়া করে সব ভেস্তে দিলে।

: ওরকম বিয়ে চাইনে।

একটা বই টেনে নিয়ে প্রতিমা পাতা উল্টায়। অগ্রহায়ণ এসে গেছে কিন্তু শীতের আমেজ ভাল করে টের পাওয়া যায় না। মুখ তুলে প্রতিমা বাইরের কুয়াশার দিকে তাকায়। কাছাকাছি আলোগুলিতে রহস্য ঘিরে রয়েছে। দূরের আলোগুলি হয়েছে অস্পষ্ট।

প্রতিমা হঠাৎ বলে, তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় কবে ?

: গেঁয়ো স্কুল থেকে পাশ করে যেবার কলকাতায় পড়তে এলে। তোমাকে এনেই সাধনের জর হয়, আমি তোমায় ভর্তিটর্তি করে দিলাম। প্রায় আড়াই বছর হল।

: আড়াই বছর আমাদের আলাপ !

সত্যই আজ কি যেন হয়েছে প্রতিমার। এরকম সুস্পষ্ট উস্কানির ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলার মত মানসিক অবস্থা তার হতে পারে শুধু সমীরের সঙ্গে তার পিঠাপিটি বোনটির বিয়ে হবে বলে, এটা যেন বিশ্বাস হতে চায় না পঙ্কজের।

ক'মাসের পরিচয়ে ভালবাসা হয়েছে, সমীর ব্যস্ত হয়ে ব্যবস্থা করেছে বিয়ের—ব্যঙ্গের স্বরে একথা বলার পরে এভাবে ইঙ্গিত করা যে তাদের পরিচয় আড়াই বছরের পুরাণো।

অথচ আজ পর্য্যন্ত অস্পষ্টভাবেও মনের কথার আদানপ্রদান পর্য্যন্ত হয় নি তাদের মধ্যে।

পঙ্কজ ভেবে চিন্তে বলে, চাকরী করলেও আমি এখনো ছাত্রই। এদিকে শিখছি ওদিকে এপ্রেন্টিস্ খাটছি। পাশ করলে তখন চাকরী পাকা হবে। ততদিনে আমাদের ভাব পাঁচ বছরের পুরাণো হয়ে যাবে।

প্রতিমা চুপ করে থাকে।

: অবশ্য ততদিন যদি আমাদের ভাব বজায় থাকে।

: কেন থাকবে না ?

: ছাত্রী বলেই রেহাই পেয়েছ। পড়া ছাড়লেই পার করে দেবেন।

: পড়া আমি ছাড়ছি না।

পঙ্কজ আবার একটু ভাবে।

ঃ তুমি একটু বেশী বয়সে পড়া আরম্ভ করেছিলে, না?

ঃ হ্যাঁ। ছেলেবেলা খুব অসুখে ভুগছি।

এদিকটাও প্রতিমার মনে পড়িয়ে দেওয়া দরকার,—পঙ্কজ ভাবে। সমীর তিনশ' টাকার পাকা চাকরী করে, সে এখনো নামেই চাকুরে, শুধু এইটুকুই পার্থক্য নয় তাদের মধ্যে। সমীর তার চেয়ে বছর কয়েকের বড়।

ওদের বেলা বয়সের হিসাবে মানান বেমানান হওয়ার কথা কারো ভাববার দরকার হয় নি কিন্তু তাদের বেলা হবে। আজ যদি সে বিয়ে করতে চায় প্রতিমাকে, সামান্য বেতনে কাঁচা চাকরী আরও দু'বছর আড়াই বছর ধরে তাকে করতে হবে বলে মহেশ্বরের আপত্তি যদি নাও হয়, তাদের মধ্যে বয়সের তফাতটা কম বলে নিশ্চয় তার আপত্তি হবে। তার নিজের বাড়ীর আপত্তির কথাটা না হয় নাই ধরল।

এটা বুঝতেই হবে প্রতিমাকে।

প্রতিমা অনেকক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকে।

মুখ ফিরিয়ে বলে, সত্যি, ছেলেবেলা ভাগ্যে অসুখ হয়েছিল, দেরীতে পড়া আরম্ভ করেছিলাম। নইলে মুস্কিল হয়ে যেত, বিয়ে ঠেকাবার কোন অজুহাত পেতাম না! কিন্তু—

মুখে তার একটা অদ্ভুত হাসি ফোটে।

ঃ কিন্তু এম, এ পাশ করতে করতে করতে বুড়ী হয়ে যাব।

বলে বিদায় না নিয়েই সে চলে যায়।

সে চলে যাবার পর পঙ্কজের মুখে গভীর উদ্বেগের ছাপ পড়ে। এতক্ষণ জোর করে মুখের ভাব শান্ত রেখেছিল। ঝড়ের আগেকার আকাশের মত থমথমে মুখ প্রতিমার, চাউনি অস্বাভাবিক।

প্রতিমাকে মনোবিকারের ঝড়টা ওঠে সুরমার বিয়ের দিন।

সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে যায়—সারাদিন আর তার খোঁজ নেই। রাত প্রায় ন'টার সময় সুরমা যখন বিয়ের আসরে পিঁড়িতে বসেছে, তখন সে ফিরে আসে নিজেদের বাড়ীর বদলে পঙ্কজদের বাড়ীতে!

পঙ্কজরা সকলেই তখন বিয়ে বাড়ী এসেছে, বাড়ী পাহারা দিচ্ছে তার ভাগ্নে কামাই। জ্ঞান নেমন্তন্ন খেয়ে বাড়ী গেলে কানাই খেতে আসবে।

কানাই এসে পঙ্কজকে আড়ালে ডেকে বলে, প্রতিমাদি তোমায় ডাকছে।

: কোথায় প্রতিমা?

: তোমার ঘরে শুয়ে আছে। মুখচোখ কিরকম হয়ে গেছে দেখলে ভয় করে। আমায় বললে, চুপি চুপি তোমাকে ডেকে দিতে!

পঙ্কজ ঠোঁট কামড়ায়। মাথা কি সত্যই খারাপ হয়ে গেছে প্রতিমার? এদের খবর জানাবে কিনা কয়েক মুহূর্ত্ত তাকে ভাবতে হয়। ভেবে ঠিক করে আজ নিজে গিয়ে বুঝিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করাই ভাল।

কানাইকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ী যায়।

তার ঘর অন্ধকার। ঘরে গিয়ে সুইচ টিপে আলোটা জ্বালায় পঙ্কজ।

বাঘিনীর মত বিছানা ছেড়ে যেন লাফিয়ে উঠে আসে প্রতিমা।

: আলো নেভাও।

: তোমার শরীর খুব খারাপ শুনলাম?

: আমার শরীর ঠিক আছে। দেখে বুঝতে পারছ না শরীর আমার ঠিক আছে?

: তোমার জ্বর হয়েছে নাকি?

: জ্বর হলে তো বাঁচতাম।

প্রতিমা নিজেই আলোটা নিভিয়ে দেয়।

বলে, এসো আমরা শুয়ে পড়ি। অনেক রাত হয়ে গেছে।

এটা নিছক রোগ। কিন্তু হিষ্টিরিয়ায় কি মুখ চোখ এরকম হয়ে যায়? চোখ এত লাল হয়?

কি করা যায়?

প্রতিমা ফুঁসে উঠে বলে, সমস্ত হিসাব নিকাশ আমি চুলোয় দিয়েছি। চলে এসো।

পঙ্কজ বলে, হিসাব নিকাশ ছাড়াও আমি তো আছি?

: থেকে কি লাভ হচ্ছে আমার? মস্ত পুরুষ মানুষ!

: তোমায় আমায় লাভের হিসাব তো জগত চলে না প্রতিমা। তোমার সত্যি অসুখ করেছে। বলে পঙ্কজ আবার আলো জ্বালে।

খাটের নীচে পঙ্কজেরই জুতা ছিল।

প্রতিমা একটা জুতা ছুঁড়ে মারে পঙ্কজকে।

বলে, তুমি যাও চলে, যাও সামনে থেকে।

পঙ্কজ শান্তভাবেই বলে, তোমার শরীর খারাপ তাই রাগ করছ। তোমাকে আদর করতেই তো এসেছি আমি।

: সত্যি?

প্রতিমা নিজেই হাত বাড়িয়ে আলো নিভিয়ে দেয়।

দু'হাতে পঙ্কজের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, এসো।

: ইস্, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে!

: যাক্ পুড়ে। বিছানায় এসো।

: চলো। কপালে জলপটি দিয়ে বাতাস করতে হবে। বরফ আনতে দিতে হবে। কানাইকে ডাকি? আমি তোমার কাছে থাকি, কানাই ওসব নিয়ে আসুক। নইলে আমাকেই যেতে হবে।

: না না, তুমি যেও না, কানাইকে ডাকো।

ওদিকে বিয়ে হয় সুরমার এদিকে সতীশ ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে প্রতিমাকে।

: কখন জ্বর এল ?

সুভাগিনী বলে, আমরা তো কিছুই জানি না। বাড়ীতে বোনের বিয়ে, মেয়ে সকাল থেকে সারাদিন বাইরে কাটিয়ে রাত্রে খালি বাড়ীতে এসে শুয়ে পড়লেন। ভাগ্যে কানাই পঙ্কজকে ডেকেছিল।

প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়।

রাঙা চোখ মেলবার চেষ্টা করে সে বলে, জ্বর হয় নি। বিয়ে হয়েছে।

পরীক্ষা চালাতে চালাতেই ডাক্তার বালতি ভরা ঠাণ্ডা জল আনবার হুকুম দেয়, বলে, মেঝেতে শুইয়ে নাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। তিন চার বালতি জল ঢালবেন।

তারপর প্রশ্ন করে, ম্যালেরিয়া আছে ?

: গত বছর কয়েকদিন ভুগেছিল।

আধঘণ্টা পরে প্রতিমার গায়ের তাপ একশো একের নীচে নামলে অন্যান্য বিধান দিয়ে সতীশ বিদায় নেয়।

পঙ্কজের ঘরে তার বিছানায় প্রতিমার রাত কাটে। তার বিধবা পিসী আসে তাকে পাহারা দিতে, মেঝেতে মাদুর পেতে শোয়।

গম্ভীর থমথমে হয়ে গিয়েছিল এ বাড়ীর মানুষদের মুখ, কে বলবে তারা এক বিয়ে বাড়ীর উৎসবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এসেছে।

তেমনি ক্রুদ্ধ গম্ভীর মুখে তারা শুতে যায়।

পঙ্কজকে কেউ জিজ্ঞাসাও করে না সে কোথায় শোবে।

সকালেই দেখা গেল জ্বর একেবারেই নেই এবং মাথাও প্রতিমার অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

ওবাড়ীর সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাড়ীর আরেক মেয়ের বিয়ের হাঙ্গামার দিকে মন দেয়।

সকালে সতীশ ডাক্তার এসে কতগুলি প্রশ্ন করে মাথা নেড়ে বলে, না, এতো সাধারণ জ্বর মনে হচ্ছে না।

প্রতিমাকে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করে, কাল সারাদিন কি করেছিলে, কি খেয়েছিলে, আমায় বলতে হবে মা!

: আমি কিছুই করিনি, কিছুই খাই নি।

সতীশ ডাক্তার একটু হাসে।

: যাক্ গে, যাক্ গে।

সতীশের সঙ্গে পঙ্কজ বেরিয়ে যায়।

একেবারে রাস্তায় নেমে জিজ্ঞাসা করে, জ্বরটা কিসের ডাক্তারবাবু?

সতীশ থেমে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত তার মুখের আগ্রহ ব্যাকুলতার ভাবটা লক্ষ্য করে।

: যতদূর বুঝেছি বাবা, জ্বরটা হল নার্ভাস ফিভার। নার্ভগুলি বিগড়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে আরও কতকগুলি ফিজিক্যাল কজ্ জুটে হাইপারপাইরেক্সিয়া ঘটিয়েছিল। কথাটার মানে বুঝলে তো? ওটা হল একশো সাড়ে পাঁচের বেশী জ্বরের ডাক্তারি নাম।

একটু থেমে সতীশ আবার বলে, বাড়ীতে বিশ্রাম করলে নার্ভাস রিয়্যাকসনের জন্য জ্বর জ্বর ভাব হত, সেরে যেত। তার বদলে শরীরের ওপর অত্যাচার হওয়ায় বেশী জ্বর এসেছে।

: কিন্তু এত বেশী জ্বর নিয়ে চলতে ফিরতে পারে?

: সাধারণ জ্বরে পারে না, বিকারের জ্বরে পারে। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই বিপদ ঘটে। বিকারে একটা ঝোঁকে চলতে আরম্ভ করে, ঝোঁকটা একটু এলোমেলো হলেই পড়ে যায়। বাইরে থেকে একা ফিরে নিজে

নিজে বিছানায় গিয়ে শোয়—এ একেবারে রেয়ার কেস। আমার মনে হয় সমস্ত বিকারের ঝোঁকটা কন্‌সেণ্ট্রেটেড হয়েছিল বাড়ী ফেরায়, তাই এটা সম্ভব হয়েছে।

রাতারাতি জ্বর জ্বর কমে যাওয়ায় ওবাড়ীর সবাই যে প্রতিমাকে একেবারে ভুলে গিয়ে সুরমার বিয়ের উৎসবে মেতে থাকে তা নয়, তবে প্রতিমার সঙ্গে নির্জ্জনে পাঁচ দশ মিনিট কথা বলার সুযোগ পঙ্কজ পায়।

: কাল কোথায় গিয়েছিলে ?

: বন্ধুর বাড়ী।

: মিলিদের বাড়ী ?

: মিলি আমার বন্ধু নাকি ? রত্নার কাছে গিয়েছিলাম বিয়ের নেমন্তন্ন করতে।

: আগে কর নি ?

: না।

: তারপর ?

: তারপর ভাবলাম, কলকাতার দেখবার যায়গাগুলি তো অনেকদিন দেখি নি। হাজার হাজার লোক রোজ দেখছে, আমি সেই যে ছেলেবেলা একবার দেখেছিলাম আর যাওয়াই হয় নি। তাই ভাবলাম আজকে যতগুলি পারি দেখলে দোষ কি ?

প্রতিমা হাসবার চেষ্টা করে। এক রাত্রে তার মুখ হয়েছে সাতদিন কঠিন জ্বর ভোগ করা রোগীর মত শুকনো।

: তারপর ?

: ঘুরে ঘুরে দেখলাম। প্রথমে গেলাম মিউজিয়মে, তারপর দুপুর বেলা গেলাম চিড়িয়াখানায়।

: কিছু না খেয়ে?

: তেলেভাজা খেলাম। আঃ, কি সুন্দর যে করে ওই সস্তা খাবারগুলো! সন্দেশ রসগোল্লা পুডিং কোথায় লাগে!

পঙ্কজ সকাল থেকে তিনবার থার্মোমিটার দিয়ে তার জ্বর দেখেছে। আবার থার্মোমিটারটা নামিয়ে প্রতিমার বগলে লাগিয়ে দিয়ে বল্লে, জ্বর এল কখন?

: তা জানি না। চিড়িয়াখানায় ঘুরতে ঘুরতে ভারি শীত করতে লাগল। বমি বমি লাগতে লাগল। একবার বমি করে ফেললাম।

: তেলেভাজাগুলি উঠে এল তো?

: উঠে তো এল। তুমি এতবার থার্মোমিটার দিচ্ছ কেন?

পঙ্কজ সে কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তারপর কি হল?

: ভীষণ শীত করতে লাগল। ভেতর থেকে যেন কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে উঠতে লাগল। ম্যালেরিয়ার শীত আর কাঁপুনি কোথায় লাগে। একটা বেঞ্চে শুয়ে পড়লাম।

: তখন কটা হবে?

পঙ্কজের প্রশ্নে এবার বিরক্ত হয়ে প্রতিমা বলে, তুমি দেখছি জেরা সুরু করলে! বিকাল চারটে হবে।

থার্মোমিটার বগল থেকে বার করে জ্বর দেখে পঙ্কজ বলে, তুমি তো বাড়ী ফিরলে রাত প্রায় সাড়ে আটটায়। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

প্রতিমা বলে, তামাসা করছ আমার সঙ্গে? বেঞ্চে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তুমি গিয়ে গাড়ী করে আমায় বাড়ী নিয়ে এলে না?

দশ

জীবনের কি বিচিত্র ব্যঞ্জনা। এইটুকু পাড়ার মধ্যে!

দোতলা তেতলা—তেতলা মোটে দুটি—কতগুলি দালান, এবড়ো খেবড়ো ইঁটতোলা আর নম নম করে পিচ ঢালা কয়েকটা গলিপথ, খানিকটা ফাঁকা জমি, ডোবার মত একটা পুকুর, পুরাণ বস্তির কাঁচা ঘরবাড়ী, তার ওপাশে জঙ্গলে বাগানটায় দশ বার ঘর উদ্বাস্তুদের হোগলার ঘরের কলোনি—কত বিভিন্ন অবস্থার কত রকম রুচি ও প্রকৃতির কত রকমের বিচিত্র মানুষের জীবন।

শীত নেমে এসেছে। মাঘের শীত বাঘের শীত।

লম্বা অলষ্টার গায়ে চাপিয়ে বেলা প্রায় ন'টার সময় বিনোদ বাগানের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়াতে পোয়াতে রাস্তায় গাড়ী আর লোক চলাচল দেখছিল—পঙ্কজ গলি থেকে বেরিয়ে বাসের জন্য দাঁড়িয়েছে দেখে ডেকে বলে, শোন—

পঙ্কজ এলে বলে, আমি তো বাবা বড় একটা বিপদে পড়ে গিয়েছি।

পঙ্কজ ভাবে, সর্ব্বনাশ! তার কি দু'চার মাস জেল খাটা দরকার হবে?

বিনোদ বলে, মহেশ্বরবাবু তো কোনদিকে না তাকিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন। বিয়ের দু'দিন আগে মোটে খবর পেলাম। তখন আর কি করা যায় বল? বিয়েটা পণ্ড করা, একটা কেলেঙ্কারি করা—

পঙ্কজ বলে, দেরী হয়ে যাবে। একটু তাড়াতাড়ি বলুন।

বিনোদ রেগে যায় কিন্তু রাগ সামলে বলে, বিধুভূষণ কি বালীগঞ্জে বাড়ী করার জন্য এ বাড়ী বেচেছিল হে? বাড়ী না বেচলে তার উপায় ছিল না। দেনার দায়ে জেলে যেতে হত।

: আমি তার কি করব বলুন?

: তুমি ওদের বাড়ী যাওয়া আসা কর কি না—

: সে তো আমি সবার বাড়ীতেই করি। আপনার বাড়ীতেও যাই আসি।

দূর থেকে একটা বাস আসছে দেখে পঙ্কজ রাস্তার ওপারে সরে গিয়ে দাঁড়ায়।

তার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে থেকে বিনোদ ভাবে, খাঁটি ছেলেরা কি চিরকাল পাগল হবে?

কি আপশোষ! কি আপশোষ!

কিন্তু এত বড় দুঃসংবাদটা মহেশ্বরকে না জানিয়েই বা পারে কি করে বিনোদ?

মহেশ্বর এখনো তার বাড়ীতে দেখা করতে আসে নি। সুতরাং তার বাড়ীতে নিজের যাওয়াও সম্ভব নয় বিনোদের। অগত্যা সে পাড়ার যত চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয় সকলকেই জানিয়ে দিতে থাকে যাতে পাঁচজনে বলাবলি করতে করতে খবরটা পৌঁছে যায় মহেশ্বরের কানে।

সদাশিব খবরটা জানায় মহেশ্বরকে।

ছড়ি ঘুড়িয়ে বেড়াতে যাবার পথে মহেশ্বরকে বাইরের বারান্দায় বসে থাকতে দেখে বলে, নমস্কার, ভাল আছেন?

: আছি একরকম। আপনার খবর ভাল? আসুন বসুন।

: না আর বসব না, একটু বেড়িয়ে আসি। মেয়ে বুঝি শ্বশুরবাড়ী?

: হ্যাঁ।

: বড়ই দুঃখের বিষয় হল, ভদ্রলোক এমন করে আপনাকে ঠকালেন! আমরা তাই বলাবলি করছিলাম, একটা মানুষ দেশছাড়া হয়ে এসেছেন, তার সঙ্গে এমন জুয়াচুরি করা কি উচিত?

: কি বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না তো?

: বিধুবাবুর কথা বলছি—আপনার বেয়াই বিধুবাবু। ছেলের বিয়ের আগে পর্য্যন্ত কি কৌশলে গোপনে রেখেছিল ব্যাপারটা, কাকপক্ষী টের পায়নি! দেনার দায়ে পথে বসতে চলেছে জানলে তো আর আপনি মেয়ে দিতেন না ওর ঘরে।

মহেশ্বর আশ্চর্য্য হয়ে বলে, বিধুবাবুর দেনায় দায়? আমি তো কিছুই জানি না!

সদাশিব আশ্চর্য্য হয়ে যাবার ভাণ করে বলে, সে কি কথা মশায়? সবাই জেনে গেল, আর আপনার নিজের মেয়ের শ্বশুর, তার এমন কীর্তিটা আপনিই জানলেন না? বালীগঞ্জে বাড়ী করবেন বলেছিলেন বিধুবাবু—সব বাজে কথা। বাড়ী নীলাম হত, বেচে দেনা শোধ দিয়েছেন। একটা বাড়ী ভাড়া করে থাকার ক্ষমতাও নেই—বড় ভায়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছেন।

মহেশ্বর নীরবে শোনে। তার মুখের ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে না।

সদাশিবের কথা শেষ হলে মহেশ্বর গম্ভীর মুখে বলে, উনি কোন জুয়াচুরি করেন নি।

: বলেন কি!

: বাড়ী বেচবার সময় ওনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবার কোন কথাই উঠে নি। আমাকে ঠকাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। দেনার দায়ে বাড়ী বেচতে হলে মানুষ কি খবরটা ঢাক পিটিয়ে বেড়ায়? আপনিও গোপন করতেন। আমি ছেলে দেখে মেয়ে দিয়েছি, বাপের অবস্থা জিজ্ঞেস করতে যাই নি। কাজেই আমাকে ঠকালেন কোথায়? তিনি অতি সজ্জন ব্যক্তি।

সদাশিব আর কথা বলতে পারে না।

মহেশ্বর বলে, এতকাল প্রতিবেশী ছিলেন, আপনারা মিথ্যে দুর্নাম রটাচ্ছেন মানুষটার!

সদাশিব চটে লাল হয়ে বেড়াতে যায়!

কিন্তু কথাটা তুচ্ছ করার মত নয়।

সদাশিবকে মহেশ্বর মুখে যাই বলুক মনে মনে সে বিধুভূষণকে একেবারে রেহাই দিতে পারে না।

তার আর্থিক দুরবস্থার কথা জানলেও সমীরের চাকরী ইত্যাদির হিসাব ধরে তার হাতে মহেশ্বর মেয়ে দিত কিনা সেটা আলাদা কথা। বিধুভূষণ তো জানত যে তার অবস্থার হিসাবটাও মহেশ্বর ধরেছে সম্বন্ধ ঠিক করার সময়।

বালীগঞ্জে সে বাড়ী করবে এ কথাটা আগে অন্যভাবে বললেও কথাটা যে মহেশ্বর বাতিল করে নি এটাও তো খেয়াল ছিল বিধুভূষণের।

বিধুভূষণ অন্যায় করেছে শুধু এটাই বড় কথা নয়। বিয়ে যখন হয়ে গেছে আর ফিরবে না। সুরমাকে কত কষ্ট ভোগ করতে হবে ভেবে সকলের দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না।

মেয়ে জামাই ফিরে এলে মহেশ্বর সুরমাকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করে।

সুরমা জানায় কথাটা মিথ্যা নয়। দেনার দায়েই এই বাড়ী বেচতে হয়েছিল বিধুভূষণকে এবং সম্প্রতি বাড়ী তৈরী করার সাধ্য তার নেই।

তবে তার বড় ভাই ফণিভূষণের অবস্থা ভাল। তারা লোকও ভাল। তারা অবস্থার উন্নতি করার জন্য চেষ্টা করবে, সে সুযোগ দেবার জন্য ফণিভূষণ দু'একবছর বিধুভূষণের পরিবারকে আশ্রয় দেবে। কেবল সমীরের আয়ের উপর নির্ভর করতে হবে না।

শুনে সকলে খানিকটা স্বস্তি বোধ করে।

কিন্তু বেশীদিনের জন্য নয়।

আরেক পূজার দিন ঘনিয়ে আসে।

মহেশ্বর একদিন একটি চিঠি পায় বিধুভূষণের।

শুভ সংবাদ। সুরমার সন্তান হবে জানা গিয়েছে।

পরদিন মহেশ্বর মেয়েকে দেখতে যায়। বিধুভূষণকে অনুরোধ জানায় যে সুরমাকে কয়েকদিনের জন্য নিয়ে যেতে চায়, বাড়ীর মেয়েরা তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

পূজোর সময় অবশ্য সে যাবে। তখন ভারি মাস হবে সুরমার, একেবারে বাপের বাড়ীতেই থেকে যাবে। কিন্তু এখন কয়েকদিনের জন্য সুরমা একটু বেড়িয়ে আসবে।

বিধুভূষণ বলে, ছেলে বাড়ী আসুক, বলব। ওই গিয়ে পৌছে দিয়ে আসবে।

: আপিস থেকে কখন ফেরে সমীর?

: তার কিছু ঠিক নেই। কোন দিন দশটা হয়, কোন দিন এগারটাও বাজে। চাকরীতে ওর মন নেই, ব্যবসা করার ইচ্ছা। ওই সব ব্যাপার নিয়ে মেতে আছে।

পরদিন সন্ধ্যার পর সমীর আসে। একা।

মহেশ্বর বলে, সুরমাকে আনলে না?

: কদিন বাদে আনব। আমি একটু কাজে এসেছি।

তার গম্ভীর অন্যমনস্ক ভাব দেখে মহেশ্বর অস্বস্তি বোধ করে।

: কি কাজ?

: আপনার সঙ্গে দরকারী কথা আছে।

শুনে রীতিমত ভয় করে মহেশ্বরের।

: চা খেয়ে নাও। খারাপ সংবাদ নয় তো?

: না।

চা জলখাবার খেতে খেতে সমীর সুভাগিনীর কথার ছাড়া ছাড়া জবাব দেয়, সাধনের আলাপ করার চেষ্টা তার অন্যমনস্কতার জন্য ভেস্তে যায়।

খাওয়া শেষ হলে মহেশ্বর বলে, কি বলছিলে বল। এরা কি চলে যাবে? এতক্ষণ সে গড়গড়া টানছিল। এখন নলটা নামিয়ে রাখে।

সমীর বলে, এদের যাবার কি দরকার। গোপন কথা কিছু নয়।

মহেশ্বর প্রতীক্ষা করে।

সমীর ধীরে ধীরে বলে, আমাকে হাজার দশেক টাকা ঋণ দিতে হবে। এক বছরের মধ্যে শোধ করে দেব।

ঘরে যেন বজ্রপাত হয়। সবাই নির্ব্বাক হয়ে থাকে।

সমীর বলে, আমি অনেক দিন থেকেই ব্যবসা করার কথা ভাবছিলাম। সামান্য মাইনেতে চাকরী করে কোন লাভ নেই। বাবা নিজের দোষে লাখ খানেক টাকা নষ্ট করে বসেছেন—বাবার আর কিছু নেই। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমাদের আগেকার অবস্থা ফিরিয়ে আনব। কি ভাবে কি করব এতদিন বিচার বিবেচনা করছিলাম। কয়েকটা যোগাযোগ হয়েছে, সুযোগ সুবিধা পেয়েছি। আজকাল কতগুলি ব্যবসা আছে, সাহস করে লাগতে পারলে একবছরে লাল হয়ে যাওয়া যায়।

সমীর দু'একজন উচ্চপদস্থ লোকের নাম করে। কি ভাবে নানা ব্যবসায়ে আজকাল মুনাফার পাহাড় জমানো যায় তার সাধারণ বিবরণ দাখিল করে।

বলে, টাকা ফিরিয়ে দিতে আমার একবছরও লাগবে না।

সাধন বলে, তুমি যা বললে তার মানে তো দাঁড়ায় তুমি চোরাকারবারে নামতে চাইছ।

: আমি পয়সার জন্য কারবার করতে নামব, সেটা চোরা কারবার না খোলা কারবার অত দেখলে চলে না।

সুভাগিনী বলে, সে কথা যাক্ গে। কিন্তু আমরা অত টাকা কোথায় পাব বাবা? জলের দরে সব বেচে দিয়ে এসেছি—

মহেশ্বর বলে, এক বছরের মধ্যে ফিরে পাব জানলে দশ হাজার টাকা আমি তোমায় দিতে পারি। কিন্তু চোরা কারবার করার জন্য আমি তো টাকা দেব না বাবা। তুমিই বা এদিকে যাচ্ছ কেন? এ দুর্বুদ্ধি তোমার কেন হল? সৎপথে থেকে শাক ভাত খাওয়া ভাল তবু অসৎ পথে পা দিতে নেই। তোমার ভালর জন্যই বলছি, মরীচিকার পিছনে ছুটো না। এ ভাবে কোটি টাকা করেও জীবনে সুখী হতে পারবে না।

সমীর বলে, চোরা কারবার? আপনার ছেলে বলল বলেই কি আমি চোরা কারবারে নামছি? আপনি গিয়ে খাতা-পত্র দেখে আসবেন।

মহেশ্বর জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যবসা করবে তুমি?

সমীর জবাবে বলে, আপনি টাকা দিতে পারবেন কিনা বলুন।

মাহশ্বর চুপ করে থাকে।

অন্য কেউ কোন কথা কয় না।

সমীর বিদায় না নিয়েই শ্বশুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়।

সাধন বলে, মদ খেয়ে এসেছে। গন্ধ পেলাম।

মহেশ্বর বলে, মা! মাগো!

পরমেশ্বর বলে, তোমাদের সবাইকার দেখছি নাড়ী ছাড়ার অবস্থা। মদ যদি খেয়েই থাকে—কত বড় আশার কথা যে একটি আবোল তাবোল কথা বলে নি!

মহেশ্বর কপাল চাপড়ে বলে, মদ খেয়েছে, তবু আশার কথা?

পরমেশ্বর বলে, মদ কি ও নিজের ইচ্ছায় খেয়েছে? ওর কি সখ আছে মদ খাবার? বেচারা শুধু টাকা চায়। মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে প্রচার করে টাকা পেলে ও বেচারা মাতালদের গালাগালি দিত।

সুভাগিনী বলে, রাগ করে গেল, মেয়েকে আর আসতে দেবে না।

পরমেশ্বর ভরসা দিয়ে বলে, না, ওসব করবে না। ও ছেলের প্রতিভা আছে, ওরকম সস্তা চালের দিকে যাবে না।

দেখা যায়, তার কথাই ঠিক। পরের শনিবার বিকালে সমীর সুরমাকে নিয়ে আসে, বোঝা যায় নিজেও শনি রবি দু'দিন থাকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে।

বলা মাত্র রাজী হয়ে যায়।

টাকা পায় নি বলে রাগ করেছে মনে হয় না তার ব্যবহার দেখে। শুধু একটু বিষণ্ণ ও গম্ভীর হয়ে থাকে।

তার চিন্তিত অন্যমনস্ক ভাব বিচলিত করে দেয় মহেশ্বরকে। জীবনে উন্নতি করবে, নিজের পথে উপরে উঠবে, সেজন্য সাহায্য চেয়েছে জামাই। টাকা দান চায় নি—চেয়েছে ঋণ। একবছরের মধ্যে ফিরিয়ে দেবে। টাকা না পেয়ে রাগ করে নি, সম্পর্ক তুলে দেয় নি, শুধু অভিমান করে আছে।

বড়ই অস্বস্তি বোধ করে মহেশ্বর। মনে হয় মেয়ে জামাই দু'জনের কছে সে মস্ত অপরাধ করেছে।

সুরমাকে সে বলে, দশ হাজার টাকা কোথায় পাব? ক্ষমতা থাকলে চোখ কান বুজে দিয়ে দিতাম। এক পয়সা আসছে না ঘরে, অথচ খরচের অন্ত নেই।

সুরমা বলে, তুমি এক কাজ করলে তো পার? তোমারও তো আয়ের একটা ব্যবস্থা করতে হবে—তুমিও ওর সঙ্গে ব্যবসা সুরু কর না? টাকা ধার না দিয়ে এইভাবে দাও—তুমি থাকলে সামলে সুমলে চলতে

পারবে। নিজে হাজার আষ্টেক টাকা যোগাড় করেছে, বাকী টাকা ধার না পেলে একজনকে পার্টনার করে ব্যবসায়ে নামবে। তুমিই নেমে যাও না?

মহেশ্বর দুঃখ আর দুশ্চিন্তার মধ্যেও হাসে, তুই পাগল হয়েছিস সুরমা। এই বয়সে আমার ধাতে কি ওসব পোষায়? সমীরের সঙ্গে ব্যবসায় নামা? দুদিনে আমাদের মধ্যে ফাটাফাটি হয়ে যাবে।

সাধন বলে, আমি নামতে পারি।

: তোর পড়াশোনা নেই?

: কি হবে পড়াশোনা করে? এই তো চাকরীর বাজার। পাশটাশ করে চাকরী যোগাড় করতে করতে তোমার হাতের টাকা যাবে ফুরিয়ে। তার চেয়ে রোজগারের চেষ্টায় নেমে পড়াই ভাল।

ভবিষ্যতে দৃষ্টি চলে না—কি হবে জানা নেই, সব অন্ধকার। সব সময় চাপ দিচ্ছে এই দুর্ভাবনা। চব্বিশ ঘণ্টা নিদারুণ উৎকণ্ঠার পীড়ন চলেছে যে একটা কিছু করতেই হবে।

একেবারে দুঃস্থ হয়ে যারা এসেছে তাদের এই বিশেষ দুর্ভাবনার বালাই নেই—নিঃস্ব হয়ে পথে বসার দুশ্চিন্তা আর তাদের করতে হয় না। গাছতলা আশ্রয় যে করেছে তার আর গাছতলা সার করার ভয় কি।

কে জানে, সমীরের সঙ্গে ভাগ্য মেলালে হয়তো তাদের কপাল ফিরেও যেতে পারে! সমীরের উৎসাহ আছে, শেয়ারের কারবারে বাপের অভিজ্ঞতারও সে অংশীদার।

কিন্তু সাধন পড়া ছেড়ে দেবে—এটা ভাবতেও সকলের মন বড়ই খুঁত খুঁত করে।

মহেশ্বর বলে পরমেশ্বরকে, সাধন তো পড়া ছেড়ে ব্যবসা করতে চায়—সমীরের সঙ্গে।

ঃ সে তো চাইবেই। ওর ছিল সখের পড়া—এ অবস্থায় কি আর পড়ায় মন বসে?

ঃ মন স্থির করতে পারছি না।

সে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে বড় ভায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

পরমেশ্বর একটা কথা বললেই তার মন স্থির হয়ে যায়—কিন্তু পরমেশ্বর সোজাসুজি কিছুই বলে না।

ঃ পূজা করার ব্যাপারে, সংসারের ব্যাপারে তোমার মন স্থির করতে অসুবিধা হয় না—এসব ব্যাপারে কেন অসুবিধা হয় জানো? এসব নতুন ব্যাপার—মন স্থির করার নিয়মনীতি জানা নেই, অভ্যাস নেই। ভেবে চিন্তে বিচার বিবেচনা করে একটা কিছু ঠিক করে ফেল।

এগার

ডোবার মত পুকুরটির ওপাশের বস্তিতে আশ্বিনের রাত্রি ভোর হবার অনেক আগেই জিতুর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

নরক যাত্রার তাগিদে।

মিউনিসিপ্যালিটির মেথররা দশদিন ধর্ম্মঘট করেছে।

আবছা আঁধারে দু'একটা ডানপিটে পাখীর ডাক শুনতে শুনতে জিতু ঘাটের দিকে এগোয়, জানা গাছটা থেকে আন্দাজে একটা দাঁতন ভেঙ্গে নেয়।

শুকোতে শুকোতে পুকুরটার জল বর্ষার আগে একেবারে নীচে গিয়ে ঠেকে, তালগাছের গুঁড়ির ঘাটটাও ধাপে ধাপে নেমে যায়—খাড়া ঢাল বেয়ে সাবধানে নামতে হয়।

বর্ষার পর এখন পুকুরটা কানায় কানায় ভরা। এখন তবু পুকুর মনে করা যায় এবং জলটা ব্যবহার করতে ঘেন্না হয় না।

তালের গুঁড়িটার উপরে এসে দাঁড়াতে নতুন একটা দুর্গন্ধ জিতুর নাকে লাগল।

দুর্গন্ধের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কলকাতার গায়ে লাগানো গেঁয়ো পাড়ায় তার সাতপুরুষের বসবাস। চারিদিকে কারখানা ঘিরে ফেলেও বহুকাল যা করতে পারে নি, এবার যুদ্ধের বাজারটা তাই করে দিয়ে গেছে। পাড়ার এই অংশটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বস্তি। নিজের নাক দিয়ে চেখে চেখে সে জেনেছে জগতে কত রকমারি দুর্গন্ধ আছে—শুকনো, ভাপ্‌সা, গরম, ঘন, পাতলা, তীক্ষ্ণ, ভোঁতা কতই যে তার বৈচিত্র্য।

রকমারিতে সুগন্ধ তার কাছে দাঁড়ায় কোথায়। ফুল, চন্দন, ধূপ, এসেন্স সব গন্ধই প্রায় একরকম, একঘেয়ে।

ঘাটের এই দুর্গন্ধটা অদ্ভুত রকমের নতুন, আগে যেন কখনো শোঁকে নি জীবনে। গা-টা কেনন ঘিন ঘিন করে ওঠে, দম আটকানো অস্বস্তি জাগে।

এ ভাবটাই যেন মনে পড়িয়ে দিতে চায় গন্ধটাকে তার। আরও একবার কি চেনা হয়েছিলো তার এই বীভৎস ভারি গন্ধটার সঙ্গে?

তাই বটে, ঠিক! মন্বন্তরের সময় একদিন সহরতলীর ষ্টেসনের দিকে হেঁটে যাবার সময় ঝাঁটার শলার গরম ঝাপটার মত দুর্গন্ধটা তার নাকে লেগেছিল। চেয়ে দেখেছিল পথের ধারে গাছতলায় ফেন মাখা মগটা আঁকড়ে ধরে একটা প্রায় পচা গলা দেহ পড়ে আছে মানুষের।

ভাল করে তাকিয়ে জিতু বুঝতে পারে তালের গুঁড়ির কাছেই কিছু একটা ভাসছে। অর্দ্ধেক স্থলে, অর্দ্ধেক জলে।

এটাও দেহ টের পেতে দেরী হয় না। চমক দেওয়া রাশভারি দুর্গন্ধটাও যে ওটা থেকে আসছে অনুমান করে নেওয়া যায়।

কষা দাঁতনটা চিবোতে চিবোতে অনিচ্ছুক পদে ফিরে গিয়ে জিতু তার টর্চ্চটা নিয়ে আসে।

আলো ফেলে দেহের মুখটা দেখে বলে, রাম রাম!

খাণিকক্ষণ সে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঃ তোর শেষে এই গতি হল ছুঁড়ি?

জিতু নিজেকে শুনিয়ে বলে।

সবার চেনা সেই পাগলী মেয়েটা। পনের ষোল বছরের বেশী বয়স হবে না, হাতপাগুলি কাঠির মত সরু। কোথা থেকে এসেছিল কেউ জানে

না, বছর খানেক এই এলাকায় কুড়িয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়িয়ে যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে কাটিয়েছ। আজ এ পাড়ায় দেখা গেলে কাল ওপাড়ায় দেখা যেত।

কার ঘরের কাছে মরে পড়েছিল। রাতারাতি তুলে ডোবায় এনে ফেলে দিয়ে গিয়েছে দুর্গন্ধ এড়াবার জন্য।

কুকুর বিড়ালের মৃতদেহ যেমন দূরে ফেলে দেয়।

ডোবার জলটা আজ আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না।

তারপর তাড়াতাড়ি ভোর হয়। এমন ঘটনার পর শেষরাত্রি আর কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে।

আলো ফুটতে থাকে এমন উজ্জ্বল ও সুন্দর যেন স্বর্গ সত্যই ফুটো হয়ে জ্যোতি ঝরে পড়ছে পৃথিবীতে।

পাখীরা পর্য্যন্ত গান ধরে দেয়।

বস্তির মেয়ে পুরুষ ঘাটের ধারে এসে একবাক্যে বলে, কি সর্ব্বনাশ!

সরলা বলে, এটা কার কীর্ত্তি জানতে পেলে একচোট নিতাম।

সরলার মুখকে সবাই ভয় করে।

নালিশের কারণ ঘটলে সে যদি একবার লাগসই ভাবে মুখ খুলতে পারে কারো সাধ্য থাকে না তাকে হার মানায়—বৃটিশ ফৌজ এসেও বোধ হয় পারবে না।

পরেশ বলে, ঘোষদের পুকুর ছাড়া আজ আর গতি নেই।

ভাগ্যে এটা বর্ষাকাল! খানিকটা হেঁটে এগিয়ে যেতে হবে, অসুবিধার সীমা থাকবে না, তবু বর্ষাকাল বলেই ডোবাটার জল কামড়াবে না আশা করা যায়।

বুনো বলে, ওটা পড়ে থাকবে ওইখানে?

বুড়ী রাধা বলে, কদিন চলবে ঘোষেদের ডোবা দিয়ে?

পাঁচীর মা বলে, তা বললে কি হবে। শুদ্ধ করে নিতে হবে না এ পুকুরটা?

গোষ্ট বলে, বস্তির কেউ শত্রুতা করেছে নিশ্চয়।

প্রতিবাদ ওঠে সমস্বরে।

হারাণ বলে, ক্ষেপেছ তুমি? বস্তির লোক নিজের অসুবিধা ঘটাবে?

ডুমুর বলে, বস্তির ধারে কাছে ছুঁড়িটাকে দেখিনি দশ বারদিন।

ডুমুরের শাশুড়ী বলে, সোণার কারবার কর, বস্তিতে তুমি থেকো না বাবু। শত্রুই দেখবে বস্তিতে!

গোষ্ঠ নিজের দুই কাণ মলে।

বলে, বস্তির লোককে বলিনি গো, লোককে বলিনি। বাইরের শত্রুর কথা বলেছি।

: তাই বল!

জিতু বলে, তুমি বরং এই ডোবাটুকু মাঠটুকু পেরিয়ে ওপাশে গিয়ে একটা পাকা বাড়ী তোল গোষ্ঠদা, ওই বাড়ীগুলির সাথে!

: তোমার এপাশে বুঝি তোমাদের বস্তি আর তোমার ওপাশে বাবুদের শহর?

প্রায় সবার নজর ঘাটের দিকে। কোথা থেকে পরমেশ্বর কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল কেউ খেয়াল করে নি। যে কজন তাকে এসে দাঁড়াতে দেখেছিল তারাও সকলকে ডেকে ডুকে সচেতন করে দেবার প্রয়োজন বোধ করে নি। ঘরের মানুষ নয় বটে কিন্তু এ মানুষটা পরও নয়।

ডুমুরের আজকাল বনিবনা হয় না তার স্বামী অঘোরের সঙ্গে। তবু অঘোর যেন পিছন থেকে এসে ঘাটের দিকে গট গট করে এগিয়ে গেল

ঘরের মানুষের মত। তাতে যদি কারো আপত্তি না হয়ে থাকে পরমেশ্বর ধীরে সুস্থে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে কয়েকটা বাজে বুনো ফুল তুলে নিয়ে গন্ধ পাবার চেষ্টা করতে করতে এগিয়েছে বলেই তাকে পর মনে করা কেউ সম্ভব মনে করে নি।

ঃ ব্যাপার কি ?

জিতু বলে, দেখুন ব্যাপারটা একবার। সারা বস্তিতে দুটো কল, নামেই কল। মোট দশ বালতি জল হবে না !

ঃ তা বললে চলবে কেন। লোকের পেট ভরছে না—তোমরা বালতি ভরে না বলে নালিশ করবে !

জিতু একটু হাসে—তিক্ত হাসি।

ঘোমটা ফাঁক করে ডুমুর বলে, জল ছাড়াই চলবে বুঝি মোদের ? লোকে খেতে পায় না ছুতো করে মোদের জলটুকুও ফাঁকি যাবে।

জিতু বলে, আহা, উনিও তো সে কথাই বলছেন গো !

পরমেশ্বর বলে, মা টের পেয়ে গেছেন, এ ছেলে মায়ের সাথেও ইয়ার্কি দেয় !

মাখন বলে, এখন মোদের উপায় হবে কি ?

সুধীর বলে, বাবুদের বাড়ী বাড়ী দু'চার বালতি জল চেয়ে আনা যাক।

পরমেশ্বর বলে, বাবুদেরও জলে একেবারে থৈ থৈ !

সে ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়।

বলে, ভগবান মাঝে মাঝে নিজের বুদ্ধি ভ্রংশ করে মজা দেখেন। তোমরাও কি নিজেদের বুদ্ধি লোপ করে মজা দেখছ ?

ঃ কি করব তাই তো ভাবছি !

ঃ তাকেই বলে বুদ্ধি ভ্রংশ ! পুকুর ছাড়া গতি নেই, পুকুরটা নষ্ট

হচ্ছে, গন্ধে মানুষ পাগল হচ্ছে—তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছ! ক'জন কোমর বেঁধে পুকুর থেকে অন্ততঃ তুলে আনো পচা জিনিষটা? পরের ব্যবস্থা পরে হবে?

জিতু বলে, তা যা বলেছেন! অঘোর, মাখন—এসো দিকি ভাই হাত লাগাই।

পরমেশ্বর বলে, পুকুরে ওষুধ দিতে হবে। একজন ওষুধ আনবে যাও। ডুমুরের কাণে বাজছিল পরমেশ্বরের কথাটা—পচা জিনিষটা!

হঠাৎ সে নত হয়ে পরমেশ্বরকে প্রণাম করে!

সমীরের সমস্যা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রমে ক্রমে। মহেশ্বরের কাছে সে হাজার দশেক টাকা ধার চেয়েছিল ব্যবসা করার জন্য।

একবছরের মধ্যে সে তার পরিবারের আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনবে, শ্বশুরের ধারও শোধ করে দেবে।

তাকে টাকা দিতে ভরসা পায় নি মহেশ্বর। সাধন পড়া ছেড়ে ব্যবসা করার ইচ্ছা জানালে, সমীরের মতই পরিবারের আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীর পথে চেষ্টা করার ইচ্ছা জানালে তাকে প্রায় হাজার দশেক টাকা দিয়েই ব্যবসায়ে নামতে দেওয়া হয়েছিল সমীরের সঙ্গে।

সমীরের পরামর্শে বাপ ভাইকে প্রস্তাবটা দিয়েছিল সুরমা। সমীরকে টাকা ধার দেবার কি দরকার? মহেশ্বর নিজেই হাজার দশেক টাকা নিয়ে সমীরের সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসায়ে নেমে পড়ুক না।

সমীরকেও সে সামলে চলতে পারবে। মহেশ্বর নিজে না নেমে ভেবে চিন্তে সাধনকে নামিয়ে দিয়েছিল সমীরের ব্যবসায়ে।

ছ'মাসের মধ্যে ব্যবসা কোথায় গেছে, টাকা কোথায় গেছে কেউ

হদিস পায় না। সাধন বলে, আমি কি করব? কত রকম কথা যে বলে তার ঠিক ঠিকানা নেই। বলে এখানে সই কর ওখানে সই কর—শেষে দেখি আমাদের সব টাকা তো গেছেই, ফার্মের নামে তিন চার হাজার টাকা দেনা।

পরমেশ্বর বলে, তোর দুটো কান কেটে নেওয়া উচিত। সই করতে বলল আর ওমনি তুই সই করে দিলি? কেন সই করছিস একবার জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করলি না?

সাধন ক্লিষ্ট মুখে বলে, ব্যবসাটা ওই চালাচ্ছে কিনা, আমি ভাবলাম………

: তোরা ভেবে ভেবে ভাবুক হস বলেই ঠকিস। অত না ভেবে হাঁদার মত জিজ্ঞাসা করলেই হত কেন সই করব? হাঁদার মত বুঝবার চেষ্টা করলেই হত সই করার মানেটা?

তারপর অনেক ঘাটে জল খেয়েছে সমীর অল্প সময়ের মধ্যে। বিধুভূষণ এবং তার ঠিকানা পৃথক হয়ে গিয়েছে।

পরমেশ্বরের ভাল করে জানা ছিল না। আজ প্রথম জানতে পারে। অর্থাৎ তাকে জানতে হয়।

মহেশ্বর একখানা চিঠি দেয় তার হাতে। খামের চিঠি কিন্তু খুব সংক্ষিপ্ত।

সমীর লিখেছে তার বড়ই বিপদ, অবিলম্বে তার পাঁচশো টাকা চাই। আগের টাকার ব্যবস্থা এখনই করতে না পারলেও, এই টাকাটা সে দু'তিন মাসের মধ্যে শোধ দিয়ে দেবে।

বিশেষ ভণিতা নেই, দশটা অজুহাত খাড়া করবার চেষ্টা নেই, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সহজ স্পষ্ট দাবী জানিয়ে চিঠিখানা লেখা।

পরমেশ্বর একটু হাসে।

: তুমি আমায় সংসারে জড়িয়ে ছাড়বে।

: একটু না জড়ালে চলে না আর। একলা আমি—

: বোঝা কমালেই পার।

মহেশ্বরের মুখ দেখে পরমেশ্বর হাসিমুখেই আবার বলে, যাক্, যাক্। চিঠি পড়লেই বুঝতে পারা যায় বাবাজী বিগড়ে গেছেন। আগে অনেকবার নিয়েছে, না?

: অনেকবার। আরও অনেকের কাছে ধার করেছে।

: চিঠি লেখার ধরণ থেকে সেটা অনুমান করেছি। এ ব্যবসায়ে বেশ পাকা হয়ে না উঠলে অনেকবার টাকা নেওয়ার পর এ রকম চিঠি লেখার ক্ষমতা হয় না—এ কায়দা সাধারণ লোকের খেয়াল হবার কথা নয়।

মহেশ্বর নিঃশ্বাস ফেলে বলে, বিপদের কথাটা মিথ্যা?

: ঠিক মিথ্যা নয়। টাকার খুব দরকার—এটাই ওর আসল বিপদ —অন্য কোন বিপদ নেই। ভেবে চিন্তে বুদ্ধি খাটিয়ে চিঠিখানা লিখেছে। সাধারণ মানুষ সাধারণ ভাবে হঠাৎ বিপদে পড়লে বাধ্য হয়ে যদি লিখত—সে চিঠিই হত অন্য রকম। লজ্জা দুঃখ ফুটে বেরোত প্রত্যেক লাইনে—পড়লেই বোঝা যেত অনিচ্ছায় লিখেছে।

: কি করা যায়? এ ভাবে টাকা দিলে তো আরও পেয়ে বসবে?

: এক কাজ কর। পূজোয় ওদের আসতে লিখেছ—আজ কালের মধ্যে তুমি নিজেই চলে যাও। বলবে, বিপদের কথা পড়ে ছুটে গিয়েছ —কি বিপদ কিছুই লেখেনি, কাজেই খুব ভাবনা হয়েছিল। বিপদের কথা একটা বানিয়ে বলবে—এসব লোক মিথ্যা বলতে ওস্তাদ হয়। এবারের মত টাকটা দিও, ছেলে আর জামাই গোল্লায় গেলে খানিকটা ঝনঝাট

পোয়াতেই হবে। কিন্তু খুব ভাল করে তোমায় নিজের বিপদটা বুঝিয়ে দিয়ে এসো—ভবিষ্যতে আর যেন প্রত্যাশা না করে।

: সুরমাকে নিয়ে আসব তো?

: আনবে বৈকি।

রাত্রের গাড়ীতেই মহেশ্বর কাশী চলে যায়।

বাড়ীটা একটু থম থম করে সেদিনটা। পরদিন সে ভাব অনেকটা কেটে যায় বটে কিন্তু আরও গভীর হয়ে ঘনিয়ে আসে মেয়ে আর নাতি নাতনীকে সঙ্গে নিয়ে মহেশ্বর ফিরে এলে।

মহেশ্বরের মুখ শুকনো এবং গম্ভীর। সুরমার মুখ ম্লান এবং বিষণ্ণ।

সুরমার গালে কালশিটের মত একটা লম্বা দাগ।

: গালে কিসের দাগ দিদি?

পরমেশ্বর বলে, তা দিয়ে তোমার কি দরকার? ওর সখ হয়েছে কপালে টিপ না পরে গালে দাগ কেটেছে। বোকা মেয়ে কোথাকার।

প্রতিমা ম্লান মুখে বলে, সত্যি আমি বোকা!

পরমেশ্বর হেসে বলে, নিজেকে যে বোকা বলতে পারে সে কিন্তু সত্যি বোকা হয় না।

সুভাগিনী কাঁদ' কাঁদ' মুখে বলে, আমি আর মেয়েকে পাঠাব না।

সাধন নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

পরমেশ্বর বলে, আলাপ আলোচনার ঢের সময় পাওয়া যাবে—খিদের সময় খেতে পেলে কাজ দেয়।

জামাই গোল্লায় যাচ্ছে এটা শুধু শোনা কথাই ছিল এতদিন, এই কুৎসিত সত্যটার প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তির মত সুরমাকে সামনে উপস্থিত দেখে আর সমস্ত কথাই মন থেকে মুছে গিয়েছিল সকলের। অথচ

সোজাসুজি স্পষ্টভাবে জানবার সাহসও হচ্ছিল না কারও যে ব্যাপারটা ঠিক কতখানি গড়িয়েছে, কতদূর অধঃপাতে গিয়েছে সমীর।

আশা করার কি আছে আর কি নেই!

মহেশ্বর বাড়ীতে ঢুকে সোজা নিজের পূজার ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করায় ভয় আর দুর্ভাবনা সকলের আরও বেড়ে গিয়েছিল।

পরমেশ্বর তাদের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনে। তখনকার মত ভুলে যাবার চেষ্টা করা হয় সমীরের সমস্যা—এতক্ষণে নাতিকে কোলে তুলে নিয়ে সুভাগিনী আদর সুরু করে।

সমীরের কাহিনী শোনা যায় সুরমার কাছে।

আগের পূজায় যখন বাপের বাড়ী এসেছিল—বিধুভূষণের দাদার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে কয়েকমাস থাকার সময় মাঝে মাঝে হঠাৎ সমীরের সঙ্গে এসে নানা ছলে কিছু কিছু টাকা নিয়ে গিয়েছিল—তখনও সে শোনাতে পারত অনেক কিছুই। কিন্তু সেবার সে ঘুণাক্ষরে কিছু প্রকাশ করেনি—তার যে কপাল ভাঙ্গছে, সমীরের স্বভাব যে খারাপ হচ্ছে, এ কথা একেবারে চেপে গিয়েছিল।

এমন ভাব দেখিয়েছিল যেন সে খুব আনন্দেই আছে স্বামীর কাছে।

সমীরের চেহারাটা খারাপ দেখাচ্ছিল কিন্তু তার কথাবার্ত্তা চালচলন থেকে কেউ টেরও পায় নি ভিতরে তার ঘুণ ধরেছে, মানুষটাই সে যাচ্ছে বিগড়ে।

এবার সুরমা খুলেই বলে সব কথা।

পরমেশ্বর শুনতে চায়নি—নেহাৎ তাকে ডেকে এনে বস্‌তে বলায় না শুনে উপায় থাকে না।

চাকুরে ছেলে, ভাল ছেলে দেখে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুরমার। তখন কল্পনাও করা যায় নি সেই ছেলে

কোনদিন এভাবে অমানুষ হতে পারবে। সমীরের বিগড়ে যাবার কাহিনী শুনতে শুনতে সকলের মুখেই বেদনার ছাপ পড়ে, শুধু নির্ব্বিকার ভাব শুনে যায় পরমেশ্বর।

বছর দুই আগে চাকরী যায় সমীরের। তারপর থেকে সে খারাপ হতে আরম্ভ করে।

প্রথম অতটা বুঝতে পারে নি সুরমা। নানা কথা বলে দু'একখানা গয়না নিতে আরম্ভ করার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত টেরও পায়নি আসল ব্যাপারটা কি। এমন ভাবে বানিয়ে বানিয়ে নানা কথা বলে সমীর তাকে ভুলাত।

পরমেশ্বর বলে, এখন সব ধাপ্পা ধরতে পার ?

সুরমা বলে, না। সব বিষয়ে ভুলায় না কি না—দশটা সত্যি কথার সঙ্গে দুটো মিথ্যে কথা মিলিয়ে বলে।

: ওদের কায়দাই হল তাই।

চাকরীর জন্য বা অন্য কোন সদুপায়ে রোজগারের চেষ্টাও আর সমীর এখন করে না। তার মনটাই আর যায় না ওদিকে। এখন দিবারাত্রি তার শুধু চেষ্টা কোথা থেকে কার কাছে কোন ফিকিরে টাকা ধার করবে, কাকে কিভাবে ঠকাবে।

দুতিনজন বন্ধুকে সে নাকি এমনভাবে ঠকিয়েছে যে ইচ্ছা করলেই তারা ওকে জেলে দিতে পারত। নেহাৎ বন্ধু বলেই তারা রেহাই দিয়েছে।

পরমেশ্বর বলে, এটাও ওরা হিসাব কষে। কে কোনদিকে কতটা দুর্ব্বল হবে, কতটা ক্ষমা করবে, সব ঠিক করা থাকে।

সুরমা বলে, আমায় খুব মারধোর করে ভেবো না। এমনি ব্যবহার বরং ভালই করে। হঠাৎ একদিন হাতের ছড়িটা দিয়ে গালে মেরে বসেছিল—সেই একবার।

পরমেশ্বর বলে, সেটা ভাল, তবু একদিন মেরেছে।

মহেশ্বর বলে, কি বলছ তুমি?

পরমেশ্বর বলে, বলছি আমি ঠিক কথাই। ওর নষ্টামি হল চালাকি-বাজি—ধূর্তামি। সব সময় হিসেব করে চলে, মানুষকে ভুলিয়ে ঠকায়। ভাল ব্যবহার করলে যদি সুরমার গয়না মেলে ওর বাপের কাছে টাকা মেলে, মারধোর করার বদলে বরং হিসাব করে মিষ্টি ব্যবহার করবে। তার তো কোন দাম নেই, সে তো শুধু ছলনা। একদিন শুধু হিসেব টিসেব ভুলে ঝোঁকের মাথায় মেরে বসেছে—হৃদয়টা একেবারে অসাড় হয়ে যায় নি।

সুরমা বলে, আমি তো এভাবে ভাবি নি!

পরমেশ্বর বলে, এও একটা বিকার। এভাবে যারা বিগড়ে যায় তাদের সম্পর্কে সব চেয়ে ভাবনার কথা হল—সব রকম সেন্টিমেণ্ট ধীরে ধীরে ভোঁতা হয়ে যায়। লজ্জা সরম মান অপমান জ্ঞানও যেমন ঘুচে যায়, তেমনি মায়ামমতা রাগ অভিমান এসবও থাকে না। কিসে নিজের স্বার্থটুকু সিদ্ধ হবে—তাই শুধু ভাবে আর নির্ব্বিকার চিত্তে মতলব ভাঁজে।

ঃ শোধরাবে? না সে আশা নেই?

মহেশ্বর প্রশ্ন করে।

ঃ আশা আছে বৈকি! তবে শোধরানো খুব কঠিন।

ঃ তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে দাদা?

পরমেশ্বর হাসে।

ঃ তুমি যা ভাবছ তা হবার নয় মহেশ্বর!

অনুতাপের সঙ্গে সবিতা চুপি চুপি সুরমাকে বলে, আমি সব শুনে ফেলেছি সুরমাদি'। না শুনে পারলাম না, কাজটা ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। লাভের মধ্যে হল এই—মনটা খারাপ হয়ে গেল।

: শুনে ফেলেছ, উপায় কি।

: সংসারে কত রকম মানুষ থাকে। সুখে থাকতে কোন বাধা নেই, তবু ইচ্ছা করে অসুখী হবে!

: কিছু একটা ব্যাপার আছে নিশ্চয়।

: ঠিক। আমারও তাই মনে হয়।

মনমরা হয়ে থাকবার এত বড় কারণ থাকলেও বাড়ীতে পূজা থাকায় বাড়াবাড়িটা সম্ভব হয় না। নতুন জায়গায় নতুন ভাবে পূজার সব আয়োজন করা সহজ ব্যাপার নয়, বাড়ীর মেয়ে পুরুষ সকলকেই কোমর বাঁধতে হয়।

কেবল তাই নয়। পাড়ার কয়েকজন ছেলেমেয়েও আয়োজনে মেতে যায়।

ফলে বাড়তি হৈ চৈ হয় অনেক। সুরমা পর্যন্ত টের পায় না কোথা দিয়ে সময় কেটে যায়—রাত্রে শ্রান্ত দেহ নিয়ে বিছানায় কাত হলে কোথা থেকে ঘুম এসে অচেতন করে দেয়।

রেশন কার্ড করা হয়েছে সকলের। কিন্তু রেশন আনবার অন্য লোক থাকায় পরমেশ্বর আর দোকানে যায় না। যারা ধরে নিয়েছিল রেশন আনতে গিয়ে পাঁচজনের সঙ্গে হাসি-তামাসা করাটা তার একটা নেশা, আড্ডাবাজ মানুষের আড্ডা বাদ দেবার মত সপ্তাহে একদিন রেশনের দোকানে গিয়ে ফষ্টিনষ্টি বাদ গেলে তারই পেট ফুলে যাবে—দেখা যায়, তাদের ধারণা ভুল।

রেশনের দোকানে না গেলেও পরমেশ্বরের দিন দিব্যি কেটে যায়।

সকাল বেলা অন্য কাজ সেরে দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় বরং তাকে ডেকে নিতে হয় রেশনার্থীদের মধ্যে।

বরুণ রুটির কুপণ লিখতে লিখতে মুখ তুলে অনুযোগ দিয়ে বলে, আমাদের যে একেবারে ভুলে গেলেন ঈশ্বরবাবু!

আদিত্য বলে, আপনি না এলে রেশন নেওয়াটাই যেন জমে না মশায়।

রবীন্দ্র বলে, আসেন না কেন? অন্যেরা রেশন নিয়ে যাবে, আপনি সঙ্গে এসে শুধু দাঁড়াবেন, দুটো কথাবার্ত্তা কইবেন, বাস!

রেণুকা আজও উপস্থিত ছিল।

তার দিকে চেয়ে পরমেশ্বর সকলকে শুনিয়ে বলে, কি জানেন, ভয়ে আসি না। আমার বয়সটাই দেখছেন, আসলে মানুষটা আমি ভারি ছেলেমানুষ। উনি সেদিন যে রকম ধমকে দিলেন, তারপর আর সাহস হয় না আসতে!

সকলে হেসে ওঠে।

কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করে রেণুকাও সে হাসিতে যোগ দেয়।

বলে, আপনি সত্যি অদ্ভুত মানুষ!

পরমেশ্বর হাসিমুখে বলে, দেখুন, আপনাকেও হাসিয়ে ছেড়েছি। হাসতে হয়। ভগবান আছেন কি নেই জানি না, হাসতে জেনে হাসব না কেন?

বার

পূজার কয়েকদিন আগে সমীর আসে।

চেহারাটা খারাপ হয়েছে। দেখে মনে হয় কোন অসুখে ভুগছে। তাছাড়া তার বেশভূষা কথাবার্তা চালচলন দেখে সহজে বুঝবার উপায় নেই মানুষ হিসাবে সে কতখানি নেমে গেছে।

সহজে বুঝবার উপায় নেই, কিন্তু বোঝা যায়।

সাধারণ কথা ব্যবহার তার প্রায় আগের মতই আছে। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে টের পাওয়া যায় সর্ব্বদাই তার যেন কি একটা অস্বস্তি চাপবার চেষ্টা, সাধারণ স্বাভাবিক চিন্তা ভাবনার আড়ালে যেন তার একটা গোপন দুশ্চিন্তা সর্ব্বদা সক্রিয় থেকে চাপ দিচ্ছে।

পরমেশ্বর বলে, তুমি ইচ্ছে করলে আর চেষ্টা করলে বড় হতে পারতে—অনেক বড় হতে পারতে।

সমীর যেন চমকে ওঠে!

ঃ অনেকে বড় হতে চায়, হাজার চেষ্টা করেও পেরে ওঠে না। তাদের শুধু ইচ্ছাটাই থাকে—ইচ্ছা পূরণের জন্য যে গুণগুলি দরকার সেগুলি থাকে না। তোমার সবগুলি গুণ ছিল—বেশী পরিমাণে ছিল। চেষ্টা করলে তুমি যে কোথায় উঠতে পারতে তুমি নিজেও কল্পনা করতে পারবে না।

সকলে অবাক হয়ে শোনে।

সকলের সামনে সমীরের এমন অকুণ্ঠ প্রশংসা—যে গোল্লায় গেছে বলেই ধরে নিয়েছে সকলে নিন্দা করার বদলে তার গুণ-কীর্তন! তার মত অসাধরণ গুণের অধিকারী খুব কম লোকেই হয়।

সমীর যে অধঃপাতে গেছে সে জন্য কি এতটুকু আপশোষ নেই পরমেশ্বরের ?

সমীর বলে, বড় হতে কে না চায় বলুন ?

পরমেশ্বর হাসিমুখে মাথা নাড়ে, সবাই চায় না। অনেকে সুখীই হতে চায় না, বড় হতে চাইবে! সংসারে সকলে যাকে সুখ বলে. অনেকের পুরোমাত্রায় সেটা ভোগ করার সুযোগ থাকে। কিন্তু ওরকম সুখ তার ভাল লাগে না। সে ইচ্ছা করে চেষ্টা করে নানা রকম দুঃখ এনে কষ্ট পায়—কষ্ট ছাড়া জীবনটা তার মনে হয় একঘেয়ে, আলুনি। তুমি ইচ্ছা করলেই বড় হতে পার, কিন্তু তুমি ওই ক্ষমতাটা অন্যদিকে লাগাতে চাও। বড় হবার সাধ তোমার নেই!

সমীর খানিক চুপ করে থাকে।

: কোন দিক দিয়ে বড় হবার কথা বলছেন ?

: টাকা-পয়সা মান-সম্ভ্রম প্রভাব প্রতিপত্তি—যে ভাবে বড় হওয়াকে সংসারে বড় হওয়া বলে! বড় নেতা হবার ক্ষমতা তোমার আছে।

প্রতিমা ফোঁড়ণ কেটে বলে, এখনো আছে ?

: এখনো আছে। কিন্তু ওই যে বললাম, যেটা তোমার আসল গুণ সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমার দোষ।

: কি রকম ?

: তোমার একটু সমাজ-বিরোধী ঝোঁক আছে। ঠিক বিরোধী ঝোঁক নয়, সমাজ সম্পর্কে উদাসীনতা। যারা বড় হয় সমাজ সম্পর্কে তাদেরও এক ধরণের উদাসীনতা থাকে—সমাজের সাধারণ চলতি নিয়ম-নীতি সম্পর্কে, সংস্কার সম্পর্কে। তারা অন্য মানুষের চেয়ে অনায়াসে ওসবের উর্দ্ধে উঠতে পারে, ওসব তুচ্ছ করে দিতে পারে। কিন্তু সমাজ তাদের কাছে তুচ্ছ হয় না, সমাজের কাছে স্বীকৃতি পাওয়ার

জন্ম বিশেষ মাথাব্যথা নেই, বাইরের খোলসটা বাদ দিয়ে তুমি আসল ব্যাপারটা চট করে ধরতে পার—কিন্তু মুস্কিল হল, এটা সমাজের দিকে আকর্ষণ না বাড়িয়ে তোমার মধ্যে জন্মিয়েছে অবজ্ঞা। বাজে পচা একটা সমাজ, সমাজের জন্য তোমার টানও নেই, সমাজের কাছে সম্মান পাবার ইচ্ছাও নেই।

প্রতিমা বলে, বিশেষ গুণ থাকা দেখছি বিপদ!

পরমেশ্বর বলে, বিপদ বৈকি। বিশেষ গুণ থাকা মানেই তাকে আর সাধারণ মানুষ থাকতে দেবে না—বিশেষ দিকে টানবে, বিশেষ মানুষ করে তুলবে।

: এর চেয়ে জামাইবাবু সাদাসিদে সাধারণ মানুষ হলেই বরং ভাল ছিল।

পরমেশ্বর সমীরের গোমড়া মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলে, তা কি জোর করে বলা যায়? কতদিকে গতি নেয় মানুষের জীবন—কত কি ঘটতে পারে। আজ ইচ্ছা নেই—একদিন হয় তো বড় হবার জন্য সমীর পাগল হয়ে উঠবে!

পূজার খরচের জন্যই নগদ টাকাগুলি বাড়ীতে এনেছিল মহেশ্বর। ব্যাঙ্ক বন্ধ হবার আগের দিন।

সকালে দেখা যায়, টাকা নেই। চুরি গেছে।

বাড়ীর লোকেই যে চুরি করেছে তাতেও সন্দেহ করার কোন কারণ থাকে না।

মহেশ্বর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

চুরি নিয়ে হৈ-চৈ করার ভরসাও বাড়ীর লোকে পায় না। নীচু গলায় শুধু আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে যে এখন কি করা উচিত।

সমীর বাড়ীতেই ছিল। আজ ভোরে সে বেড়াতেও বাড়ীর বাইরে যায় নি।

পরমেশ্বর বলে, টাকা বাড়ীতেই আছে। তবে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

: কি রকম ?

: সন্দেহ প্রকাশ করলেই জামাই ভীষণ চটে যাবে। স্যুটকেশ বিছানা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। গায়ের জোর যদি খাটাতে পার তাহলেই টাকাটা পাওয়া সম্ভব।

: তাই কি পারে মানুষ ?

: আমিও তাই বলছি। সমীরও সেই হিসাব করেছে। শুধু সন্দেহ করে যদি চুপ করে থাকো, ভালই। যদি সন্দেহ প্রকাশ কর, বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার সুযোগ পাবে।

সাধন বলে, সার্চ্চ করব ?

সুভাগিনী বলে, না।

পরমেশ্বর বলে, বিপদ তো এইখানে। টাকা গেলে টাকা আসবে, জামাই গেলে আসবে না।

সুরমাকে প্রথমে কেউ জানায় নি।

বেলা একটু বাড়তে সকলের রকম-সকম দেখে তার মনে লাগে খটকা।

সে জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে ?

প্রতিমা বলে, বাবার টাকা চুরি গেছে।

শুনেই মুখ বিবর্ণ হয়ে যায় সুরমার। সে যেন নিজেই চুরি করেছে টাকাগুলি !

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে সে খানিকক্ষণ ভাবে। তারপর ঘরে যায়।

সমীর খাটে হেলান দিয়ে বসে কাগজ পড়ছিল।

: আজ যে তুমি বেরোলে না ?

: বেরোব। মামার সঙ্গে দেখা করতে যাব ভাবছি।

একান্ত নির্বিকার শান্ত ভাব সমীরের।

গায়ে তার গেঞ্জি, পরণে লুঙ্গি। অতগুলি টাকার নোট গায়ে কোথাও গুঁজে রাখা সম্ভব নয়।

সুরমা বলে, তোমার সুটকেশের চাবিটা দাও তো ?

: কেন ?

: একটু দরকার আছে।

: কি দরকার ?

: জামা কাপড়গুলি গুছিয়ে রাখব।

: গোছানোই আছে।

: চাবিটা দাওনা তুমি। চাবি দিতে আপত্তি করছ কেন ?

: তোমারি বা সকালবেলা হঠাৎ আমার সুটকেশ খুলবার কি দরকার পড়ল বল না ?

তবু সুরমা শান্তভাবে সুটকেশের চাবিটা আদায় করার চেষ্টা করে, কিন্তু চাবি সমীর দেয় না।

তখন গম্ভীর হয়ে সুরমা বলে, বাবার টাকাটা দিয়ে যাও।

: কিসের টাকা ?

: তুমি যে টাকা চুরি করেছ।

দেখা যায়, পরমেশ্বর যা বলেছিল অবিকল সেই ব্যাপার ঘটে ! সমীর প্রথমে তামাসা বলে উড়িয়ে দেয় সুরমার কথাটা, তারপর রেগে আগুন হয়ে ওঠে !

: এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমাদের ? আমায় চোর বল !

সঙ্গে সঙ্গে উঠে সে বিছানা বাঁধতে আরম্ভ করে।

সুরমা বলে, টাকাটা না দিয়ে যদি যাও, এ জন্মে আমি তোমার মুখ দেখব না। মনে করব আমি বিধবা হয়েছি।

সমীর কথা কয় না।

সুরমা বলে, বেশ, তুমি নাও নি টাকা। আমি ভুল বলছি। তুমি শুধু আমায় সুটকেশটা খুলে দেখতে দাও। টাকা যদি না পাই—যে শাস্তি দেবে মাথা পেতে নেব।

তবু সমীর কথা কয় না।

সুরমা বলে, খুলে না দেখালে সুটকেশ নিয়ে তোমাকে আমি যেতে দেব না।

বিছানার বাণ্ডিল বগলে নিয়ে সুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে সে যাবার জন্য প্রস্তুত হলে সুরমা দু'হাতে সুটকেশটা চেপে ধরে।

এত জোরে তাকে ধাক্কা দেয় সমীর যে সে ছিটকিয়ে মেঝেতে পড়ে যায়।

সমীর গট গট করে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

আঘাতের বেদনা ভুলে সুরমার বাইরে এসে চেঁচিয়ে বলে, সুটকেশ নিয়ে যেতে দিও না—কেড়ে নাও সুটকেশটা। দাঁড়িয়ে দেখছ কি তোমরা, কেড়ে নাও।

সমীর যেতে যেতে দাঁড়ায়। সুটকেশটা কেড়ে নেবার সময় ও সুযোগ দেবার জন্যই যেন খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে।

সাধন একপা এগোতেই সুভাগিনী তার হাত চেপে ধরে ধমক দিয়ে বলে, সাধন! মাথা খারাপ করিস না!

পুতুলের মত সকলে দাঁড়িয়ে থাকে।

: আমি তবে আসি।

বলে ধীরে ধীরে সমীর বেরিয়ে যায়।

পুজার জন্য টাকা দরকার।

অগত্যা সুভাগিনীর গয়না বাঁধা রেখে টাকা ধার করতে হয়।

ক্রমে ক্রমে টের পাওয়া যায়, কেবল শ্বশুরের কিছু টাকা বেদখল করেই সমীর বিদায় হয় নি, সে উদ্যোগী পুরুষ। যে কয়েকদিন এখানে সে ছিল তার মধ্যে অনেকের কাছ থেকে নানা ছুতায় যা পেরেছে আদায় করে নিয়ে গেছে, পাড়ার লোককে পর্য্যন্ত রেহাই দেয় নি।

আজ এ আসে কাল ও আসে। তাগিদ দিতে হওয়ার জন্য রীতিমত সঙ্কোচের সঙ্গে বলে, টাকাটা আজ দেবেন নাকি মহেশ্বর বাবু?

: কিসের টাকা?

: আপনার জামাই চেয়ে এনেছিল। বললে হঠাৎ দরকার পড়েছে, আপনার গোটা কুড়ি টাকা চাই, বিকেলেই দিয়ে দেবেন?

: ও, হ্যাঁ, একেবারেই ভুলে গেছিলাম। নানা হাঙ্গামায় মাথার ঠিক নেই।

লোকের কাছে মান বাঁচাতে আরও টাকা বার করে দিতে হয় মহেশ্বরকে।

পরমেশ্বর বলে, আগেই বলেচি ওর প্রতিভা আছে!

তের

বছর ঘুরে আবার পূজা এগিয়ে এল।

কিন্তু এবার আর পূজা হবে না মহেশ্বরের বাড়ীতে।

সাত পুরুষের পূজা এবার বন্ধ থাকবে।

বিশ্বাস করতে প্রাণ চায় না কারও। কিন্তু প্রাণ না চাইলেও বিশ্বাস না করে উপায় নেই। বাস্তব কাণে ধরে অনেক কিছুতে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ে।

মনে মনে সকলেই জানে এবার পূজা সত্যই হবে না। এ কারও ইচ্ছা অনিচ্ছা খেয়াল খুসীর কথা নয়। সামান্য ভাবে পূজা করায় সাধ্যও এবার মহেশ্বরের নেই।

পুঁজি শেষ হয়ে গেছে। সুভাগিনীর গয়নাও নেই।

সাধনের কোন উপার্জনের ব্যবস্থা হয় নি।

সাধনই ছিল শেষ আশা। তার যদি উপার্জন হয়, মা যদি নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেন। কিন্তু গত পূজার পর শীত গেল গ্রীষ্ম গেল বর্ষা যাই যাই আর শরৎ আসি আসি করছে ; আর কবে ঘটবে সেই অঘটন!

বহুদিক দিয়েই জীবনটা শূণ্য হয়ে গেছে। এ আবার ঘনিয়ে এল আরেক মহাশূণ্যতা। সময় যখন আসবে প্রাথমিক আয়োজন আর বিধিনিয়ম পালনের ব্যবস্থা আরম্ভ করার, কাজের চাপ ও বাড়ীর সকলের ব্যস্ততা দিন দিন বেড়ে যাবে, যখন সময় হবে প্রতিমা আনবার এবং চারিদিক থেকে শব্দ শোনা যাবে ঢাকে কাঠি পড়ার, এ বাড়ীতে মহেশ্বর পোড়া প্রাণ ধরে থাকবে কি করে?

দিন দিন বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে আরও সুনিবিড় বেদনার ছায়া নেমে আসে মহেশ্বরের। তার কথা কমে যায়। সে যেন ঝিমিয়ে পড়তে থাকে।

ভাগ্য তার মন্দ সব দিক দিয়েই। এবার চরমে উঠল দুর্ভাগ্য।

পরমেশ্বর বলে, দুর্ভাগ্য নয়, পরীক্ষা। আর কতকাল একভাবে টানবে? এবার পালা বদলের পালা!

মহেশ্বর বলে, তুমি কোন ব্যবস্থা করতে পার না?

: ব্যবস্থা বলে দিতে পারি। চাঁদা তুলে পূজা কর।

মহেশ্বর চুপ করে থাকে।

সাতপুরুষের একটানা পুজো!

সুভাগিনী মেঝেতে কপাল কোটে।

আগেকার তুলনায় একরকম কোন সমারোহই হয় নি গত দু'বছরের পূজায়। তবু সে দিনগুলির কথা স্মরণ করলে, দিনগুলি এবার আর ঘুরে আসবে না ভাবলে এখন থেকেই বেঁচে থাকা যেন নিরর্থক হয়ে গেছে মনে হয়।

এদিক ওদিক কাছাকাছি আরও পূজা হয়। কিন্তু দুটি বদ্ধ গলি ও ফাঁকা জমিটুকু ঘিরে প্রায় ত্রিশখানা ছোট বড় বাড়ী আর গা-ঘেঁষা ছোট উদ্বাস্তু কলোনিটা নিয়ে তাদের এই ছোট পাড়াটি ধরলে, এখানে শুধু তারই বাড়ীতে পূজা হয়েছে গত দু'বছর।

তার ছোট উঠানে সারাদিন ভিড় করে থেকেছে পাড়ার ছেলে মেয়েরা, বুড়োরা পূজোমণ্ডপের পাশে বারান্দায় আসর জমিয়েছে, ছেলেমেয়েদের সমবয়সী বন্ধুরা হৈ চৈ করে খেটেছে, মেয়ে বৌ গিন্নীরা সকাল সন্ধ্যায় এসে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আরতি দেখেছে।

এ বছর আলো জ্বলবে না, বাজনা বাজবে না, কেউ আসবে না তার

বাড়ীতে। ছোট পাড়াটুকুও তার বাড়ীর মতই ডুবে থাকবে পূজাহীন নিরানন্দ অন্ধকারে।

সুরমা বলে, মা বাবা মরবে নাকি দাদা? কাল মাঝ রাতে উঠে দেখি, দু'জনে চুপচাপ জেগে বসে আছে। এত সর্ব্বনাশ সইল, পূজোটা বন্ধ করা সইছে না?

তার কাঁদ কাঁদ মুখের দিকে চেয়ে সাধন বলে, আস্তে আস্তে সয়ে যাবে। প্রথমবার কিনা, খুব কষ্ট হচ্ছে।

খবর শুনে তেতলাবাড়ীর সদাশিব উল্লাসের সঙ্গে বলে, পূজো করবে না এবার? আমি আগেই জানি। আর্সোলার উড়বার সখ। উড়ে এসে জুড়ে বসেছিস, বেশ করেছিস, এত তোর লোক দেখানো বাহাদুরী কেন।

অনুগত দু'চারজন চুপ করে থাকে। অন্যেরা তার মন্তব্যে সায় দিতে পারে না।

পঙ্কজ বলে; এটা কি বলছেন সদাশিববাবু? উনি কি বাহাদুরী দেখাতে পূজা করেন? এটা ওনার ঠাকুর্দ্দার আমলের পূজো।

পঙ্কজকে সদাশিব অত্যন্ত অপছন্দ করে। সে সাধনের বন্ধু, মহেশ্বরের পরিবারটির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আছে, শুধু এজন্য নয়। ছোকরা এই বয়সে পাড়ার মধ্যে খানিকটা নেতাগোছের হয়ে উঠেছে বলেও নয়। তাকে একেবারে খাতির করে না বলে, পাড়ায় প্রতিপত্তি খাটাবার মস্ত বাধা হয়ে উঠেছে বলে।

মুখ বাঁকিয়ে সদাশিব বলে, ভিখিরির আবার ঠাকুর্দ্দার আমল।

প্রৌঢ় রমেশ বলে, নিজের দোষে কি ভদ্রলোক ভিখরি হয়েছেন? তবু দুটো বছর চালিয়ে এসেছেন, পাড়ায় একটা পূজো হয়েছে।

দীনেশ বলে, লোকটির ব্যবহার ভাল। ছেলেরা কি সহজ গোলমালটা করেছে সারাদিন, কখনো বিরক্ত হন নি। সকলকে ডাকা, খাতির করে বসানো, এসব ত্রুটি হয় নি।

মহেশ্বরের প্রশংসায় সদাশিবের গা জ্বালা করে, কিন্তু উপায় কি। দেখা যায় পাড়ার অধিকাংশ লোকেরই এই অভিমত। মহেশ্বরের বাড়ী পূজা হবে না শুনে সকলেই কমবেশী দুঃখিত হয়েছে।

বাড়ীর কাছে একটা পূজা হলে সর্ব্বদাই বিশেষ একটা রং লাগে মনে, পূজার দিনকটিকে যেন চব্বিশঘণ্টা ধরে আরও প্রত্যক্ষ ভাবে ঘনিষ্ট ভাবে পাওয়া যায়। একজনের বাড়ী পূজা হলে প্রতিবেশীরা হয় অংশীদার, ঘরোয়া শব্দ গন্ধ দৃশ্যের মত পূজাকে অনেকটা নিজের করে পাওয়া যায়।

পাড়ার এই সার্বজনীন খেদটা অনুভব করে পাড়ায় সার্বজনীন পূজা করার কথাটা গিরীনের মনে আসে।

ছোট পাড়া, ব্যবসায়ী সদাশিব আর পেন্সনভোগী বিনোদবিহারী ছাড়া সকলেই হয় মোটামুটি অবস্থার কিম্বা গরীব মানুষ, চাঁদা তুলে দুর্গাপূজা করা কঠিন ব্যাপার।

কিন্তু সকলের যদি ইচ্ছা হয় উৎসাহ জাগে, অসম্ভব হবে না।

যোয়ানেরা কথা পাড়া মাত্র উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বড়দের সঙ্গে কথা বলেও দেখা যায় যে পূজা হোক এটাই সকলের ইচ্ছা—যদি সম্ভব হয়!

সদাশিবের কাছে কথাটা পাড়তেই সে সায় দিয়ে বলে, ভালই তো। পাড়ায় একটা পূজা হবে, এ তো আনন্দের কথা। চাঁদায় যদি না কুলোয়, বেশী যা লাগবে আমি দেব।

তাকে এই উদারতার জের টানবার সুযোগ না দিয়ে গিরীন বলে, আমরা ভাবছিলাম মহেশ্বরবাবুকে প্রেসিডেন্ট করা হবে। পাড়ার সবাই

ত্যায় দেবে মনে হয়। উনি দু'বছর পুজো করেছেন, এবার নেহাৎ দায়ে ঠেকে পারছেন না—

রমেশ বলে, পাড়ার লোকের মিটিংএ অবশ্য এসব স্থির হবে। কথাটা আমরা ভাবছিলাম আর কি।

দেখা যায়, সদাশিবের উৎসাহ নিভে গেছে। সে এবার উদাসভাবে বলে, বেশ তো মিটিং ডাকা হোক, দেখা যাক কতদূর কি হয়।

তার মানেই তাই। সদাশিবকে প্রেসিডেন্ট করলে সে এগিয়ে আসবে, নিজে দায়িত্ব নিয়ে পূজা সম্পন্ন করবে। নইলে তাকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাকে প্রেসিডেন্ট করার মানেও সবাই জানে। সে গ্রাস করবে সার্বজনীন পূজাটা, নিজের একটা কীর্ত্তিতে পরিণত করবে। যে সব বৃহৎ ব্যক্তিদের কল্যাণে তার চোরা-কারবার চলে, নিজের নামে ফলাও করে নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে তার প্রভাব প্রতিপত্তির একটা প্রমাণ হিসাবে।

বাড়ীতে হাজার ঘটা করে পূজা করলেও এটা হয় না। পয়সা আছে, পূজা করছে—তার মধ্যে প্রমাণ নেই পাড়ার লোকে তাকে কত খাতির করে!

শনিবার সন্ধ্যায় আলোচনা ও পরামর্শের জন্য পাড়ার লোকের একটা বৈঠক ডাকা হবে স্থির করে সাধনকে পঙ্কজ বলে, তোমাদের বাড়ীতে হোক না?

সাধন বলে, হোক।

সাধন সায় দেওয়ায় মহেশ্বরের মত নেওয়ার কথাটা মনে পড়ে না পঙ্কজের।

সকালে ভবানী অমল আর সুরেশকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী বাড়ী

খবর দিয়ে কাজে চলে যায়, বিকালে বাড়ী ফেরামাত্র ডাক আসে মহেশ্বরের কাছে।

প্রতিমা তাকে ডাকতে এসে বলে, বাবাকে এ পূজোর ব্যাপারে জড়ানো চলবে না।

পঙ্কজ বলে, সে কি? আমি তো বিশেষ ভাবে ওঁকেই জড়াতে চাইছিলাম!

ঃ বাবার মন ভেঙ্গে গেছে।

মহেশ্বরকে দেখেই সেটা টের পাওয়া যায়। শুধু মন নয়, শরীরটাও তার ভাঙ্গবার দিকে চলেছে।

মহেশ্বর বলে, পোড়া ঘায়ে দাগা দিচ্ছ কেন বাবা? তোমরা পূজো করবে, অন্য কোথাও বৈঠক ডেকে পরামর্শ কর।

পঙ্কজ বলে, আপনাকেও তো আমরা চাই। আমরা ভাবছিলাম, আপনাকে প্রেসিডেন্ট করব।

সকরুণ হতাশার হাসি ফোটে মহেশ্বরের মুখে।

ঃ বাপ ঠাকুর্দ্দার পূজো বন্ধ করলাম, তাঁরা আমায় স্বর্গ থেকে অভিশাপ দিচ্ছেন। এমন কুলাঙ্গার আমি, কোন মুখে তোমাদের পূজোয় প্রেসিডেন্ট হব? না বাবা, আমায় রেহাই দাও। আমার জ্বালা বাড়িও না।

সাধনের সঙ্গে কথা কয়ে পঙ্কজ টেরও পায় নি পূর্ব্বপুরুষের দুর্গা পূজা বন্ধ করে দেবার জ্বালাটা সত্যিই কত তীব্র হতে পারে। সাধন আর বুড়ো মহেশ্বরের পার্থক্যটা এখন সে বুঝতে পারে। সব গেছে মহেশ্বরের কিন্তু তবু সে ভাবে নি সব শেষ হয়েছে। বছরকার পূজার পালা শেষ হওয়ার সঙ্গে তাঁর কাছে বেঁচে থাকার মানেটাই শুধু শেষ হয়ে যায় নি, জীবনটা হয়ে গেছে ব্যর্থ, অভিশপ্ত।

মহেশ্বর আবার বলে, পুজোর কদিন আমি ঘর থেকেই বেরোব না। দরজা জানালা বন্ধ করে শুধু মাকে ডাকব স্থির করেছি।

সুভাগিনী কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। পঙ্কজ চেয়ে ছাখে, তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

সাধন বলে, তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ বাবা।

পঙ্কজ বলে, তুই থাম্।

সাধনের হাত ধরে টেনে নিয়ে সে বেরিয়ে যায়। কিছু বলার নেই, কিছু করার আছে কিনা সন্দেহ। নিজের জীবন যেমন মহেশ্বরের কাছে আমার জীবন, বাড়ীর পূজাও তার কাছে তেমনি আমার পূজা। ঠাকুরদাদা তার বাপকে জন্ম দিয়েছিল আর দিয়েছিল এই পূজার দায়িত্ব। শিশুকাল থেকে বাপের কাছে এই জন্মগত দায়িত্বের মানে শিখেছে মর্মে মর্মে, বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত নিজে পালন করে এসেছে দায়িত্ব।

নিজের বাড়ীর নিজের এই পূজা ছাড়া আর সব পূজা তার কাছে মিছে।

মুখের কথায় বুঝিয়ে কি আজ তার চেতনা জন্মানো যায় যে তার এই হতাশা কাতরতার পিছনে আছে তারই হৃদয় মনের ক্ষুদ্র সংস্কার আর সঙ্কীর্ণতা?

নিজের পয়সায় নিজের বাড়ীতে পূজা করতে পারবে না বলে মানুষের দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত মিথ্যা হয়ে যাওয়ার আর কোন মানে হয় না?

কোথায় ছিলাম আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের চোখের সামনে কিভাবে বদল হয়ে যাচ্ছে জীবন আর জগত। পরিবর্তিত জগতের এই বাস্তবতা যদি ঘরের পূজার শোক ভুলিয়ে দশের পূজায় অংশ নেবার চেতনা না জাগাতে পেরে থাকে, কিসে তার চেতনা হবে?

সকালে হঠাৎ প্রতিমা তার কাছে আসে।

: একটা কাজ করা যায় না? আপনাদের পূজাটা আমাদের বাড়ীতে করলে হয় না?

উৎকণ্ঠায় কালো হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ। পূজা বন্ধ হওয়ার জন্য তার যত না দুঃখ হয়েছে, বাপের চিন্তাতেই সে হয়ে পড়েছে কাহিল। এ ধাক্কা সামলে উঠে মহেশ্বর কি বাঁচবে?

কিন্তু মিথ্যা আশা জাগিয়ে লাভ নেই। পঙ্কজকে বলতে হয় যে সার্বজনীন পূজা কারো বাড়ীতে করা যায় না। দশজনে সেটা মানবে কেন?

প্রতিমা বলে, দশজনকে যদি বুঝিয়ে বলা যায়? সবাই তারা পাড়ার লোক, বাবাকে ভালও বাসেন অনেকে। পূজো তো এক যাগায় আপনাদের করতেই হবে—আমরা বাড়ীটা আপনাদের ছেড়ে দেব। মাঠে প্যাণ্ডেল তোলার খরচাটা আপনাদের বেঁচে যাবে।

কথাটা মনে লাগে পঙ্কজের। মহেশ্বরের খাতিরে যদিই বা না হয়, অন্ততঃ প্যাণ্ডেল বাঁধার খরচ বাঁচাবার যুক্তিতে অনেকে রাজী হবে। খরচটাই তাদের পাড়ার পূজার আসল সমস্যা।

কিন্তু মহেশ্বর রাজী হবে কি?

প্রতিমার সঙ্গে পঙ্কজ তাদের বাড়ী যায়। ফাঁকা জমিটুকু পেরোবার সময় লক্ষ্য করে প্রতিমার পরণের শাড়ীটা কয়েক জাগায় সেলাই করা হলেও ছেঁড়া রয়ে গেছে। সাবধানে গায়ে জড়িয়ে রেখেছে শাড়ীটা। হাঁটতে পর্য্যন্ত অসুবিধা হয়।

তার কথা শুনে মহেশ্বরের শীর্ণ মুখে হাসি ফোটে।

: তোমরা ক্ষেপেছ নাকি? দশজনের পূজো কখনো কারো বাড়ীতে হয়? না, হওয়াতে পারলেও সেটা করতে আছে?

বোঝা যায়, নিজের বাড়ীর পূজা বন্ধের শোকে মানুষটার বাস্তব বুদ্ধি লোপ পায় নি।

মহেশ্বর একটা নিশ্বাস ফেলে।—তুমি বুদ্ধিমান। কিন্তু তুমি ব্যাপারটা বুঝছো না বাবা। ঘা হয়েছে আমার প্রাণে, মলম লাগিয়ে কি এ ঘা তুমি সারাতে পারবে?

পঙ্কজদের বাড়ীতে শনিবারের বৈঠকে দশ বার জনের বেশী লোক হয় না। কিন্তু সেটা দুর্লক্ষণ নয়। অনেকে আসে নি বলে তার মানে এই নয় যে তারা পূজা হোক চায় না।

পূজা চায় সকলেই। তবে এই সব বৈঠকে যোগ দিয়ে চাঁদা দেবার বেশী দায়িত্ব কয়েকজন নিতে চায় না, বৈঠকের আজেবাজে কথা কাটাকাটি আর নীরস আলোচনায় ধৈর্য্যও অনেকের থাকে না,—তার চেয়ে শনিবারের সন্ধ্যাটা সিনেমা দেখে এলে কাজ দেবে। কয়েকজনের অন্য জরুরী কাজ আছে। এরা কেউ কেউ পরের বৈঠকে আসবে। আসুক বা না আসুক, বৈঠকের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে।

এতটুকু পাড়ায় প্রথম দিনের বৈঠকে ডজনখানেক ওজনদার লোক এসেছে, সেটাই যথেষ্টরও বেশী।

সদাশিব আসে নি। সে অন্য কাজে গেছে।

আলোচনার গোড়ার দিকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই কথাটা যে মহেশ্বরের বাড়ী পূজা হবে না বলেই পাড়ায় একটা পূজা করার প্রয়োজন সকলে উপলব্ধি করছে। মহেশ্বরের জন্য সকলের যে সহানুভূতি প্রকাশ পায়, সাধনকে তা অভিভূত করে দেয়। জানালার ওপাশে প্রতিমার চোখে জল এসে পড়ে। মহেশ্বর উপস্থিত থাকলে কৃতার্থ হয়ে যেত।

মাঝবয়সী জিতেন সম্প্রতি বেকার হয়েছে। আজ সকালেই সদাশিবের সঙ্গে তাকে অনেক্ষণ কথা বলতে দেখা গিয়েছিল। আলোচনার প্রথম দিকে সে চুপচাপ বসে শুধু উসখুস্ করে।

তারপর হঠাৎ একসময় বলে, আমি বলি কি, মহেশ্বরবাবুর পূজোটা হবে না বলেই তো আমরা একটা পুজো করার কথা ভাবছি। তা' সেটা বোধ হয় দরকার হবে না। সদাশিববাবু এবছর পুজো করবেন ঠিক করেছেন।

সকলে যেন আকাশ থেকে পড়ে।

আর কেউ তো কিছুই শোনে নি এবিষয়ে!

সদাশিবের মনের কথা কেবল একটি লোকের একলা জানা সত্যই খাপছাড়া ব্যাপার। বেশ বোঝা যায়, জিতেন বড়ই অস্বস্তি বোধ করছে। সদাশিবের মত লোকের অনুগত হবার আর্ট এখনও সে ভাল আরম্ভ করতে পারে নি। হঠাৎ বেপরোয়ার মত সে সত্য আর সরলতার আশ্রয় নেয়।

বলে, কথাটা ভাবছিলেন কদিন ধরে, এখনো প্রকাশ করেন নি। সকালে আমায় বললেন প্রায় মনস্থির করে ফেলেছেন। কথাটা এইভাবে আপনাদের জানাতে বলেছেন।

দীনেশ হেসে বলে, দরকার হলে যাতে পিছোতেও পারেন!

পাড়ায় নতুন এসেছে বিনোদবিহারী। ন'দশ বছর পেন্সন ভোগ করছে। সায়েবদের প্রিয় হাকিম ছিল। চোর-ডাকাত গুণ্ডা বদমাসদের কঠোর শাস্তি দিতে দিতে কি যে তার অভ্যাস জন্মে গিয়েছিল, স্বাধীনতা চাই বলার জন্য স্কুল কলেজের ছেলেদের ধরে এনে হাজির করা হলে তাদের চাঁদ মুখ দেখে যত পারে কড়া সাজা দিয়ে বসত!

বিনোদবিহারী গিরীন ভবানীদের চাঁদ মুখের দিকে তাকায়। হাকিমী কড়া সুরে বলে, সদাশিববাবু পূজা করবেন তো ছেলেদের কি এল গেল?

ছেলেরা উৎসাহ করে লেগেছে পাড়ায় একটা পূজো করবে, সেটা বাদ যাবে কেন? তোমরা ঘাবড়ে যেওনা হে, আমি তোমাদের পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দেব।

পঙ্কজ চুপি চুপি সাধনকে বলে, সেরেছে। সদাশিব আড়াল থেকে কোপ মারছে, ইনি সামনা-সামনি ঘাড় ভাঙ্গতে চান! আজকের বৈঠক ভেঙ্গে দেওয়া যাক।

সে তাড়াতাড়ি সকলকে বলে, অনেকে আসেন নি, আজ কোন শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। তবে উপস্থিত সকলের মত আছে পূজা হোক, এটা ঠিক রইল। কাল রবিবার সবাই আসবেন আপনারা, কালকেই সব কথা আলোচনা করা যাবে।

বিনোদবিহারী আবার ক্ষণকাল পঙ্কজের চাঁদ মুখের দিকে চেয়ে রায় দেয়, ঠিক কথা। তুমি ঠিক বলেছ। কাল আমার বাড়ীতেও সকলকে ডাকতে পার।

এই সংকটজনক পরিস্থিতি নিয়ে ছেলেরা অনেক রাত পর্য্যন্ত আলোচনা করে। তিন বছর আগে পাড়ায় বারোয়ারী পূজো নিয়ে ঠিক এই কারণে ছেলেদের উৎসাহ ভেস্তে গিয়েছিল। কারণটা এবার আরও স্পষ্ট হয়েছে। সদাশিব কিম্বা বিনোদবিহারীকে পাণ্ডা হতে দিলে অনায়াসে পূজা হয়—ছেলেদের হৈ চৈ মাতামাতি বাদ দিয়ে বড়দের গম্ভীর আনুষ্ঠানিক পূজা। ছেলেরা শুধু হুকুম পালন করে যাবে।

কারণ, শুধু এই একটিমাত্র সর্তে সদাশিব বা বিনোদবিহারী পূজা সম্পন্ন করাবার দায়িত্ব নেবে। সব বিষয়ে কর্তৃত্ব চাই। নইলে দু'পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়ে সরে দাঁড়াবে!

বিনোদবিহারী পঞ্চাশ টাকা দেবে বলেছে? কারো সাধ্য হবে না

সে টাকা আদায় করে। কৌশল খুব সোজা। কোন একটা বিষয়ে মতের অমিল হবে। রাগ দেখিয়ে বলবে, চ্যাংড়া ছোঁড়াদের এসব ব্যাপারে আমি নেই।

বলে চাঁদাও দেবে না!

পাড়ার যোয়ান আর বুড়োদের বিরোধ এটা নয়। মুস্কিল হল এই যে পাড়াটা ছোট, যোয়ানদের দাবিয়ে রাখতে চাইবে না এমন বয়স্ক মানুষই পাড়ায় বেশী কি ন্তু তাদের একজনেরও সাধ্য বা সাহস নেই যে সব দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ভালয় ভালয় একবার পূজা হয়ে গেলে পরের বার অনেকে সাহস করে এগিয়ে আসবে। প্রথম বছর বলেই এবার মুস্কিল। কি হবে না হবে জানা নেই। দায়িত্ব নিয়ে হয় তো বিপদে পড়তে হবে। অথচ বয়স্ক মানুষ যে এগিয়ে আসবে দশজনের কাছে সেই হবে দায়ী।

অমল কলেজে পড়ে। কে বলে, বড়দের দরকার নেই। আমরাই এক একজন এক একটা দায়িত্ব নেব।

পঙ্কজ বলে, বড়দের বাদ দিয়ে পাড়ার পুজো হয় না।

নিখিল ব্যাঙ্কে কাজ করে। সে বলে, পুজো যখন হচ্ছেই না, বিনোদ বাবুকে প্রেসিডেন্ট করলে দোষ কি?

সকলে সমস্বরে প্রতিবাদ জানায়।—না না, অমন পূজায় আমরা নেই!

সকলে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকে। রাত দশটা বেজে গিয়েছে। সকালে বৈঠক বসবে এবং পণ্ড হয়ে যাবে। পঙ্কজের গা জ্বালা করে। মনের মধ্যে একটা মরিয়া ভাব জাগে।

সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চলো সবাই মিলে মহেশ্বরবাবুর কাছে যাই। শেষ চেষ্টা করে দেখি।

পাড়ার কম বয়সী উৎসাহী বাছা বাছা কয়েকজনকে তারা বাড়ী থেকে ডেকে বার করে সঙ্গে নেয়।

বস্তি থেকে ডেকে আনে জিতেন আর অঘোরকে।

মহেশ্বর শুয়ে পড়েছিল। এত রাত্রে পাড়ায় এতগুলো লোক তার বাড়ীতে হানা দিয়েছে শুনেই সে দুর্গা নাম জপ করতে সুরু করে। ভয়ে নয়, বিরক্তি আর বেদনায়। সে তো স্থির করেই ফেলেছে যে মহামায়াকে এবার যেমন আনা যাবে না তেমনি জীবনের মায়াতেও আর সে জড়িয়ে পড়বে না। পাড়ার এই ছেলেমানুষগুলি কিছু বুঝবেও না, তাকে রেহাইও দেবে না কিছুতেই।

মহেশ্বরের রাগ হয়। প্রচণ্ড রাগ হয়। তিন পুরুষ ধরে তাদের মহাসমারোহে দুর্গোৎসব করে আসা বন্ধ করে দেবার মত গুরুতর ব্যাপারটা এরা একটু দরদ দেখিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়, একটা ছেলেখেলার পূজায় ব্যবস্থা করে দিয়ে তাকে ভুলাতে চায়। খেলনা দিয়ে ছেলে ভুলানোর মত।

কিন্তু রাগ হলে কি হবে। দুর্গা পূজা করে বুড়ো হয়েছে, বাড়ীতে মানুষ এলে সানন্দ অভ্যর্থনা জানিয়ে বসানোটা দাঁড়িয়ে গেছে স্বভাব। বিয়ের রাতে মেয়ের বাপ হয় বিনয়ে কাতর, পূজা বাড়ীর কর্তা পূজার কদিন বিনয়ে পায় উল্লাস। দশজনে পূজা উপলক্ষে বাড়ীতে এসেই তো তাকে ধন্য করে।

একটু গম্ভীর ভাবে বিষণ্ণ ভাবে হলেও সকলকে ডেকে বসাতে হয়।

ঃ কি ব্যাপার?

পঙ্কজ বলে, আমরা একটা নালিশ নিয়ে এসছি। আপনার জন্য আমাদের পূজো পণ্ড হয়ে যাচ্ছে।

মহেশ্বর সচকিত হয়ে বলে, কি রকম? আমি তো কিছুই করিনি বাবা তোমাদের!

: কিছু করেন নি, কিছু করবেন না বলেই আমাদের পুজো হবে না। আপনি এগিয়ে এলে পুজো হবে, না এলে হবে না।

মহেশ্বর নীরবে চেয়ে থাকে।

পঙ্কজ বলে, আমাদের হিসাব না বোঝেন, আপনার নিজের হিসাব বুঝুন। মা এবার আপনার পুজো পাচ্ছেন না। আমরা পুজো করব, আপনি এগিয়ে না এলে এ পুজোও মা পাবেন না। মাকে দু'টি পুজো থেকে বঞ্চিত করার দায়িক হবেন আপনি।

মহেশ্বর প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, একথা আগে বলনি কেন? কি করতে হবে আমায়?

সকালে বৈঠক বসে রমেশের বাড়ীতে। পাড়ার ছেলেবুড়ো প্রায় সকলেই উপস্থিত হয়। ছেলেরা মনে জোর পেয়েছে, তাদের উৎসাহ যেন শতগুণ বেড়ে গেছে রাতারাতি! সঙ্কীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থের কবল-মুক্ত সার্বজনীন দুর্গোৎসব সম্ভব হবে তাদের পাড়ায়।

সদাশিব আর বিনোদবিহারী প্রথমে আসেনি। তিনবার তাদের ডাকতে লোক পাঠিয়ে অগত্যা সুরু করে দিতে হয়েছে বৈঠকের কাজ। তারপর একে একে দু'জনেই এসেছে।

না এসে উপায় কি? সমস্ত পাড়াটাকে বর্জন করে তো পাড়ায় থাকা যায় না!

সদাশিব হাজির হতেই একজন প্রশ্ন করে, পাড়াতে এবার তাহলে দুটো পুজো হচ্ছে সদাশিববাবু?

সদাশিব বলে, নাঃ, আমি আর করছি না। পাড়াতেই যখন হচ্ছে, আর দরকার কি?

বিষণ্ণ ম্লান মুখে মহেশ্বর এসে বৈঠকে বসেছিল। পূজা নিয়ে এলোমেলো কথায় মুখর হয়ে উঠেছে বৈঠক, কিন্তু তার নির্জীব বিষণ্ণ ভাব ঘোচে না। যার নিজের ছেলে মারা গেছে তাকে যেন টেনে আনা হয়েছে অন্যের ছেলের বিয়ের উৎসবে। মা ফাঁদে ফেলেছেন, উপায় কি। মরার উপর খাঁড়ার ঘা দেবার সাধ হয়েছে মার। বৈঠকের কাজ আরম্ভ হয়, তাকে প্রেসিডেন্ট করে পূজা কমিটি গঠিত হয়, প্রত্যেকের নাম ধরে চাঁদার অঙ্ক ফেলা হয়, উদ্বাস্তু কলোনির প্রতিনিধি কলোনি থেকে চাঁদা তুলবার ভার নেয়, একজন পূজা-মণ্ডপের জন্য ত্রিপল আর বাঁশ দেবে জানায়, নানা প্রশ্ন ওঠে, তর্ক বাঁধে—একেবারে জমে যায় বৈঠক। সদাশিব আর বিনোদবিহারী পর্যন্ত কখন আলোচনায় যোগ দিয়ে বসে নিজেরাই টের পায় না।

মহেশ্বর বসে থাকে উদাস মনোবেদনার প্রতিমূর্তির মত।

তারপর একজন প্রস্তাব করে, মোট কিরকম টাকা উঠবে জানা গেল। এবার মোটা খরচগুলি ছকে ফেললে হত না?

আরেকজন বলে, এটা মহেশ্বরবাবু ভাল পারবেন।

গতবারের খরচের হিসাবটা মহেশ্বর সঙ্গে এনেছিল। পকেট থেকে সেটা বার করে সে একে একে মোটা খরচগুলি বৈঠকে পেশ করে।

প্রতিমার কথায় বলে, আমার প্রতিমা খুব ছোট হয়েছিল। দশজনের পূজোয় আরও বড় প্রতিমা দরকার হবে। পনের বিশ টাকা বেশী পড়বে।

পঙ্কজ এতক্ষণ চিন্তিতভাবে মহেশ্বরেরকে লক্ষ্য করছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে মহেশ্বরের ভাবান্তর দেখে বিস্ময়ের তার সীমা থাকে না। বিষণ্ণতা আছে কিন্তু অন্যমনস্ক উদাস ভাবটা যেন উপে গিয়েছে মন্ত্রবলে।

ব্যাপারটা সে বুঝতে পারে। এরকম সভা করে কমিটি গড়ে পূজার

কথা আলোচনা করার সঙ্গে তার পরিচয় নেই, এতক্ষণ কোন আলোচনাই তার মনকে স্পর্শ করে নি। কিন্তু বাড়ীর পূজার হিসাব তাকে ছকতে হয়েছে প্রতি বছর। গত দু'বছর পুঁজি ভাঙ্গা গয়না বেচা টাকায় বাজারে আগুণ লাগা এই দুর্দ্দিনে খরচের হিসাব ছকতে বসে কি যুদ্ধটাই না জানি তাকে করতে হয়েছে !

পূজার প্রথম বাস্তব কাজ খরচের হিসাব করতে বসেই তার উদাসীনতা ঘুচে গেছে।

পঙ্কজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

বিকালে মহেশ্বরের বাড়ীতে বসে নির্ব্বাচিত পূজা কমিটির বৈঠক। এ বৈঠকে মহেশ্বরকে পূজার ব্যাপারে আরও মনোযোগী দেখে সমস্ত বাড়ীটাও যেন নিশ্বাস ফেলে স্বস্তির !

পঙ্কজকে ভেতরে ডেকে তার হাত চেপে ধরে আনন্দে প্রতিমা কেঁদে ফেলে।

তারপর আসে পূজা। পূজা মণ্ডপে পাড়ার প্রথম বার্ষিকী সার্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্বোধনের দিন মহেশ্বরকে দেখে টেরও পাওয়া যায় না এটা তার নিজের বাড়ীর সাতপুরুষের পূজা নয়—বাড়ীর কর্ত্তা হিসাবে করার বদলে পূজা কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে সে সব দেখাশোনা করছে, সকলকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

চোদ্দ

পূজা ছিল তাদের সাতপুরুষের। বংশানুক্রমে তারা বাড়ীতে করে এসেছে পূজা।

সেই পূজাই এবার সকলের পূজা হয়ে গেল? ভদ্র পাড়ার মানুষ, বস্তির মানুষ, উদ্বাস্তু কলোনির মানুষ—সকলের নিজস্ব পূজা?

তাই ভাল। মা তো কারো সম্পত্তি নয়!

মহেশ্বর এদিক দিয়ে শান্তি পেয়েছে।

প্রাণটা তার জ্বলে যায় শুধু সুরমার জন্য।

হতভাগী মেয়ে। আগের জন্মে বোধহয় অনেক পাপ করেছিল, এ জন্মে তাই এক পাষণ্ডের হাতে পড়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গেল জীবনটা।

মানুষ এমনভাবে বয়ে যেতে পারে, এত নীচে নামতে পারে অধঃপতনের পথ ধরে? মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে পারে এমন ভাবে?

সুরমা দেখা পর্য্যন্ত করে না, সদর দরজা থেকে বিদেয় করে দেওয়া হয়, তবু সমীর মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ায়। সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য হাত পাতে মহেশ্বরের কাছে।

বলে, এবার সে নিজেকে শুধরে নেবে।

বলে, তিন দিন সে কিছু খায়নি।

না দিয়ে পারা যায় না পাঁচ দশটা টাকা।

পরমেশ্বর বলে, ও জানে সবাই হাল ছেড়েছে, তোমরা এখনো আশা ছাড়তে পার নি। সত্যিই হয় তো শুধরে যাবে, তোমাদের এই নিরুপায় আশা কাজে লাগবে।

: কিন্তু এখনো শোধরায় না কেন ?

এ প্রশ্ন সকলেরই মনে জাগে। এখন তো সে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে এ পথে কত সুখ? বাড়ীতে গেলে আত্মীয়বন্ধু দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। বদ উপায়ে কোনরকমে ছ'টো পয়সা হাতে এলে বদ খেয়ালে ছ'দিনে তা উড়ে যায়। আবার সম্বল করতে হয় রাস্তা, আবার ফিকিরে ঘুরতে হয় কি করে ছ'টো পয়সা আসবে। এত কষ্ট পায়, তবু নিজেকে সংশোধন করে না কেন ?

পরমেশ্বর বলে, কষ্ট পাওয়াটাই নেশা দাঁড়িয়ে গেছে, উগ্র নেশা। এ রকম অস্বাভাবিক জীবন ছাড়া ওর সব ফাঁকা মনে হয়।

সুরমা বলে, মরলেও তো বাঁচা যেত !

অনায়াসে আজ সে নিজের স্বামীর মরণ কামনা করে !

সুরমার জন্য জ্বালা আর সাধনের জন্য ছুশ্চিন্তা ও হতাশা।

সমীরের সঙ্গে মোটা টাকা নিয়ে ব্যবসায়ে নেমে নয় সমীরের জন্য সর্ব্বনাশ হয়েছিল। তারপর নিজেও তো কতদিকে কতভাবে চেষ্টা করল, ফল হল না কিছুই। নিজের খরচটা চালাবার জন্য সামান্য বেতনের একটা চাকরীও জোটে না।

মন ভেঙ্গে যাবার বিপদ দেখা দিয়েছে সাধনের। সবিতার মত একটা অসহায়া মেয়ে পর্য্যন্ত বাইরে থেকে চাল এনে বেচে আর মাঝে মাঝে কোন সভায় গান গেয়ে কিছু কিছু রোজগার করে, আর পুরুষ মানুষ সে বাপের ঘাড় ভেঙ্গে পেট ভরায়।

সবিতা তাকে সাহস দেয়, তার হতাশা দূর করার চেষ্টা করে। নিজের রোজগারের কঠোর বাস্তবতা নিয়ে খেদও সে প্রকাশ করে সাধনের কাছেই।

নাঃ, এভাবে চাল কেড়ে নেবে, ঘুষ আদায় করবে, অপমানের একশেষ করবে—চাল এনে বেচে রোজগার করা চলে না আর।

অল্প চাল এনে বিক্রী করে হয় সামান্য উপার্জন। কোন মেয়েই বেশী চাল কিনে আনতে পারে না একেবারে। তাতেও যদি ঘুষ দিতে হয় তবে লাভ থাকবে কি করে?

তীব্র জ্বালার সঙ্গে সবিতা বলে, আমার পিছনেই যেন বেশী করে লাগে!

সাধন বলে, লাগবে না? এমন সুন্দর চেহারাটি বাগিয়েছিলে কেন! তোমায় রাণীর হালে রেখে পুষবার জন্য কত লোক ওৎ পেতে আছে—তুমি কিনা চাল এনে বেচবে! এ কি লোকের সয়?

: ওই ব্যবসাই করি এবার। আশা হয়েছিল গান গেয়ে বুঝি কিছু হবে। যোগসাজস হলে ন'মাসে ছ'মাসে পাঁচ দশটা টাকা। আরও কতকাল শিখতে হবে ঠিক নেই। এখন আর তো কোন পথ দেখছি না ঝি-গিরি ছাড়া।

সাধন নিশ্বাস ফেলে বলে, তুমি ছেলেমানুষ তায় মেয়ে—তবু তো তুমি যাহোক কিছু রোজগার করছ। প্রায় তিন বছর চালিয়ে দিলে। আমি খালি লোকসান দিলাম, বাবার টাকাগুলি নষ্ট করলাম।

সবিতা সখেদে বলে, সত্যি! আপনার কথা ভাবলে এমন খারাপ লাগে আমার!

: যা ধরি তাই যেন ফস্‌কে যায়!

গভীর সমবেদনায় তার হাত চেপে ধরে সবিতা নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সাধন তার চোখে তার মনের ছায়া দেখতে পায়।

ঢোঁক গিলে বলে, ভাগ্যে বিশ্বাস করতাম না, আজকাল করতে ইচ্ছা

হয়। অন্ততঃ বাবার ভাগ্যে। মেয়েটার বিয়ে দিলেন ভাল চাকরে ছেলে দেখে—একেবারে গোল্লায় গেল। বার বার আমাকে সুযোগ দিলেন কিছু করার, আমি শুধু টাকাগুলিই নষ্ট করলাম। এবার পূজো করার টাকাও বাবার জুটল না! এত চেষ্টা করে একটা চাকরী খুঁজে পাচ্ছি না সামান্য টাকার।

অনির্দ্দিষ্ট আশার কথা বলা ছাড়া কিছুই করার নেই। সবিতা সেই আশাই জানাবার চেষ্টা করে।

: ঠিক হয়ে যাবে।

: আর কবে ঠিক হবে?

: হতাশ হতে নেই। দোষ তো আপনার নয়—দোষ হল দেশের অবস্থার। একেবারে চরম দশায় পৌঁছে দিয়েছে পাজীর দল—ভালভাবে আপনাকে রোজগার পর্য্যন্ত করতে দেবে না। আপনি পথ না পেলে কি করবেন? কাজেই হতাশ হয়ে লাভ নেই।

: হতাশা নয় গো—এ হল প্রাণের জ্বালা। আমি একটা কথা ভাবছিলাম—বাড়ীতে না জানিয়ে কিছু ফিরি করব। অন্ততঃ নিজের হাতখরচটা তো উঠবে।

: কি ফিরি করবেন?

: এখনো ঠিক করিনি। মালটা তোমার ঘরে রাখব ভাবছি।

পূজার মধ্যে সমীর একবার এসেছিল।

তার চেহারা দেখে মহেশ্বরের মনে হয়েছিল আর বেশীদিন বোধ হয় মেয়েকে তার বিধবা হবার কামনা টেনে চলতে হবে না, শীঘ্রই কামনা পূর্ণ হবে।

কয়েকটা টাকা তাকে দিয়েছিল মহেশ্বর। বলেছিল, তুমি আর

এসো না বাবা আমার কাছে। আমার আর সাধ্য নেই। এ বছর পূজো বন্ধ করেছি—পাড়ার লোকেরা চাঁদা তুলে এ পূজো করছে।

সমীর চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

: এবার এলে বাধ্য হয়েই তোমায় খালি হাতে ফিরিয়ে দেব।

বিসর্জনের কয়েকদিন পরে আবার সমীরকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে মহেশ্বরের শরীরটা অবসন্ন হয়ে আসে।

এ ক'দিনেই আরও কদর্য্য কুৎসিৎ হয়ে গেছে তার চেহারা। কোটরে বসা চোখে একটা অদ্ভুত ঝিমানো ভাব, মুখে ঘর্মাক্ত ক্লেদের মতই যেন ক্লান্তি মাখানো।

মহেশ্বর প্রায় কাতর অনুনয়ের সুরে বলে, আবার কি চাও বাবা? সেবার এত করে তোমায় বুঝিয়ে দিলাম যে আমি আর পারব না, তবু আবার তুমি এসেছ? আমি নিজে একরকম ফকির হয়ে বসেছি, তোমাকে একটি পয়সা দেবার সাধ্যও আমার নেই।

আগে কোনবার করেনি, এবার সমীর ধীরে ধীরে ঝুঁকে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। বলে, আজ্ঞে, টাকা চাই না। আমি আজ টাকার জন্য আসিনি।

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হয় না মহেশ্বরের!

: কি বলছ?

: আপনার মেয়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। ক'টা দরকারী কথা আছে।

মহেশ্বর ভাবে, কে জানে এ আবার কি নতুন চাল? কে জানে আবার কি নতুন মতলব হাঁসিল করতে এসেছে সমীর?

মুখে বলে, সে তো তোমার সঙ্গে দেখা করবে না বাবা।

সমীর বলে, একটু গিয়ে বলবেন, বিশ্বাস করে আমার সঙ্গে শুধু দুটো কথা বলুক, তারপর আমি চলে যাব। আমি কিছুই চাই না।

ঃ দাঁড়াও তবে। জিজ্ঞেস করে আসি।

জিজ্ঞাসা করতে তাকে ভেতরে যেতে হয় না। জানালা দিয়ে সমীরকে আসতে দেখে সুরমা বাইরের দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিল—নিজের কানেই সে সব কথা শুনেছে সমীরের।

সে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, বাবা, বলে দাও দেখা করে কাজ নেই, আমি দেখা করব না, কথাও বলব না।

মহেশ্বর নীচু গলায় বলে, কি বলতে চায় শুনলে হত না ?

সুরমা জোর দিয়ে বলে, না। কোন লাভ নেই। আমি জানি, নতুন কোন ফন্দি এঁটেছে। বানিয়ে বানিয়ে কত রকম কি বলবে, মাথাটা ঘুরে যাবে আমার। মিথ্যে অশান্তি সৃষ্টি কোন লাভ নেই বাবা।

ঃ চলে যেতে বলব ?

ঃ তাই বল। আর যেন না আসে। নিজেকে বিধবা ভেবেছি, তাই আমার ভাল।

সমীর নিজেই সব শুনেছে। বাইরে গিয়ে তবু মহেশ্বর অপরাধীর মত জানায়, সুরমা তোমার সঙ্গে দেখা করবে না।

মাথা নত করে সমীর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

মহেশ্বর টের পায় এপাশের ওপাশের সামনের বাড়ীর জানালা দিয়ে অনেকগুলি কৌতূহলী মুখ উঁকি দিচ্ছে।

সমীরের বিষয় জানতে কারও বাকী নেই। মেয়ে তার এ বাড়ীতে আছে, তবু জামাই এসে কিভাবে বাড়ীর সদর দরজা থেকে চোরের মত ফিরে যায় দেখবার জন্য ঔৎসুক্যের তাদের সীমা নেই।

এ দৃশ্য দেখা অনেক সিনেমার চেয়ে কুৎসিৎ আর রসালো।

সমীর আবার বলে, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছ'মিনিট কথা বলেই চলে যেতাম।

মহেশ্বর অসহায়ভাবে তাকায়।

ভিতর থেকে সুরমার সুস্পষ্ট জবাব আসে : আমি বিধবা হয়েছি। ভূতপ্রেতের সঙ্গে এক মিনিটও আমি কথা বলব না।

সমীর চোখ তুলে চায়। কিন্তু সুরমাকে দেখতে পায় না।

মাথায় ঝাঁকি দিতে গিয়ে সে যেন নিজের শীর্ণ দেহটাকেও ঝাঁকানি দেয়। ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের খুঁট তুলে মুখে চাপা দিয়ে কয়েকবার কাসে।

তারপর আবার মহেশ্বরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে নীরবে ধীরে ধীরে চলে যায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ছ'ছবার পাষণ্ড অমানুষ জামায়ের প্রণাম পেয়ে মহেশ্বর হতভম্ব হয়ে বসে থাকে।

ছদিন পরে পদ্মাকে এ বাড়ীতে দেখা যায়।

প্রায় ছ'বছরের উপর সে এ পাড়ায় আসেনি।

আজও সে আসে দামী গাড়ীতে চেপে এবং সে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে সেই আগেকার ড্রাইভার কান্তিলাল।

বিধুভূষণের অবস্থা কি ফিরেছে আবার?

আবার সে বাড়ী করেছে, গাড়ী কিনেছে?

পদ্মাকে দেখে সত্যই অবাক হয়ে যায় পাড়ার মানুষ এবং এ বাড়ীর মানুষ।

এবার তার সিঁথিতে সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা।

মহেশ্বরের মেয়েকে বিয়ে করে সমীর অধঃপাতে গিয়েছে বলে এজন্ই

চটেছে বিধুভূষণ যে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে নিমন্ত্রণ করা দূরে থাক একটা খবর পর্য্যন্ত দেয়নি ছেলের শ্বশুর বাড়ীতে।

পরমেশ্বর বলে, এসো মা এসো। মায়ের আমার নতুন মূর্তি দেখছি!

হাসিমুখে আগের সুরেই সে অভ্যর্থনা জানায় কিন্তু পদ্মার কানে যেন অনেক নীরস প্রাণহীন ঠেকে তার কথার সুর।

সুরমা ননদকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার সি থিতে সিঁদুর উঠল কবে?

পদ্মা বলে, বছর দেড়েক হবে।

: আমি একটা খবর পেলাম না কেন?

: ভারি তো বিয়ে তার আবার খবর!

নিজের বিয়ের ব্যাপার যেন তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিয়ে প্রসঙ্গটাই পদ্মা চাপা দিতে চায়। প্রায় একসঙ্গেই বলে, আমি দাদার খবর জানতে এসেছি।

: আমরা তো খবর রাখি না তোমার দাদার।

পদ্মা যেন হতাশ হয়ে যায়।

: কোথায় থাকে কি করে কিছুই জানো না?

: না। মাঝে মাঝে টাকা ভিক্ষা করতে আসে, টাকা নিয়ে চলে যায়। তোমাদের ওখানে যায় না টাকা চাইতে? ভারি আশ্চর্য্য তো! আত্মীয় বন্ধু কাউকে বাদ দেবার মানুষ তো ও নয়!

পদ্মা বলে, ঠিকানা জানলে বোধ হয় যেত। আমার ঠিকানা তো জানে না।

পরমেশ্বর বলে, তোমার কথাবার্তা কিন্তু ভারি রহস্যময় ঠেকছে মা।

সুরমা বলে, আমিও বুঝতে পারছি তোমার কথা। এর মধ্যে ও একবারও বাবার কাছে সাহায্য চাইতে যায় নি?

পদ্মা বলে, আমি তো জানি না। আমি বাবার কাছে যাই না।

: কেন?

: বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলে।

পরমেশ্বর একটু হাসে।

: রহস্য আরও গভীর হল।

পদ্মা বলে, বছর দেড়েক আগে বাবা আমাকেও তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমার বিয়ের সময়। আমার বিয়ের ব্যাপারেই রাগ করে তাড়িয়ে দিয়েছেলেন। আমিও রাগ করে বাপের বাড়ীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখি না।

সুরমা বলে, ও বাবা, তোমার বিয়ে নিয়ে এত কাণ্ড হয়েছে। বাবা রাগ করলেন কেন?

প্রতিমাও কৌতুহল চাপতে পারে না, বলে, বলুন না একটু শুনি আপনার বিয়ের ব্যাপারটা?

পদ্মা খানিক চুপ করে থেকে বলে, ব্যাপার আর কি, ড্রাইভারকে বিয়ে করব বলেছিলাম, বাবা, জ্যাঠামশায় এদের তাই অপমান হয়েছিল।

সুরমা বলে, বুঝেছি। সেই কান্তিলাল তো?

পদ্মা নীরবে সায় দেয়।

: ওর সঙ্গে এসেছ না তুমি?

: হ্যাঁ। গাড়ীতে বসে আছে।

পরমেশ্বর বলে, ছি ছি, বাড়ীর মেয়ের নন্দাই, তাকে কিনা পরের মত বাইরে গাড়ীতে বসিয়ে রাখা হয়েছে! যাই, ডেকে নিয়ে আসি ভেতরে।

পদ্মা বলে, থাক না।

পরমেশ্বর হাসিমুখে উঠে যেতে যেতে বলে, থাকবে কি মা? তোমার স্বামীকে ঘরে ডেকে বসাব না এমনি ছোটলোক পেয়েছ আমাদের?

কান্তিলাল ভেতরে এসে বসে।

পদ্মা যে এমন আচমকা সমীরের খবর জানতে এসেছে তার কারণটা তার কাছে শোনা যায়।

আগের দিন সে রাস্তায় গাড়ী হাঁকাবার সময় ফুটপাতের ধারে সমীরকে বসে থাকতে দেখেছিল—বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে। সে তখন ছিল ডিউটিতে, দাঁড়িয়ে কথা বলবার সময় ছিল না।

গাড়ী থামিয়ে সে সমীরকে তার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে

সমীর জানায় তাকে সেখানেই পাওয়া যাবে।

কিন্তু পরে ফিরে এসে সেখানে আর তাকে কান্তিলাল খুঁজে পায় নি।

কান্তিলালকে চা জলখাবার এনে দিয়ে সুরমা পদ্মাকে বলে, তোমাকে সব জানিয়ে দেওয়াই ভাল। তোমার ভায়ের সম্পর্কে আমরা সব আশা ত্যাগ করেছি। বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া হয় না, আমি কথা কই না। পরশুদিন এসে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চেয়েছিল, আমি দেখা করি নি।

পদ্মা বলে, ও!

খানিক মাথা নীচু করে থেকে সে বলে, ওর কাছে যা শুনলাম তাতে বেশীদিন আর বাঁচবে মনে হয় না।

সুরমা বলে, আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। মরে যাবে কিন্তু শোধরাবে না।

খানিক পরে সাধন বাজার নিয়ে বাড়ী ফেরে।

বাসের দু'আনা পয়সা বাঁচাতে সে প্রায় আধমাইল রাস্তা বাজার করে হেঁটে বাড়ী ফেরে।

পদ্মাকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে বলে, হঠাৎ কোত্থেকে এলেন? বিয়ে টিয়ে হয়ে গেছে দেখছি!

বলতে বলতে তার চোখ পড়ে একই মাদুরে বসা কান্তিলালের দিকে।

তার হাঁ করে তাকিয়ে থাকার রকম দেখে কান্তিলালের মুখে হাসি ফোটে, পদ্মাও হেসে ফেলে।

সুরমা বলে, ওর সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে।

ঃ তাই নাকি! বেশ বেশ।

পদ্মার ড্রাইভার স্বামীকে সাধন কি ভাবে নেবে ভেবে একটা খট্‌কা ছিল সুরমার মনে কিন্তু দেখা যায় সাধনও আর সে সাধন নেই।

সহজভাবে অনায়াসে সে কান্তিলালকে বলে, বসুন, মুখ হাত ধুয়ে এসে আলাপ করব। এত নোংরা বাজার, হাতে পায়ে সাবান না দিলে গা ঘিন ঘিন করে।

ঃ যা বলেছেন।

পদ্মা নিশ্বাস ফেলে বলে, দাদার জন্য না হলে আজকে এসে আমার কত ভাল লাগত!

পরমেশ্বর বলে, একটা মানুষ কত মানুষের আনন্দ নষ্ট করতে পারে। নিজেকে ঠিক রেখে চলার দায়িত্ব তো এইজন্যই মানুষের।

পরদিন বিকালের ডাকে একখানা পোষ্টকার্ড আসে সমীরের।

পেন্সিলের অস্পষ্ট আঁকাবাঁকা লেখা, কিন্তু চেষ্টা করে পড়া যায়।

সমীর শিয়ালদ' ষ্টেশনে পড়ে আছে।

তার সমস্ত অপরাধ যেন সকলে ক্ষমা করে। সম্ভব হলে শেষবারের মত ছেলেমেয়ে দু'টিকে সে একবার দেখতে চায়।

এই পরিণতিই ঘটে সমীরদের চিরকাল—পাপের এই বাঁধাধরা পুরস্কার। সে জাত বজ্জাত নয়, বেপোয়োরা ঔদাসীন্যের সঙ্গে যারা পাপের পথে হিসেব করে হাঁটতে সুরু করে একদিন মোটর হাঁকায়—ওদের ধাতু দিয়ে সে গড়া নয়।

পাপ তার পেশা নয়, নেশা।

স্বাভাবিক সুস্থ জীবন আয়ত্তে থাকলেও অসুস্থ জীবনের অস্বাভাবিক তীব্র উন্মাদনা বিষাক্ত মায়াত্মক নেশার মতই তার মত মানুষকে অল্পদিনে ধ্বংস করে ছাড়ে।

খবর শুনেই সুভাগিনী হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে।

সুরমার হাত পা থর থর করে কাঁপছিল, কিন্তু মুখের ভাব তার কঠিন।

সে বলে, আঃ, থামো না মা! ব্যাপারটা বুঝতে দাও আগে। এমন হাউ হাউ করে তুমি মাথা গুলিয়ে দিও না আমাদের। এ আরেকটা মিথ্যে চালও তো হতে পারে? ও মানুষটার কোন কথায় বিশ্বাস আছে?

সুভাগিনীর কান্না আচমকা থেমে যায়।

সেটা অসম্ভব নয়। ছল চাতুরী মিথ্যা আর প্রতারণার নতুন নতুন মতলব ভাঁজতে সে যে কত বড় ওস্তাদ, এদিকে তার যে কিরকম অসাধরণ উদ্ভাবনী শক্তি, সমীর তার পরিচয় খুব ভাল করেই দিয়েছে বটে।

তবু মেয়ের মুখের দিকে অবাক হয়েই চেয়ে থাকে সুভাগিনী। এ তার সেই মেয়ে, কারো একটু আঙুল কেটেছে দেখলে যে একদিন কেঁদে ফেলত, যার কোমল প্রাণের বাড়াবাড়ির পরিচয় মাঝে মাঝে তার কাছেও বিরক্তিকর ঠেকত, আজ সে স্বামীর কাছ থেকে এই চিঠি পেয়েও এমন শক্ত হয়ে আছে পাথরের মত!

ঃ কি করা যাবে ?

ঃ বাবা আসুক ।

মহেশ্বর কাজের চেষ্টায় বেরিয়েছিল। সন্ধ্যার আগেই সে ফিরে আসে।

চিঠি পড়ে তার মুখে নেমে আসে বিমর্ষতা ।

ঃ একবার তো যেতে হয় তাহলে ?

সুরমা বলে, তুমি অস্থির হ'য়ো না বাবা। কতবার তোমায় কতভাবে ঠকিয়েছে মনে নেই ?

ঃ তাই বলে তো আর মরতে দেওয়া যায় না !

পরমেশ্বর বলে, কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি করতে নেই। আবার যদি ঠকায়, ঠকাবে। কিন্তু এ অবস্থায় চুপ করে থাকলে তোমার অন্যায় হবে—তোমার সে অধিকার নেই। কারণ, এটা যেমন ওর আরেকটা মতলবও হতে পারে, তেমনি আবার সত্যও হতে পারে কথাটা। ওর চেহারা তো তোমরা দেখেছ।

একটু থেমে সে যোগ দেয়, এই ভাবেই মারা যায় এসব মানুষ।

মহেশ্বর আবার বলে, না না, যাই করে থাক—একেবারে মরতে দেওয়া যায় না কিছুতেই !

সুরমার মুখের ভাব নরম হয় না।

বলে, মরতে কি আর সত্যি দেওয়া যায় বাবা ? আমরা যাবো চল—কিন্তু তোমাকে শক্ত থাকতে হবে। আগে বুঝতে হবে সত্যি লিখেছে কিনা, তারপর যাহোক ব্যবস্থা করা যাবে। ব্যাকুল হয়ে ওর আর কোন ফাঁদে আমরা পা দেব না।

মহেশ্বরও অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারও

মনে হয় যে কি ছিল তার মেয়ে আর কি দাঁড় করিয়েছে তাকে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা!

সত্যই বোকা সমীর, তিলে তিলে সত্যই সে আত্মহত্যা করেছে। নইলে এমনভাবে কেউ মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করে দেয় যে রাস্তার ধারে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থাকার সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখলেও তার নিজের স্ত্রীর সন্তানের জননীর সন্দেহ থেকে যায় যে এটা তার মানুষ ঠকাবার আরেকটা কৌশল হওয়া অসম্ভব নয়!

পরমেশ্বর মাথায় হাত রাখে সুরমার।

বলে, অত মনের জোর দেখাতে হবে না। ভেতরে তো কাঁপছিস্!

মনে যাই ভাবুক আর মুখে যাই বলুক ভেতরটা সত্যই শান্ত হয় না। ঢোঁক গিলতে গিয়ে কয়েকবার চেষ্টা না করে গিলতে পারে না। আতঙ্কের চাপে তার শ্বাসযন্ত্রের খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে—সে ছোট ছোট নিঃশ্বাস ফেলে।

: তুমি যাবে জ্যাঠামশাই?

: আমায় আবার কেন জড়াবি?

: আমরা কি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারব?

: সব সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখলেই কি চলে? ঠাণ্ডা হিসাবের ফল ভাল হয়? আমার মাথা নয় ঠাণ্ডা, তোর তো তা নয়! আমার বিচার হয় তো ভুল দাঁড়াবে তোর পক্ষে—ফলটা খারাপ হবে। ভুলও যদি করিস, এ অবস্থায় তোর নিজের করা উচিত।

তারা বেরোবার জন্য প্রস্তুত হলে পরমেশ্বর সুরমাকে বলে, একটা উপদেশ বরং শুনে যা। এটা মনে রাখিস—মন স্থির করতে সুবিধা হবে। সংসারে চোরঘ্যাঁচর পাপীতাপী অনেক আছে কিন্তু তাই বলে মানুষ খারাপ নয়, মানুষকে ছোট ভাবতে নেই। মানুষ মহৎ এটাই হল খাঁটি

হিসাব—তারপর কোন একটা বিশেষ মানুষ সম্পর্কে দরকার মত হিসাব কষা।

অসহায় নিরুপায় উদ্বাস্তু মানুষে ভরা শিয়ালদ' ষ্টেশন। শিশু থেকে বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, ছোট বড় পরিবার, একলা মানুষ। একদিন তারাও নেমেছিল এই ষ্টেশনে এমনি উদ্বাস্তুদের ভিড়ের মধ্যে—আজও সেই ভিড় কমেনি।

এই ভিড়ের মধ্যে খুঁজে বার করতে হবে সমীরকে।

চারিদিকে তাকায় আর সুরমা ভাবে, সমীরকে নয় নিজের দোষে এখানে এসে শেষ শয্যা পাততে হয়েছে মরণের প্রতীক্ষায়, এরা কার কাছে কি দোষ করেছিল? কি পাপে কার পাপে এই শিশু নারী যুবক বৃদ্ধের এই পরিণাম, এই শাস্তি?

একপ্রান্তে সমীরকে পাওয়া যায়।

ভাঁজ করা সতরঞ্চিতে সে একটা কাপড়ের পুঁটুলি মাথায় দিয়ে শুয়েছিল। তার দিকে একনজর তাকালেই তার অবস্থা সম্পর্কে সমস্ত সন্দেহের মীমাংসা হয়ে যায়।

সুরমা শিউরে উঠে চোখ বোজে।

মহেশ্বর নাম ধরে ডাকতে সমীর অতি কষ্টে চোখ মেলে তাকায়।

খানিকক্ষণ শূণ্য দৃষ্টিতে বিহ্বলের মত চেয়ে থাকে।

সুরমা তার গায়ে হাত দেয়।

জ্বর নেই দেখে সে পরম স্বস্তি বোধ করে।

মহেশ্বর বলে, আমাদের চিনতে পারছ না?

একটু মাথা হেলিয়ে সমীর জানায়, চিনতে পেরেছে।

কথা বলবার জন্য ঠোঁট ফাঁক করে, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না।

মহেশ্বর মেয়ের মুখের দিকে তাকায়।

: একটা ট্যাক্সি ডেকে আনি ?

: আনো।

অগত্যা বাড়ীতেই আনতে হয় সমীরকে।

উপায় কি। সত্যই তো, তাকে প্ল্যাটফর্মে পড়ে একলা একলা বিনা যত্নে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেওয়া যায় না—যত অন্যায়ই সে করে থাক! যথাসাধ্য চেষ্টা করতেই হবে তার মরণকে ঠেকাবার জন্য।

যদি বাঁচানো যায় তাকে, যদি সুস্থ সবল করে তোলা যায় চিকিৎসা আর সেবা দিয়ে, হয় তো শক্তি ফিরে পেলেই আবার নিজের মূর্তি ধরবে।

কিম্বা হয় তো এই অভিজ্ঞতা মোড় ঘুরিয়ে দেবে তার জীবনের।

দেখা যাক কি দাঁড়ায়।

জামা-কাপড় ছাড়িয়ে সমীরকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়—জীবনটা এভাবে ধ্বংস না করলে এ বাড়ীতে এসে যে খাটের যে বিছানায় মহা-সমাদরের সঙ্গে শোয়ার অধিকার তার সর্ব্বজনস্বীকৃত ছিল!

বিপিনকে ডাকা হয়।

বিপিন খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে সমীরকে, ডাক্তারের পক্ষে যতখানি যত্ন নিয়ে পরীক্ষা করা সম্ভব।

পরীক্ষা শেষ করে বলে, একটু গরম দুধ আনতে হবে।

সুরমার বাচ্চা দু'টির জন্য যে দুধটুকু ছিল সেটা গরম করে এনে সমীরকে খাইয়ে দেওয়া হয়।

দুরু দুরু বুকে সকলে অপেক্ষা করে ডাক্তারের রায় শোনার জন্য।

বিপিন পরমেশ্বরের ঘরে গিয়ে বলে, ওষুধ একটা লিখে দিচ্ছি—তবে

ওষুধের চেয়ে সেবা আর পথ্যের দরকার বেশী। আর কিছু হয় নি, শরীরটা একটু দুর্ব্বল।

একটু দুর্ব্বল? একটু?

সুরমা ঠোঁট কামড়ায়।

পরমেশ্বর বলে, খেতে না পাওয়াটা রোগ নয় কিন্তু না খেয়েও মানুষ মরে ভুলিস না।

সুরমা ঢোঁক গেলে।

পরমেশ্বর আবার বলে, না, মনে কোন খট্‌কা রেখো না। সেটা কিন্তু বোকামি হবে। ঘরে এনে তুলেছ, সেবা যত্ন করতেই হবে। মন খুলে দরদ দিয়ে না করলে ও সেটা টের পেয়ে যাবে। মনে রাখিস, সেবা যত্ন দরদের স্বাদ পেয়ে হয় তো ওর জীবনের মোড় ঘুরে যেতে পারে। অন্তত আমরা তাই আশা করব।

সুরমা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তা ঠিক।

সাধন সমীরের ওষুধ আর পথ্য আনতে যায়।

সুরমা যায় সমীরের কপালে হাত বুলিয়ে দিতে। কর্তব্য পালন করতেই হবে তাকে।

মানুষ খবর নিতে আসে।

পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই আসে বেশী।

মজা দেখতে অবশ্য আসে দু'একজন কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষ আসে কৌতূহল মেটাতে।

বস্তি থেকে ভুমুর পর্য্যন্ত জানতে আসে—জামাই এসেছে নাকি?

সকলকেই বলা হয়, জামাই-এর বড় অসুখ!

কি অসুখ? না, সাধারণ অসুখ।

সুরমা বলে, কি বিশ্রী কৌতূহল মানুষের!

পরমেশ্বর শুনে বলে, তোর কি কিছুতেই শিক্ষা হবে না? জীবনের অ আ ক খ-ও শিখবি না? এ কৌতূহল সস্তা হল তোর কাছে? চারিদিকে কত মানুষ খাপছাড়াভাবে মরছে—কে কার খবর রাখে? তোর স্বামী মর মর অবস্থায় এসেছে শুনে সবাই খবর জানতে এল, এর চেয়ে খাঁটি দরদ আছে নাকি? তুই কি চাস যে তোর সোয়ামীর অসুখ বলে পৃথিবীর সব লোক বুক চাপড়ে কাঁদবে? কৌতূহল হল, খবর নিতে এল—এতেই তো তুই ধন্য হয়ে যাবি।

: আমার মাথার ঠিক নেই জ্যাঠামশাই!

পরমেশ্বর তার মাথায় হাত রেখে বলে, এ অবস্থায় মাথায় ঠিক না থাকাই ভাল।

সবিতাও যখন বেশী রাতে খবর নিতে আসে সুরমা তখন আর বিরক্ত হয় না।

বলে, এসো ভাই।

সমীরকে দেখে সবিতা বলে, ইস্, কি চেহারা হয়েছে!

সুরমাকে বাইরে ডেকে সবিতা বলে, এবার আর ছেড়ো না কিন্তু। প্রাণপণে আঁকড়ে থাকবে। এসব মানুষকে গায়ের জোরে মায়া করে ঠিক রাখতে হয়।

: গায়ের জোরে মায়া?

: হ্যাঁ, শক্ত তেজী মায়া। এক রকম মায়া আছে না, ভীরু তুলতুলে মায়া, কেঁদে ককিয়ে দরদ দেখানো? এসব মানুষের ও জিনিষ মোটে পছন্দ নয়। ওভাবে কিছু করতে বারণ করলে এরা সেটা করবেই। এদের জোর করে বলতে হয় তোমায় আমি এভাবে নিজের অনিষ্ট করতে

দেব না, তোমায় দরদ করি বলে তোমায় ঠেকাবার অধিকার আমার আছে, দেখি তুমি কি করে এটা কর।

সুরমা আশ্চর্য্য হয়ে বলে, কটা স্বামী নিয়ে ঘর করেছিস ভাই? এসব জানলি কি করে?

সবিতা হেসে বলে, স্বামী নিয়ে ঘর না করলে বুঝি এসব জানা যায় না? আমার মত রাস্তায় বেরোও, দশটা লোকের সঙ্গে কারবার কর, কোন মানুষটার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় শিখিয়ে দিতে হবে না।

: তাই নাকি!

: তবে? দু'তিন বছরে আমার যে কত জ্ঞান বেড়ে গেছে ভাবলে অবাক হয়ে যাই। আমার কথাটা ভুলো না ভাই। সমীরবাবুর প্রকৃতি জানি তো। তুমি কাঁদাকাটা করেছ, নয় রাগারাগি ঝগড়াঝাঁটি চালিয়েছ—তাই ঠেকাতে পার নি। ওসব না করে যদি ভালবাসার জোর খাটাতে মানুষটা তা'হলে কখ্‌খনো এরকম হতে পারত না, একটা সীমা রেখে চলত।

সুরমা আশ্চর্য্য হয়ে সবিতার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মনে হয় খুব বড় একজন বিজ্ঞ মানুষের কাছে সে তার দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতার সঠিক ব্যাখ্যা শুনছে।

পরমেশ্বর পর্য্যন্ত তাকে যে ব্যাখ্যা শোনাতে পারে নি।

সে ধীরে ধীরে বলে, দাদা বস্তিতে গিয়ে তোমার সঙ্গে বেশী মেশে বলে আমরা বিরক্ত হই। এখন দেখছি আমরাও তোমার সঙ্গে একটু মিশলে ভাল করতাম।

সবিতা সলজ্জভাবে হেসে বলে, রাত হল, পালাই।

সাধন সুরমাকে জিজ্ঞাসা করে, সবিতা এতক্ষণ তোমাকে কি বলছিল?

: বলছিল ওর বিগড়ে যাওয়ার পিছনে আমারও দোষ ছিল, আমি ঠিকভাবে চলতে পারি নি ।

: তা তোরও দোষ ছিল বৈকি ।

: কতটা দোষ ছিল ভাল করে বুঝতে হবে ।

রাত বাড়ে ।

চারিদিক নিঝুম হয়ে আসে ।

সমীর খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছে । ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে সুরমা মেঝেতে শোওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছে ।

সুরমার ঘুম আসে না ।

সে টের পায় পাড়া ঘুমিয়ে পড়ছে, এলাকা ঘুমিয়ে পড়ছে, চারিদিক কাঁপিয়ে শুধু রাস্তা দিয়ে চলছে শেষ দু'একটা বাস ।

সুরমা আকাশ-পাতাল ভাবে ।

কতকাল পরে স্বামীকে ঘরে পেয়েছে । খাটে শুয়ে ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে এপাশ ওপাশ করছে ।

তার মনে কিন্তু আশা নেই, আনন্দ নেই, স্বস্তি নেই । অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তা আর অতীতের স্মৃতি যন্ত্রণার মতই চাপ দিচ্ছে মাথার মধ্যে ।

ষ্টেশনে পড়ে থাকলে হয় তো মরে যেত ।

এবারের মত সমীর মরবে না ।

কিন্তু কি হবে তার ?

এমনিভাবে কে কতবার ঠেকিয়ে রাখবে তার অপমৃত্যু ?

আপনজনের আশ্রয়ে আপনজনের সেবাযত্নে সুস্থ হয়ে উঠে সে তো আপন হবে না । অশান্তিতে আবার সে অসহ্য করে তুলবে সকলের জীবন । আবার তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে বাড়ী থেকে ।

কিছুদিন পরের এই আগামী ঘটনার কথা কল্পনা করে সুরমা শিউরে ওঠে।

কেন তাদের খবর দিতে যায় সমীর, শেষ দেখা দেখতে চায় ছেলেমেয়েকে? কেন সে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উদ্বাস্তুদের মধ্যে নিঃশব্দে চুপচাপ মরে গিয়ে তাদের রেহাই দেয় না, নিজে রেহাই পায় না?

ঘরের আলো জ্বলে ওঠায় সুরমা চমকে ওঠে। খাট থেকে নেমে সমীর নিজে আলো জ্বেলেছে!

ধড়মড় করে উঠে বসে সুরমা, পলকহীন চোখে মানুষটার দিকে চেয়ে থাকে।

সন্ধ্যাবেলা কয়েকজন ভলাণ্টিয়ারের সাহায্যে যাকে ষ্টেশন থেকে গাড়ীতে তুলতে হয়েছিল, বাড়ীর সকলে ধরাধরি করে গাড়ী থেকে নামিয়ে খাটে শোয়াতে হয়েছিল, মাঝরাত্রে এখন নিজেই সে নেমে দাঁড়ায় খাট থেকে সাধারণ সুস্থ মানুষের মত।

নিজে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালে, কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খায়!

নতুন আতঙ্কে বুক কেঁপে যায় সুরমার। কে জানে কি ভয়ানক মতলব নিয়ে এই কৌশলে সমীর বাড়ীতে ঢুকেছে, মাঝরাত্রে সুবিধামত এবার নিজের মতলব হাসিল করবে!

সুরমার মনে পড়ে ডাক্তারের কথা—একটু দুর্বলতা ছাড়া সমীরের কিছুই হয় নি। একটু দুর্বলতা! ডাক্তারের কাছে তো ফাঁকি চলে না।

জল খেয়ে সমীর একটু তফাতে বিছানায় বসে। ছেলেমেয়ের গায়ে একবার হাত বুলায়।

বলে, ভয় পেয়ো না, ভয়ের কিছু নেই। বিশ্বাস কর, তোমাদের কোন ক্ষতি করতে আসি নি। আমার কোন খারাপ মতলব নেই।

সুরমা এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

সমীর বলে, ভেবেছিলাম দু'তিন দিন সময় নিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হব। দু'তিন দিন তোমাদের কাছে পাব, সেবা পাব—এটাই আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আর ছলনা ভাল লাগছে না। তোমার সঙ্গে কথা না কয়ে আর চুপচাপ পড়ে থাকতে পারলাম না।

: আবার তুমি আমাদের ঠকালে ?

: ঠকিয়েছি—কিন্তু এবার আমার মতলব ভাল।

সুরমা চুপ করে থাকে।

সমীর বলে, বিশ্বাস হয় না ? না হওয়াই উচিত। কিন্তু এখন না হোক কাল তোমার বিশ্বাস হবে—অন্ততঃ খানিকটা নিশ্চয় হবে। আমি নিজেই সকালে চলে যাব, টাকাও চাইব না, কিছু চুরিও করব না।

: এরকম করার মানে কি ?

: মানে ? মানেও তুমি বিশ্বাস করবে না আজ। আমি জীবনের মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করছি। তোমাদের কাছ থেকে একটু মনের জোর জোগাড় করতে এসেছি। মনটা বড় দুর্ব্বল হয়ে গেছে সুরমা। তোমাদের দেখে গেলাম—যদি মানুষ হ'তে পারি দু'বছরে হোক পাঁচ বছরে হোক, তোমাদের কাছে এসে দাঁড়াতে পারব।

সুরমা খানিক চুপ করে থাকে। কে জানে এ আবার কোন খাপছাড়া নাটকের ভূমিকা ?

: সোজাসুজি একথা বলে এলেই হত!

: তুমি দেখা করতে আমার সঙ্গে ?

সুরমা চুপ করে থাকে।

সমীর বলে, অনেকবার পাঁক থেকে উঠবার চেষ্টা করেছি, পারি নি।

তোমাদের কাছে মনের জোর খুঁজতে এসেছি বললাম—কিন্তু মিথ্যে বলব কেন, তোমাদের জন্য মন কেমন করেছে কিন্তু তোমাদের জন্য নিজেকে শোধরাবার মত মনের জোর পাই নি, স্রোতে ভেসে গিয়েছি। সবচেয়ে বেশী কাবু হতাম কিসে জানো?—হতাশায়।

হতাম! কাণে কথাটা বাজে সুরমার। আর কি হতাশায় সে কাবু হয় না?

কুঁজো থেকে সে আরেকটু জল গড়িয়ে খেয়ে আসে।

ঃ সে কেমন হতাশা তুমি বুঝবে না। নিজেকে শুধরে নেব ভাবি কিন্তু জানি সেটা অল্পে হবে না, দুদিনে সহজে সম্ভব করা যাবে না। যা ভেঙেছি আবার তা গড়তে হলে অনেকদিন ধরে অনেক কষ্টে গড়তে হবে। এ কথাটা ভাবলেই মাথা ঘুরে যেত, নিজেকে বড় অসহায় মনে হত। ভাবতাম, আমার পক্ষে আর তা সম্ভব নয়, ওসব মিথ্যা স্বপ্ন দেখে আর লাভ নেই।

সমীর একটু চুপ করে থেকে বলে, কারা আমায় এই হতাশা জয় করতে শিখিয়েছে জানো?—উদ্বাস্তুরা।

ঃ উদ্বাস্তুরা?

সমীর সায় দিয়ে বলে, উদ্বাস্তুরা। ওরা আমায় শিখিয়েছে কখনো কোন অবস্থাতে মানুষের হতাশ হতে নেই—সব সময়েই আশা নিয়ে থাকতে হয়। অনেকদিন পথে পথে ঘুরেছি তো। সারাদিন পয়সা উপায়ের ফন্দি ফিকির নিয়ে ঘুরি, রাত্রে ষ্টেশনে ওদের মধ্যে শুয়ে থাকি। ওদের দেখি আর অবাক হয়ে যাই। যথাসর্ব্বস্ব গেছে, ছেলেমেয়ে নিয়ে কি করবে কোথায় যাবে কিছুই ঠিক নেই, কারো হয়তো একবেলা খেলে আরেক বেলা খাওয়া কোথা থেকে জুটবে জানা নেই—কিন্তু কী মনের জোর! হাল ছেড়ে ভেসে যাবে না কিছুতেই, একদিন

আবার সব হবে। যতদিন কষ্ট করতে হয় করবে। কেউ যদি সাহায্য করে ভাল, না করলে নিজেরাই চেষ্টা করবে উঠতে। যার যত বেশী দুর্গতি তারই যেন তত বেশী আশা, তত বেশী মনের জোর।

সুরমা চুপ করে শোনে।

একটু থেমে সমীর বলে, ওদের সঙ্গে মিশতে মিশতে আমারও মনের মোড় ঘুরে গেছে। ওরা পারলে আমি কেন পারব না? ওরা হাল ছাড়ে নি, আমি কেন হাল ছাড়ব? আমার বরং ঢের বেশী সুযোগ সুবিধা। যে বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছি সেটা ফিরিয়ে আনতে পারলে আত্মীয়স্বজন সবাই আমাকে সাহায্য করবে।

মিথ্যা কথাকে, বানানো কথাকে সত্যের মত করে বলার অভিনয়ে বরাবর সমীর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। বার বার ঠকেও আবার বিশ্বাস করতে হয়েছে তার কথা। কিন্তু আজ যেন তার বলার কায়দার জন্য নয় তার কথার মধ্যেই সহজ সরলতার একটা নতুন সুর শোনা যায়।

বিশ্বাস করতে ইচ্ছাও হয়, একটু যেন ভরসাও হয়।

বহুকাল পরে মাঝরাত্রে এক ঘরে স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে বসে সত্যই আবার নতুন আশার ক্ষীণ গুঞ্জনের সুর ওঠে সুরমার মনে!

পরমেশ্বরের কথা মনে পড়ে। সমীর অসাধারণ মানুষ—তার অসাধারণত্ব খারাপ দিকে ঝুঁকেছে তাই, অন্যদিকে ঝুঁকলেও সে অসাধারণ মানুষ হতে পারত।

সে অসাধারণত্বের নতুন পরিচয় কি সমীর এবার দেবে?

ধীরে ধীরে সুরমা বলে, তোমার মন বদলে গেছে বলছ। এটা কি তার নমুনা? এসব কথা চিঠিতে লিখলেই হত সোজাসুজি? এরকম ছলনা করা উচিত হয় নি।

ঃ তোমরা কি বিশ্বাস করতে?

: প্রথম প্রথম নাই বা করতাম ? আমাদের বিশ্বাস জন্মাবে এটাও তোমার ভাল হবার চেষ্টা করারই সামিল। সত্যি যদি তুমি ভাল হতে চাও কদিন আমরা তোমায় অবিশ্বাস করব ? তোমার সুমতি হোক, তোমায় বিশ্বাস করা যাক, এটাই তো আমরা সবাই মানত করছি দিনরাত।

সমীর চুপ করে ভাবে।

সুরমা চোখ নামায়। আপশোষের সঙ্গে বলে, তোমার মনটাই বাঁকা হয়ে গেছে, নইলে এরকম কৌশলে এখানে আসবার কথা মনেও আসত না তোমার। তুমি কি করে ভাল হবে, নিজেকে বদলে দেবে ?

সমীর উৎসাহিত হয়ে বলে, কি আশ্চর্য্য, তুমিও সে কথা ভেবেছ ? খাটে শুয়ে শুয়ে আমিও এই কথাটাই ভাবছিলাম—আমার মন বাঁকা হয়ে গেছে। তোমাদের কাছে দু'দিন থাকব, তোমাদের দেখে মনের জোর পাব,—এ জন্য তোমাদেরি যে ধাপ্পা দিচ্ছি, আগে এটা খেয়ালও হয় নি। কিরকম একটা উত্তেজনার ভাব এসেছিল, এখানে আসার পর ধীরে ধীরে সেটা কেটে গেছে। ভেবেছিলাম তিন চারদিন তোমাদের কাছে থাকব, কিন্তু বুঝতে পারলাম যে, না, এটা করা আমার উচিত হয় নি। সেই জন্যই উঠে পড়লাম—ছলনার জের টানব না।

ছেলের গায়ে হাত রেখে সে আবার বলে, আমি যা চাইছিলাম, পেয়ে গেছি সুরমা। বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে শান্ত হয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘরে শুতে কেমন লাগে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ আবার ধরতে পেরেছি।

সে একটু হাসে।

: বাঁকা মনটাও সোজা হচ্ছে। উঠবার সময় ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে কথা বলে এই রাত্রেই চলে যাব। বেশ একটা নাটক করা হবে।

কিন্তু আর নাটক ভাল লাগছে না। কাল সকালে চা-টা খেয়ে যাব ঠিক করেছি।

: সেই ভাল।

ভোরে ঘরের বাইরে যেতেই দেখা যায় পরমেশ্বর কলতলায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে।

তাকেই খুঁজছিল সুরমা।

তাকে সে সব জানায়।

: এ তো সুখবর।

সুরমা চিন্তিত মুখে বলে, কিন্তু আমার যে খটকা যাচ্ছে না? মনে হচ্ছে, সবটা আরও বড় একটা ছলনা? বাইরে কষ্ট পাচ্ছে, আমাদের এখানে থাকবার মতলব করে এসব করেছে, এসব বলছে? ভেবেছে, আমরা এবার থাকতে বলব?

: বেশ তো। তাতে হয়েছে কি?

: আমি ভাবছি, থাকতে বলব না। চলেই যাক—সত্যি সত্যি যদি শোধরায় মানুষটা, সে তো আর অজানা থাকবে না।

পরমেশ্বর হেসে বলে, তুইও ওর সঙ্গে মতলবের পাল্লা দিবি নাকি?

সুরমা চুপ করে থাকে।

: তোরও মাথা খারাপ হয়েছে। কষ্ট পাচ্ছে বলে ক'দিন বাড়ীতে একটু আরামে যদি থাকতেই চায়—তুই তাতে বাদ সাধবি? রাস্তায় পড়ে থাকবে—এই তোর ইচ্ছা? আমি ভাল হতে চাই বলে যতবার আসবে ততবার সুযোগ দিতে হবে। ঠকিয়ে যায় ঠকবি। এদিক থেকে আমরা একেবারে নিরুপায়—আমাদের যে আশা করতেই হবে।

প্রত্যেকবার ভাবতেই হবে যে আগে অনেকবার ধাপ্পা দিয়েছে, কিন্তু এবার হয় তো সত্যি নিজেকে শোধরাতে চায়।

সুরমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবে।

যতবার ভাল হবার সুযোগ চায়, ততবার সুযোগ দিতে হবে!

তারা নিরুপায়!

সমীরকে চা আর খাবার দিয়ে সুরমা বলে, ভালই যখন হতে চাও, তুমি বরং এখানেই থাকো। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে কেন? শরীরটা ভাল কর, কাজের চেষ্টা কর।

সমীর মাথা নাড়ে।

স্পষ্ট ভাষায় জোর দিয়ে বলে, না। তোমাদের আদরে মন নরম হয়ে যাবে। আমি ভাবছি, কোন উদ্বাস্তু কলোনিতে নিজে হোগলার কুঁড়ে তুলে থাকব। মাঝে মাঝে এসে তোমাদের দেখে যাব।

থাকতে বললেও সমীর থাকতে চায় না!

সত্যই তবে সে ছলনা দিয়ে অভিনয় দিয়ে মন ভুলিয়ে তাদের কাছে আরামে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাবার মতলব নিয়ে আসে নি?

মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সুরমার।

সে বলে, দ্যাখো, নিজেকে শোধরাবার জন্য তুমি যা দরকার করবে, আমি জোর করে বাধা দেব না। তুমি আবার আশা জাগালে, কোথায় পড়ে আছে কত কষ্ট পাচ্ছ ভেবে প্রাণটা আমার ছটফট করবে, তবু তোমায় জোর করে থাকতে বলব না। তুমি নিজে যদি মনে কর আমাদের কাছে থাকলে মন নরম হবে না, তবেই তুমি থেকো। একটা কথা বলি তোমায়, আমি কিন্তু আর সেই সুরমা নেই। আমি তোমায় দুর্বল করে দেব না, বরং মনের জোর বাড়াতেই সাহায্য করব।

সমীর চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সুরমা আবার বলে, উদ্বাস্তুদের মধ্যে থাকতে চাও, একলা কেন? আমিও তোমার সঙ্গে থাকব, কষ্ট করব।

সমীর ম্লান মুখে বলে, এখন যে চালাতে পারব না। শরীরটা একটু ভাল না হলে—

সুরমা জোর দিয়ে বলে, তাহলে তোমার এখানে থাকাই উচিত। উদ্বাস্তুদের মধ্যে মনের জোর খুঁজে পাও, বাড়ী থেকে ওদের মধ্যে যাবে, মেলামেশা করবে। এইতো সামনের বস্তিতে কত ঘর উদ্বাস্তু আছে। সময় মত খাওয়া আর নিয়মমত ঘুমোতে পারলে তবেই তো শরীরটা সারবে তাড়াতাড়ি? শরীর ভাল হলে দেখবে মনের জোরও বেড়ে গেছে।

সমীর ইতস্ততঃ করে।

সুরমা কৃতজ্ঞতা বোধ করে সবিতার কাছে।

এই কথাই তো সবিতা তাকে বলেছিল—দুঃখে আনন্দে কেঁদে ফেলার বদলে ভালবাসার জোর খাটিয়ে সমীরের যা করা উচিত তাকে দিয়ে তাই করিয়ে নেওয়া!

নিজের কথা না ভেবে, নিজে বিচলিত না হয়ে, যে ভাবে যে উপায়ে সম্ভব অসুস্থ বিকারগ্রস্ত মানুষটার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করা, যতটা সম্ভব তার মনকে বশে রেখে ঠিক পথে পরিচালিত করা।

ঠিক কথা। মন তো সত্যই দুর্বল হয়ে গেছে সমীরের, তার দ্বিধা সংশয়ের অন্ত নেই। জোর করে ভরসা না দিলে, তাকে সাহায্য না করলে ঠিক পথে পা চালাতে সে মনের জোর কোথায় পাবে?

সমীর সংশয়ভরে বলে, আমার কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। এত কাণ্ড করে কিভাবে এখন আরামে থাকব, সকলকে মুখ দেখাব?

শুনে প্রাণ যেন জুড়িয়ে যায় সুরমার। সমীরের সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে!

হৃদয় তার ভোঁতা হয়ে যায় নি, নিজের অপরাধের জন্য সে লজ্জা বোধ করতে পারে।

বুকে যেন নতুন বল নতুন ভরসা পায় সুরমা।

সে সমীরের কাছে সরে যায়।

: এটাই তুমি ভুল করছ। একেবারে উল্টো হিসাব করছ। তুমি স্বভাব ভাল করবে স্বাস্থ্য ভাল করবে সেজন্য যদি কয়েকমাস বসে বসে খাও বাড়ীর সকলেই বরং কৃতার্থ হয়ে যাবে।

: কোনদিন নেশাটেশা করে বসব—

: বসবে। তুমি নেশা ছাড়বার চেষ্টা করছ নেশা কমিয়ে দিয়েছ শুধু এইটুকু প্রমাণ দেখালে একদিন নেশা করেছ বলে কেউ কিছু মনে করবে না। এই সোজা কথাটা কে না জানে বলো যে লাফিয়ে গাছে ওঠা যায় না?

সমীর চেয়ে থাকে।

সুরমা বলে, তাছাড়া, নেশা ছাড়তে শুধু মনের জোরের ওপর নির্ভর করবে কেন? এখানে থাকলে তুমি ডাক্তারের সাহায্য পাবে, কাজটা আরও সহজ হবে।

তবু সমীর ইতস্ততঃ করে বলে, কেবল তোমার কথায় থাকাটা—

সুরমার প্রাণ আরও জুড়িয়ে যায়। এটুকু আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানও বজায় আছে!

শ্বশুরের নামে পাড়ার লোকের কাছে টাকা ধার করে, পূজার খরচের টাকা চুরি সে একদিন পালিয়ে গিয়েছিল এ বাড়ী থেকে, তারপর ভিখারীর মত সামান্য কটা টাকার জন্য শ্বশুরের কাছে এসে হাত পাততে তার বাধে নি, তবু এ চেতনা তার টিঁকে আছে যে শুধু বৌয়ের কথায় শ্বশুরবাড়ী থাকা জামায়ের পক্ষে মর্য্যাদাজনক নয়!

সুরমা শান্ত কণ্ঠে বলে, আমার কথায় নয়। শোন তোমায় বলি। তুমি সব বলবার পরেও আমার মনে খট্‌কা ছিল তুমি আসলে কিছুদিন আরাম করার ফিকিরেই এসেছ। আমিই ভাবছিলাম তোমাকে থাকতে বলব না। ভোর বেলা জ্যাঠামশায় শুনে আমায় ধমকে দিলেন। তোমার যে খারাপ মতলব নেই কখন আমার পুরো বিশ্বাস হল জানো? থাকতে বলতেও তুমি নিজেই যখন থাকতে চাইলে না।

তার এই সরলতা যেন সমীরকে খুসী করে।

সে একটু ভাবে।

: থাকাই ভাল বলছ?

: হ্যাঁ, থাকো।

সুরমা বিনা দ্বিধায় বলে!

সমীরের মুখে ক্ষীণ একটু হাসির আভাষ দেখা যায়।

: আমার মাথা ঘুরছে, সব যেন ওলোট পালোট হয়ে যাচ্ছে। তবু আমার কি মনে হচ্ছে জানো? আমি যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, কোন একটা উদ্ভট দেশে চলে গিয়েছিলাম। এবার ধীরে ধীরে ঘোর কেটে গিয়ে চেতনা ফিরে পাচ্ছি।

সুরমা তার হাত চেপে ধরে।

বলে, আমার দোষও কম নয়। আমি কেবল নিজের কথাই ভেবেছি।

সে কেঁদে ফেলে সমীরের কোলে মুখ গুঁজে দেয়।

পনের

সূর্য্যের আলোয় আজ যেন অনেক বেশী রঙ। কুৎসিৎ জগতটা আজ যেন চেহারা পালটে রূপবতী হতে সুরু করেছে।

একটু বেলা বাড়তেই সুরমা হঠাৎ বাড়ী ছেড়ে বস্তির দিকে এগিয়ে যায়।

সবিতার সঙ্গে কথা বলার জন্য তার প্রাণটা ছটফট করছিল।

ডুমুর বলে, ওমা! আজ কে এসেছে গো? অ সবিতা দিদি ঘর থেকে বেরিয়ে দেখবে এসো।

রোয়াকে পিড়ি পেতে দিয়ে বলে, এসো সুরমাদি বোসো। সকাল বেলা হঠাৎ?

: সবিতার সাথে কথা কইতে এলাম।

ডুমুর ছদ্ম অভিমানে কচি মেয়ের মত ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, মোর সাথে নয়?

সুরমা হেসে বলে, তোমার সাথে নয় মানে? তোমার বাড়ী এলাম কি তোমায় বাদ দিয়ে কথা কইতে?

ডুমুরের বাস্তব বুদ্ধি আছে। সবিতা বেরিয়ে এলে দু'একটা কথা বলেই সে সরে যায়।

সবিতা বলে, কি ব্যাপার দিদি?

: এমনি এলাম কথা কইতে। তোমার উপদেশ যে আমার কত উপকারে লেগেছে কি আর বলব তোমায়।

: অত বাড়িও না—মুখ্যু গেঁয়ো মানুষ, অহঙ্কারে ফুলে যাবো।

রোয়াকে উঠে বসতে গিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে স্থরমা আশ্চর্য হয়ে যায়।

ঘরে বসে সাধন কতগুলি জুতার সোল গুছিয়ে রাখছে।

সবিতা বলে, ধরা পড়ে গেলেন, আমার কিন্তু দোষ নেই। বাড়ীতে মানুষ এলে বসতে দিতে হয়।

স্থরমা আরও আশ্চর্য বলে, ধরা পড়ে গেল মানে?

: আমার ঘরে বসে তোমার দাদা জুতোর সোল ঘাঁটছে। মানেটা তো এবার তোমায় বুঝিয়ে বলতেই হবে স্থরমাদি? তোমাদের কাছে গোপন যা করছিলেন সেটা ধরা পড়ে গেল।

স্থরমা শুধু বলে, কি যে কাণ্ড তোমরা ব্যাটাছেলেরা জুড়েছ!

সাধন রোয়াকে বেরিয়ে এসে বলে, বাড়ীতে বলিস না।

: কি বলব না বাড়ীতে? আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

: আমি আজকাল জুতোর সোল ফিরি করছি।

: ও!

স্থরমা কয়েকবার ঢোঁক গেলে।

: আমাদের কাছে গোপন করে কেন?

: মাবাবা জানতে পারলে হার্টফেল করবে তাই।

: হার্টফেল করা দোষের কি? লেখাপড়া শিখে শেষে এই দশা হল তোমার? জুতোর সোল ফিরি করছ!

সবিতা হেসে বলে, তুমিই যেন হার্টফেল করে ফেলো না স্থরমাদি!

আমার হার্ট শক্ত আছে। স্বামীর পাগল হওয়া সয়ে গেছে, দাদা জুতোর সোল ফিরি করছে শুনে হার্টফেল করব?

সাধন জিজ্ঞাসা করে, সমীর এবার কেন এসেছে রে? ও কি জানে না বাবা বাড়ীতে পূজো বন্ধ করেছেন, আমি বেকার বসে আছি, মাছ দুধ খাওয়া বন্ধ হয়েছে ?

সুরমা কড়া সুরে বলে, তোমাদের ঘাড় ভাঙতে আসে নি। মাথার কঠিন অসুখ হয়েছিল, পাগল হয়ে যেতে বসেছিল, তোমরা পাত্তা দিয়েছিলে? একলাটি রোগে ভুগেছে, নিজেই নিজের চিকিৎসা করেছে। ক'বছর ধরে এতবড় একটা ভয়ানক অসুখ গেল, সেরে উঠবার সময় কদ্দিন আমার কাছে একটু থাকতে এসেছে।

একটু থেমে বলে, শরীরে মনে মানুষটা একটু বল পেলেই আমরা চলে যাব দাদা। তোমাদের ঘাড়ে চেপে থাকব না।

মুখ লাল হয়ে যায় সাধনের ।

সাধন বলে, দিনে দুতিনটের বেশী সিগারেট খাই না জানিস? সিগারেটের বদলে বিড়ি ধরেছি ?

: জানি বৈকি। আমরা বিড়ি সিগারেটের গন্ধের তফাৎ বুঝি না ?

: বিড়ি আর দু'তিনটে সিগারেটের পয়সা পর্যন্ত বাবার কাছে হাত পেতে চেয়ে নিতে হয়।

সুরমা ম্লানমুখে চুপ করে থাকে।

সাধন বলে, জামা-কাপড় চাইতে হয় না। বাড়ীতে লুঙ্গি পড়ি, বাইরে বেরোবার জামা-কাপড় আস্ত আর ফর্সা আছে কিনা মা নজর রাখে। চাকরীর খোঁজে বাইরে বেরোই কি না। আগে বাবা বেরোতে দেখলেই জিজ্ঞাসা করতেন, টাকা নিয়েছ? বাইরে বেরোলে দু'এক টাকা সঙ্গে রেখো। এবার পূজোর দু'তিন মাস আগে থেকে বেরোচ্ছি দেখেও কিছু বলেন না। হাত পেতে চাইলে দ্যান কিন্তু চার আনা চাইলে কখনো পাঁচ আনা দ্যান না।

: বাবার অবস্থাটা—

: আহাঃ, সেই কথাই তো বলছি। বাবা সাধে চার আনা চাইলে পাঁচ আনা দেন না? না চাইলে কিছুই দেন না? দেবার ক্ষমতা নেই বলেই দেন না। বাবার অবস্থাটা বুঝতে পারছি বলেই তো জুতোর সোল ফিরি করছি—হাত খরচের পয়সা চেয়ে যাতে বাবাকে বিব্রত না করতে হয়।

সুরমা কাতরভাবে বলে, কিন্তু দাদা—

সবিতা বলে, থাক্ না সুরমাদি? মেয়েরা জগৎ সংসারের অনেক ব্যাপার জানে না, কিন্তু যেটুকু জানে তাই নিয়ে কোমর বেঁধে তর্ক আর ঝগড়া করে।

: সেটা বুঝি মেয়েদের দোষ? পুরুষরা ওরকম বোকা হাবা করে রাখে কেন মেয়েদের? জগৎ সংসারের ব্যাপার জানতে দেয় না কেন?

সবিতা নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে। কালও কি রকম কাদার মত ছিল এই সুরমা, আজ তার কি তেজ!

সাধন বলে, শুধু হাতখরচ রোজগার করলে আমার চলবে কেন, এই কথা বলছিস তো?

সুরমা নীরবে সায় দেয়।

সাধন বলে, আমিও তা ভেবেছি। কিন্তু অনেকবার অনেক রকম চেষ্টা করলাম—টাকাই শুধু লোকসান গেল। তার কারণ আর কিছুই নয়, এখনকার বাস্তব অবস্থার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। আমি বাস করছিলাম আরেক যুগে, কতগুলি মিথ্যা স্বপ্ন আর কল্পনা আঁকড়ে ছিলাম। আজকাল সকলের পক্ষেই আপিসে খেটে ব্যবসা করে রোজগার করা কঠিন ব্যাপার—চোর-চামারদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয় কি না। এ

অবস্থাটা ভাল মত জানা থাকলে রোজগার কিছু করতে পারি না পারি আমার ঘরের পয়সাগুলি অন্যদের আমার ঘাড় ভেঙ্গে বাগাতে দিতাম না। বুঝতে পারলি ?

সবিতা বলে, আপনারা আছেন বলেই তো এত লোকের লোকঠকানো ব্যবসা চলে।

সুরমা সাধনকে বলে, তাই যদি বলো, তোমার যদি এ রকম অবস্থা হয়, ও মানুষটার পক্ষে আবার সামলে সুমলে রোজগারপাতি করা কি সম্ভব হবে ? আমি বেশ খুসী মনে এসেছিলাম, তুমি আমায় দমিয়ে দিলে। ওর ব্যাপারটা সব খুলে বলি শোন, নইলে আমার কথা বুঝবে না।

সুরমা সমীরের কাহিনী বলে।

সাধন ও সবিতা কান পেতে শোনে।

সুরমা বলে, আমি আহ্লাদে ডগমগ হয়ে সবিতাকে বলতে এলাম যে ওর পরামর্শ শুনে আমার কপাল ফিরেছে। আমি জোর দেখিয়ে ওকে আবোল তাবোল এলোমেলো পথে নিজেকে শুধরোবার চেষ্টা থেকে ফিরিয়েছি, আমি ভার নিয়েছি জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে ওকে সাহায্য করব। কিন্তু দাদা, পয়সা রোজগার করতে নেমে সুস্থ সমর্থ যোয়ান মানুষ তোমার যদি এই দশা হয়ে থাকে, ওর কি দশা হবে ভাব তো ? একমাস দু'মাস ধরে আমি নয় বাবার ঘাড় ভেঙ্গেই ওর শরীর মনটা ভাল করলাম—তারপর ও তো নিজে রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে অস্থির হয়ে উঠবে ? তুমি যে চেষ্টায় ঘায়েল হলে, ওকি সেখানে কিছু করতে পারবে ? হতাশ হয়ে আবার বিগড়ে গিয়ে নিজেকে নষ্ট করবে মানুষটা।

সাধন বলে, কেবল নিজের হিসাব ধরলে কি আজকের দিনে চলে ? দশজনের কথা ভাবতে হয়। জীবনটা আবার নতুন করে গড়বার

ইচ্ছা সমীর কোথায় গেল? তোর কাছে পায় নি। অসহায় নিরুপায় মানুষেরা পর্য্যন্ত হাল ছাড়ছে না দেখেই তো!

একটু থেমে আবার বলে, দশজনের সঙ্গে মিলে পাড়ায় সার্বজনীন পূজোয় না নামলে বাবার কি দশা হত ভেবেছিস? ঘরের পূজো বন্ধ করার শোকে বাবা পাগল হয়ে যেত।

সুরমা দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে।

সবিতা বলে, এতক্ষণ কথা কই নি, এবার মুখ খুলতে হল। সেই কথাই বলতে হল আবার, তুমি যা শুনে চটে গেলে। তুমি এত বেশী ভেবো না সুরমাদি। মনে রেখো, তুমি ঘরের কোণায় থাক, বাইরের জগতটাকে চেনো না। যেটুকু চেনো সমীরবাবুকে দিয়ে আর বাপ-ভাইকে দিয়ে নিজের মনের মত করে চেনো। সাধনবাবু এতদিন এলোমেলো চেষ্টা করে কাত হয়েছেন বলেই সমীরবাবু কেন লড়ায়ের ঠিক পথটা ধরতে পারবেন না? তোমার আমার ঘরোয়া হিসাবে মেয়েলি হাসি কান্নায় জগতটা কিন্তু চলছে না সুরমাদি!

সুরমা অবজ্ঞার সঙ্গে বলে, আমায় কি বোঝাচ্ছিস ভাই? তিন বছর তাণ্ডব বয়ে গেল আমার ওপোর দিয়ে। আমার কি বাকী আছে পুরুষদের ব্যাপার বুঝতে? ঘরের কোণে থাকি বলেই আমার এ দশা, এটুকু বুঝিনে?

সবিতা বলে, ওই তো বললাম। শুধু নিজেকে দিয়ে বোঝ। তুমি আর তোমার স্বামীটি। জগতে তোমার মত কত বৌ কত স্বামী আছে জানো? নিজের হিসাব আর নিজের স্বামীটির হিসাব দিয়ে জগৎটাকে বোঝা যায় না।

সুরমা চুপ করে থাকে।

সাধন একটা বিড়ি ধরায়।

সুরমা ডুমুরের দেওয়া পানের একটা লবঙ্গ খুলে মুখে দেয়।

সবিতা বলে, তোমরা ছিলে জমিদার ব্যবসাদার জোতদারদের সঙ্গে—অনেক টাকা পয়সা প্রতিপত্তি ভোগ করেছ। সে অবস্থাটা ফিরিয়ে আনতে চাইলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে। যে সব কর্তাব্যক্তিরা তোমাদের টাকা দিত, জমি দিত, মান সম্মান দিত, আজকে তোমাদের দিয়ে তাদের কাজ চলে না। আগের মত সহজে শোষণ তারা নিজেরাই চালাতে পারছে না। এখন নতুন ভাবে নতুন উপায়ে নতুন লোক দিয়ে তারা নিজেদের বাঁচাতে চায়। তাই তোমাদের এই দুর্দ্দশা। এটুকু না বুঝলে এক পা এগোতে পারবে না।

সুরমা নিশ্বাস ফেলে বলে, তুই বোন ব্যাটাছেলে গণেশ সেজে এসেছিলি না?

সাধন বলে, সবিতা, তুমি আমার শেখানো কথাগুলি আমার বোনকে শোনাচ্ছ।

সবিতা বলে, সত্যি কথা কার কাছে শিখেছি কাকে শোনাচ্ছি ভাবলে কি চলে? একজনের কাছে তো শিখতেই হবে। আপনিও কি শেখেন নি অন্যের কাছে?

সুরমা বলে, তুমি চুপ কর দাদা। ওর কথা শুনতে দাও।

সবিতা বলে, আমার সেই পুরুষ সাজাটাই তোমাদের মিষ্টি লাগে। একটা মেয়েকে কেন পুরুষ সাজতে হয় ভেবেছ কি? মেয়ে কেন এত অসহায় হয় এদেশে? নিজে তুমি মেয়ে সুরমাদি, নিজেই তুমি হিসেব কর না, স্বামীকে বাদ দিতে হলে কেন নিজেকে তোমার বিধবা ভাবতে হয়? একটা পুরুষ মানুষ জানোয়ারের অধম হয়ে গেছে, তবু হয় তাকে বাতিল করতে হবে, নয় ভাবতে হবে আমি বিধবা হয়েছি! কেন? আমরা মেয়েরা কি খেলার ঘুঁটি? একটা পুরুষের সঙ্গে বনল না বলেই আমাদের জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে?

সুরমা বলে, কি কথা থেকে কি কথায় এলাম।

সবিতা বলে, এটাই আসল কথা। তুমি বুঝতে পারছ না।

: তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

: কেন? আমি তো খুব সহজ কথা বলেছি। স্বামী ছাড়া তোমার গতি নেই—স্বামীই সব।

যে আশায় আনন্দে ডগমগ হয়ে সুরমা ঘর থেকে বেরিয়েছিল, সব যেন উপে গেছে।

সে নিশ্বাস ফেলে বলে, সে তো জেনেছি অনেকদিন।

সাধনের মুখের দিকে চেয়ে সবিতা যেন অনুমতি চায় তার বোনকে কড়া কথা শোনাবার।

সাধন বিব্রতভাবে বলে, কি বলছ?

: বলব কথাটা আপনার বোনকে?

: বলো।

সবিতা সুরমার মুখের দিকে দু'চোখ খুলে চেয়ে বলে, আমি তোমাদের রকম সকম মোটে পছন্দ করি না সুরমাদি। স্বামী বিগড়ে গেছে, চুলোয় যাক। তাকে শুধরে নিতে না পারলে আমার জীবনও চুলোয় গেল, এ কি রকম হিসাব?

সুরমা হঠাৎ যেন নিজেকে ফিরে পায়। মুখ উঁচু করে সে এবার একটু অবজ্ঞার হাসি হাসে।

: হিসেব খুব সোজা। অন্য হিসেবের ব্যবস্থা নেই তাই এই হিসেব। অন্য হিসেব তৈরী হলে তখন দেখা যাবে।

সবিতা মুখ বাঁকায়।

: আমরা এরকম নরম হলে নতুন হিসেব তৈরী হচ্ছে! সেই আশাতেই থাকো।

সবিতা রান্না ঘরে—ঘরে নয় চালায় ছুটে যায়। সে শাকপাতার চচ্চড়ি চাপিয়েছিল, সেটা পুড়ে যাচ্ছে। আলু পটোলের দাম বড় বেশী। ডোবা পুকুরে জন্মায় অজস্র কল্‌মী শাক। এতই অজস্র জন্মে যে গরীব দুঃখী তুলে এনে বাবুদের দুয়ারে বিক্রী করে। সেরখানেক শাক এনে দেওয়ার জন্য মজুরি পায় এক আনা।

তাই মানতে হয়।

বাড়ীর কাছে পুকুরে ফুটে আছে, বাবুদের বৌঝিরা নাইতে গিয়ে সাহস করে শুধু উপড়ে আনলে কলমী শাক বিনা পয়সায় ঘরে আসে।

তবু সেরখানেক শাক নিয়ে এক আনা পয়সা দেয় বলেই তো এরা ভদ্রমহিলা।

সবিতা কলমী তুলে এনেছে নিজে।

ডাক্তার ডাকা হলে সমীর বিশেষ উৎসাহ বোধ করে নি।

ডাক্তার তার রোগের কি চিকিৎসা করবে!

সুরমা স্বামীকে বলে, তুমি সব কথা খুলে বল ডাক্তার বাবুকে। বল তো আমিও চলে যাচ্ছি।

সমীর বলে, তুমি থাকো।

অন্য সকলে চলে গেলে সমীর একটু হেসে ডাক্তারকে বলে, আমার হল চরিত্রের দোষ, স্বভাবের বিকার। আপনি কি ওষুধ দেবেন আমায়?

ডাক্তারও হাসে।

: মানসিক রোগের চিকিৎসা আমি জানি না, ওষুধ দিয়ে চরিত্রও সংশোধন করতে পারি না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বভাব বিগড়ে যাবার ফিজিক্যাল কজ থাকে। সবদিক দিয়ে ভাল মানুষ, একদিক দিয়ে মন্দ। কেন এমন হবে? শরীরের মধ্যে নিশ্চয় কোন খুঁত আছে।

সেটা ওধরে দিয়ে হেল্প করতে পারি। নিজেকে আপনি শোধরাবেন নিজেই। যতটা পারেন খুলে বলুন।

সমীর বলে, ডাক্তার বাবু, শরীরে কোনটা খুঁত আছে, মনে খানিকটা পাগলামি আছে—এটাই তবে আসল রোগ?

ডাক্তার হেসে বলে, শরীর সব মানুষের আছে, মনও আছে। মানুষের অনেকরকম রোগ—শরীরে মনে। শরীরের রোগ মনের রোগে তফাৎ করেছেন বড়কর্তারা। আমরা কি করি, পেশার খাতিরে মেনে নিয়েছি। রোগীর বাস্তব অবস্থা আর পরিবেশ রোগের কারণ হলেও অনেক সময় আমাদের সেটাও ভুলে যেতে হয়। নইলে রোগীকে বলতে হয়, অসুখ সারিয়ে লাভ নেই, আবার হবে। নিজের অবস্থা বদলান বলার মানেও অনেক সময় দাঁড়ায় দেশের অবস্থা বদলাতে বলা।

সমীর এলোমেলো ভাবে বলে যায় তার সব বিষয়ে সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে চলার ঝোঁকের কাহিনী, সব সময় রোমাঞ্চ আর উত্তেজনার জন্য তার মনটার খাঁ খাঁ করবার কাহিনী, নিদ্রাহীন রাত্রিকে মদ দিয়ে বশ করার কাহিনী।

মদের পয়সা না থাকলে সস্তা ওষধি জাতীয় বিষের সাহায্য নেবার কাহিনী।

সুরমা পর্য্যন্ত টের পায় যে সে বাড়িয়ে বলছে। যতটা বাড়াবাড়ির কথা সে বলছে এতটা বাড়াবাড়ি সত্যই করে থাকলে অনেক আগেই সে মরে যেত।

ডাক্তার বলে, বুঝেছি। ফিজিক্যাল অসুবিধাটাই আপনার প্রধান অসুখ। অবস্থা আর পরিবেশের চিকিৎসা আমি করতে পারব না, তা'হলে ডাক্তারি ছেড়ে রাজনীতি ধরতে হয়। তবে আপনার মত অবস্থা আর পরিবেশের সব মানুষ তো বিগড়ে যায় না—

সমীর মাথা উঁচু করে জোরের সঙ্গে বলে, আমার চেয়ে হাজারগুণ খারাপ অবস্থা আর পরিবেশের হাজার হাজার মানুষ বিগড়ে যায় না। আমি নিজে দেখেছি।

ডাক্তার সায় দিয়ে বলে, আমিও তাই বলছি। আপনার শরীরের অসুবিধাটাই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনার শরীরে কতগুলি দরকারী ভিটামিন নেই, আপনার লিভারটার মেজাজ ভাল নয়, আপনার নার্ভগুলিতেও গোলমাল আছে। দেহে স্বস্তি না থাকলে মনের জোর খাটানো মুস্কিল হয় বৈকি। সেইজন্যই আমি ওষুধ আর পথ্যের ব্যবস্থা করছি, দু'চার দিনের মধ্যেই শরীর অনেকটা হাল্‌কা বোধ করবেন। নেশা কাটিয়ে ওঠা আজ যত কঠিন মনে হচ্ছে তখন আর অতটা কঠিন ঠেকবে না।

সমীর নিয়ে নিয়েই সুরমার গয়নাগুলি প্রায় শেষ করেছিল। দু'একখানা যা অবশিষ্ট ছিল তারই একটি সে সমীরের ওষুধ ও পথ্যের জন্য সাধনের হাতে তুলে দেয়।

সাধন বলে, চোখ কাণ বুজে নিতেই হবে, না?

সুরমা বলে, হাসিমুখেই নাও। বেশীর ভাগ গেছে গোল্লায়, এটা সত্যিকারের কাজে লাগল।

সুরমা সত্যই হাসে।

: আজ সত্যি আশা করতে পারছি যে হয় তো একদিন আবার সব হবে।

: তবে আমিই বা সঙ্কোচ করি কেন? আমিও আশা করি যে আজ তোর কাছ থেকে এটা নিতে হলেও একদিন হয় তো আমি তোকে ফিরিয়ে দিতেও পারব।

: নিশ্চয় পারবে। চিরদিন মানুষের কি সমান যায়।

বোঝা যায় ডাক্তার আরও জোরালো করে দিয়ে গেছে সুরমার আশার বাস্তব সম্ভাবনা।

নিরুপায়ের মত নয়, সে আজ সতেজে আশা করতে পারছে।

সমীরকে সে বলে, পদ্মা ঠাকুরঝির বিয়ের খবর তুমি বোধ হয় কিছুই জানো না?

: লোকের মুখে শুনেছিলাম।

: একবার দেখতে যাবে কেমন ঘরসংসার পেতেছে?

: ঠিকানা জানো?

সুরমা তাকে পদ্মা ও কান্তিলালের আচমকা তাদের বাড়ীতে আসার গল্প শোনায়।

বলে, বেশ সুখীই মনে হল ঠাকুরঝিকে। কলেজে পড়া এমন ফ্যাশনে মেয়ে একজন ম্যাট্রিক পাশ ড্রাইভারের সঙ্গে দিব্যি আছে। দেখে অবাক হতে হয়।

: এ রকমটাই ওর দরকার ছিল। মার্জিত রুচি ভদ্র নরম মানুষের সঙ্গে ওর খাপ খেত না।

: কাল পরশুর মধ্যে বেরোবে? গায়ে জোর পাবে?

সমীর উৎসাহিত হয়ে বলে, আজকেই চলো। ট্রামে বাসে যাব, গায়ে জোর পাব না কেন?

বিকালে তারা দু'জনে বেরোয়।

সমীরকে বিছানা ছেড়ে উঠে জামা কাপড় পরে সুরমাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরোতে দেখে চোখে পলক পড়ে না বাড়ীর লোকের।

সুভাগিনী আনন্দে কেঁদে ফেলে।

পরমেশ্বর বলে, এবার বুঝি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে মহেশ্বর।

মহেশ্বর বলে, ওদের বেড়াতে যাবার খরচটা পর্য্যন্ত আমাকে দিতে হয়েছে।

পরমেশ্বর নিজেই নিশ্বাস ফেলে বলে, হিসাবে ভুল কর কেন? যাদের জন্য এত টাকা দিলে স্বাস্থ্য দিলে, তারা বেড়াতে যাবে বলে ট্রাম বাসের ভাড়াটা দিতে তোমার কষ্ট হচ্ছে!

ষোল

কান্তিলালের বাসার ঠিকানা খুঁজে নিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। সহর-তলীতে বাসা হলেও কি ভাবে চিনে যেতে হবে পদ্মা সেদিন ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

সমীরের চেহারা দেখে পদ্মা কেঁদে ফেলে।

: এমনি করে শরীরটা শেষ করেছো ?

সমীর বলে, কাঁদিস নে। একমাসের মধ্যে মুটিয়ে গেছি দেখতে পাবি।

শুনে সুরমার আশান্বিত মনটা একটু বিগড়ে যায়। এতো আরেক রকম ধাপ্পাবাজি। একমাসের মধ্যে রোগ সারবে কিনা সন্দেহ, সমীর জোর গলায় বলছে সে মুটিয়ে যাবে।

ছোট বাড়ীটি পদ্মার। একখানা ঘর আর একটি টালির ছাওয়া রান্না ঘর। কে একজন নিজে বাস করার জন্য এক টুকরো জমিতে ব্যবস্থাটুকু করেছিল, কোন কারণে নিজে থাকতে না পারায় কান্তিলালকে ভাড়া দিয়েছে।

বিয়েতে কিছুই পায় নি পদ্মা। গয়না গাঁটি জামা-কাপড় বাসন-কোসন আসবাবপত্র একরকম কিছুই নয়। বিধুভূষণ কিছুই দিতে দেয় নি, পদ্মার মা লুকিয়ে পাঠিয়েছিল গলার একছড়া হার এবং তার জ্যাঠামশায় ধরে দিয়ে গিয়েছিল নগদ কিছু টাকা।

সমীর তখন হাবুডুবু খাচ্ছে নিজের অধঃপতনে, সে জানতেও পারে নি তার বোনের একটা বেখাপ্পা বিয়ে হয়েছে—তার বোনেরই জিদে।

বিলাসের জিনিষ ফ্যাসানের জিনিষ নয়, ক্রমে ক্রমে সংসারের দরকারী জিনিষ কিনে কিনেই পদ্মা ঘরখানা ছবির মত সাজিয়েছে।

সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ে সেলায়ের বড় মেসিনটা। তারা আসবার সময় পদ্মা বোধ হয় সেলাই করছিল, কয়েক রকম ছিট এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে।

ঃ অ্যাতো জামা সেলাই করছ ভাই? এগুলো তো পরের জামা?

ঃ পরের জামা সেলাই না করলে পয়সা জোটে? পয়সা না দিলে রেশন দেয় না।

সমীর বলে, তোর টেষ্ট অনেক বদলে গেছে পদ্মা।

পদ্মা বলে, বদলায় নি। আগে অন্যের চাপানো টেষ্টের তলে আমার আসল টেষ্ট চাপা পড়ে থাকত। সব ছিল এলোমেলো, একখানা শাড়ী পছন্দ করতে কি যন্ত্রনাই হত। খালি ঘাঁটছিই, কোনটাই পছন্দ হয় না, খুঁতখুঁতানি যায় না।

ঃ এখন?

ঃ এখন নিজের পছন্দ দিয়ে বিচার করি—কোনটা ভাল লাগছে ভাবতে হয় না।

সুরমা হেসে বলে, মনের মানুষটাকে পছন্দ করতে পারলে এরকম হয়। মন ঠিক করা সহজে হয় নি নিশ্চয়? এদিকে আবার অঞ্জনবাবু ছিলেন।

সমীর বলে, আমিও অবাক হয়ে গেছি। নিজে থেকে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারা তোর পক্ষে আশ্চর্য্য ব্যাপার।

পদ্মা নীরবে একটু হাসে।

ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করে, তুমি রাগটাগ করনি তো?

ঃ রাগ করলে বাড়ীতে আসতাম? কিন্তু আমার মনে একটা খটকা আছে। কান্তিলালের কথাটা বুঝতে পারি, ওর সঙ্গে নয় বনল। ওর

আত্মীয় স্বজনের জন্ত অসুবিধা হয় না? তাদের বরদাস্ত করা তো তোর পক্ষে সম্ভব নয়!

: সে ভাবে বরদাস্ত করতে হয় না। এমনি হয়তো কেউ বেড়াতে আসে, দেখা করে চলে যায়। আমার একটুও খারাপ লাগে না। আমার লোক দেখানো অহংকারটার জন্তই আমি এত কষ্ট পেতাম। সত্যিকারের অহঙ্কার নেই, একটা অহঙ্কার বানিয়ে লোকের কাছে বাহাদুরী দেখাবার চেষ্টা—তার মত যন্ত্রনা আছে?

সুরমা জিজ্ঞাসা করে, গাড়োয়ান মশায় কখন বাড়ী আসেন?

: রাত হয়।

: সারাদিন একলাটি কি কর?

: সেলায়ের কাজ করি। আসল দর্জি বনে গেছি—শুধু দোকান খুলি নি এই যা। পাড়ার অনেক বাড়ী থেকে কাজ দেয়, ও জানা লোকদের কাছ থেকে কাজ নিয়ে আসে। শুধু মাইনের টাকায় কি কুলোয় বাড়ী ভাড়াটাড়া দিয়ে?

সুরমার সন্দেহ হয়েছিল পদ্মার বোধ হয় ছেলেপিলে হবার কথা। খুব স্পষ্ট না হলেও কিছু কিছু লক্ষণ যেন টের পাওয়া যায়।

সে হেসে বলে, তাছাড়া খরচ বাড়বার সময়ও তো আসছে।

পদ্মার মুখ লাল হয়ে যায়।

বোনের মুখের দিকে চেয়ে সমীর অবাক হয়ে ভাবে, একি তার সেই বোন পদ্মা?

চা খাবার করার জন্ত পদ্মা আগেই এক ফাঁকে উনানে আঁচ দিয়ে এসেছিল।

উনান ধরে এলে সে আর সুরমা রান্না ঘরে যায়।

: দাদা কি খাবে?

: দুধ ডিম ছানা—ঘি বাদ। বেশী দিওনা, হজম করতে পারবে না। পেট গরম হলে মাথা গরম হবে—মাথা গরম হলে গরম জিনিষ খাবে। বুঝতে পারছ?

পদ্মা ম্লান মুখে সংক্ষেপে বলে, বুঝেছি।

সুরমা শান্তভাবে বলে, অমন করে 'বুঝেছি' বলার আর দরকার নেই। তুমি যেমন বিবিগিরির ঝন্‌ঝাট ছেড়ে একটা গাড়োয়ানের ঘরে এসে সামলাতে পেরেছো, তোমার ভাইও এবার উঠে পড়ে লেগে সত্যি নিজেকে শুধরে নিচ্ছে!

পদ্মা হাত চেপে ধরে সুরমার।

: সত্যি বলছ?

: সত্যি বলছি। কদিনে রকম-সকম বদলে গেছে মানুষটার। আমার কিম্বা ছেলেমেয়ের খাতিরে শুধু নয়, আমরা তো বোঝা। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে কাজ করার জন্য ছটফট করছে ভেতরে ভেতরে। যেমন একগুঁয়ের মত অধঃপাতে গিয়েছিল, তেমনি একগুঁয়ের মত এবার উঠবে। ইস্, কাল রাত্রে কি ছটফটই করেছে। হঠাৎ ছাড়তে পারবে না, মদ নেই জানলে রাত্রে ভীষণ একটা প্যানিক হয়, প্রায় উন্মাদের মত হয়ে যায় —আমি নিজে মদ আনিয়ে রেখেছিলাম। যন্ত্রনায় যেন দাপাড়াচ্ছে—আমার কি ঘুম আসে? আমিও জেগে চুপচাপ শুয়ে আছি। দু'তিনবার উঠল, খেতে গিয়ে খেল না। আস্তে আস্তে আমায় ডাকল। বলল, ঘুমের কোন ওষুধ আছে বাড়ীতে, দিতে পার? আমি বললাম, ঘুমের ওষুধ আছে, আমার নিজেরি আছে—কিন্তু ওই জিনিষটাই তুমি একটু খাওনা? বলল, কাল হয় তো খাব, আজ খাব না, ঘুমের ওষুধ দাও।

পদ্মা মুখ উঁচু করে চেয়ে বলে, আমার ভাই কখনো একেবারে বিগড়ে যায়?

সুরমা প্রশ্ন করে, তোমার টাইম আসছে কি নাগাদ ?

: মাস ছ'য়েক বাদে।

: আমি এসে সামাল দেব। সময় ঘনিয়ে এলেই আমায় ডেকো কেমন ?

: ডাকতে হবে কেন ?

: ও হ্যাঁ, তাই তো বটে! মনটা কেমন হয়ে গেছে দেখেছ? সোজা হিসাব ভুল হয়ে যায়। দেখা সাক্ষাৎ এবার থেকে তো চলবে সর্ব্বদাই।

সুরমা কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থাকে।

তারপর বলে, দাদাকে ডেকে এনে বসাও। এখানে বসে আমাদের সঙ্গে গল্প করুক।

পদ্মা বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম।

সতের

পরমেশ্বরের মুখে সেই চির-পরিচিত সর্ব্বক্ষণের আনন্দময় হাসি নেই। সর্ব্বদা মানুষকে হাসাবার ক্ষমতায় যেন তার ভাঁটা পড়েছে। তাকেও আজকাল মাঝে মাঝে রীতিমত চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখায়!

মানুষ বলাবলি করে, কি হল তাদের পরমেশ্বরের ?

অশাসনে কুশাসনে চুরিচামারি নিপীড়নে মানুষের মুখ থেকে হাসি গেছে মুছে, অভাব আর ক্ষোভে জীবনটা হয়েছে অসহ্য একটা বোঝা—অন্য কাউকে হাসতে দেখলে চটে যেতেই যেন ইচ্ছা হয় মানুষের। কিন্তু পরমেশ্বরের হাসি দেখে, তার আনন্দের স্পর্শ পেয়ে দু'দণ্ডের জন্য প্রাণ যেন জুড়িয়ে যেত সকলের, অসংখ্য সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তার প্রক্রিয়াটা যেন থেমে যেত।

হাঁড়িমুখী রেণুকার মত মানুষকে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর একদিন হাসি দিয়ে বশ করেছে, তাকে হাসতে শিখিয়েছে।

সেই পরমেশ্বরের সহজ হাসি আর অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার কি তবে নিঃশেষ হয়ে এল !

একে একে প্রায় সকলেই তাকে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার ঈশ্বরবাবু ? শরীর খারাপ নাকি ?

: না, শরীর মশায় ঠিকই আছেন !

জবাব দিয়ে পরমেশ্বর হাসে।

ব্যাকুলভাবেই আবার প্রশ্ন করা হয়, একটু যেন কাহিল কাহিল লাগছে আপনাকে ? সে রকম ফুর্তি নেই, একটু মনমরা ভাব ?

: বয়স হল, মন বুঝি মরার কথা টথা ভাবছে। মন বড় অবাধ্য,

: আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি জ্যাঠামশায়। কিন্তু এ কথাটা মানতে পারলাম না।

পরমেশ্বর তার স্বভাবসুলভ রসালো ভাবে ফিরে গিয়ে বলে, সে তো করবেই—আরও বেশী করে শ্রদ্ধা করার ব্যবস্থাও করছ। গুরুজন হলে আমিও কি শ্রদ্ধাভক্তি না পেলে ছেড়ে কথা কইব ?

পঙ্কজ বলে, গুরুজন হলেও আমার শ্রদ্ধা বাড়বে না। কিন্তু আপনার এ কথাটার মানেও বুঝলাম না,—একলা একলা আনন্দে থাকার কোন মানে ছিল না। আমি অনেকবার আপনাকে বলেছি—আপনার আসলে বৈরাগ্য। একলা একলা আনন্দে থাকার তা ছাড়া কোন মানে হয় না। কিন্তু আপনি বরাবর অস্বীকার করে এসেছেন।

: আজও অস্বীকার করছি।

পঙ্কজ ভড়কে গিয়ে বলে, তা হলে কি বলছেন ? আপনার কথাটার মানে কি ?

পরমেশ্বর বলে, তোমরা বড়ই যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছো। বাস্তব ভোলা থিয়োরীবাদীদের এই দশা হয়। এতকাল চেষ্টা করে আমি তোমাকে বোঝাতে পারলাম না—স্ত্রীপুত্র নিয়ে সংসার না করার মানেই বৈরাগ্য নয়। তোমার মনটা ওই দিকে পড়ে আছে—তুমি ভাবছ, সংসার না করে মানুষ ভোগ করতে পারে না! শশধরও তো সংসার করে না, আত্মীয়স্বজন কারো ধার ধারে না, রোজ শুধু প্রাণ ভরে মদ খায়। ওর কি বৈরাগ্য হয়েছে ?

: শশধরের সঙ্গে আপনার তুলনা !

: এটা তুমি বোকার মত কথা কইলে বাবা! আমি কি মানুষ হিসাবে শশধরের সঙ্গে আমার তুলনা করছি ? মাসে কতবার দিনের বেলা আমার কাছে এসে ও যে আপশোষ করে আর জানায় এবার নিশ্চয়

মদ ছেড়ে দেবে,—সে খবর রাখ? কথাটা তা নয়। আসলে আমার বৈরাগ্য আসে নি—ওই নেশার মতই একটা ভাবে বিভোর হয়ে ছিলাম। দেশ থেকে ভাই টাকা পাঠায়, আমি খাই দাই ঘুমাই আর আনন্দের নেশায় বিভোর হয়ে থাকি। শশধরের নেশা তো জমে সন্ধ্যার পর মদ পেটে গেলে—আমি সর্ব্বদাই আমাব নেশায় মেতে থাকতাম। একে স্বার্থপরতাই বলা যায়—নিছক আত্মকেন্দ্রিকতা।

পরমেশ্বর নিশ্বাস ফেলে।

: তবে একটা ভাগ্যের কথা—দশজন মানুষকে আশে পাশে না পেলে, তারা আমার আনন্দের ভাগ না নিলে, আমার নেশা জমত না! মদ যায় শশধরের নিজের পেটে, পেট থেকে আনন্দের সঞ্চার হয় ওর নিজের মগজে। কিন্তু বেচারা ভুলতে পারে না দশজনের কাছে ওর ফুর্তির কোন দাম নেই। লোকে বরং নিন্দেই করে। আমার আনন্দকে সকলেই দাম দিত। সেইজন্যই আজ নেশা কেটে গেলেও হতাশ হতে হয়নি, জ্বালা বোধ করতে হয়নি। দশটা মানুষের জীবনের সুখদুঃখের অংশীদার হলে, দশজনের লড়ায়ে ভাগ নিলে জীবন বেশ জমে যায়।

পঙ্কজ এবার চুপ করে থাকে।

: মানেটা হল এই, আনন্দ সবাই চায়। হতাশা নিরানন্দ দুঃখ কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু আনন্দ তো আকাশ থেকে নামে না বৃষ্টির মত কিম্বা প্যাঁচ টিপলে কলের জলের মত। আনন্দও অন্য সব কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে সৃষ্টি করতে হয়। দুঃখ না থাকলে আলাদা কথা—কিন্তু দুঃখ যখন আছে, সেটাকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় কি করে? এটাই আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমি ভাবতাম মানুষ বোকা, ইচ্ছা করে দুঃখ বাড়ায়, ঝনঝাট ডেকে আনে—মানুষ আনন্দ ভুলে গেছে। এখন বুঝতে পেরেছি একেবারেই মিথ্যা আমার ধারণাটা। দুঃখে ডুবে থেকেও

মানুষ দুঃখটা আয়ত্ত করে, নিজেকে সামলে রাখে, সব সময় আনন্দ চায়। রোগ-শোক দুঃখ বেদনার বন্যা বয়ে চলেছে—কিন্তু মানুষকে ভাসিয়ে নিতে পারে নি। এ অবস্থায় হাসি আনন্দ যেটুকু আছে সেটুকু বজায় রাখাই কি সহজ কথা, সাধারণ ব্যাপার!

পঙ্কজের মুখে হাসি ফোটে। হঠাৎ তাকে আশ্চর্য্য রকম খুসী মনে হয়।

পরমেশ্বর বলে, আমি হাসাই, পাঁচজনে হাসে। আগে ভাবতাম, এটা আমার বাহাদুরী। আজ অবাক হয়ে ভাবছি, আমি নয় দুঃখ এড়িয়ে চলি, আমার নয় হাসানো ছাড়া কোন কাজ নেই—কিন্তু পাঁচজনে ওরা হাসে কি করে?

পঙ্কজ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, এইবার আপনাতে আমাতে অমিল ঘুচে গেল! আমিও বস্তিতে কলোনিতে মানুষগুলিকে দেখে অবাক হয়ে থাকি।

: অবাক হবারই কথা। সামাজিক ভাবে ধরলে মানুষের কী মনের জোরের পরিচয়টাই যে পাওয়া যায়! সমীরকে কেউ শোধরাতে পারে নি, উদ্বাস্তুদের বাঁচার জন্য লড়াই করতে দেখে ওর জীবনের মোড় ঘুরে গেল।

পঙ্কজ অভিভূত হয়ে থাকে।

পরমেশ্বর বলে, আমি তোমাদের রবিবারের সভায় আসছি। আর একটা কথা—আমায় মেম্বার করে নিতে হবে। আমি কিছু কিছু কাজ করব।

সর্ব্বদা যে মুখে থাকত হালকা আনন্দের ছাপ, ক্রমে ক্রমে সে মুখে নেমে আসে এক অদ্ভুত দৃঢ়তা।

মহেশ্বরের মুখ সর্ব্বদা হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

জামাই যে তার অধঃপতনের প্রায় চরম সীমা থেকে আশ্চর্য্যভাবে ফিরে এসেছে এ আনন্দও যেন তার তুচ্ছ হয়ে গেছে জীবনের অন্য সমস্ত দিকের ব্যর্থতার কাছে।

বিমর্ষ মুখে সে দিনরাত শুধু চিন্তা করে।

তাকে দেখে মনে মনে কতগুলি হিসাব ঠিক করে নেয় পরমেশ্বর।

মহেশ্বর চিরদিন তার অত্যন্ত অনুগত, মনেপ্রাণে তাকে সে শ্রদ্ধা করে। তার প্রতিটি কথা সে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে প্রস্তুত। হতাশায় ডুবে থাকার বদলে কাজের মধ্যে নতুন অবলম্বন খুঁজে নিতে বললে সে পালন করবে কিন্তু ওভাবে শুধু উপদেশ দিয়ে মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায় কি?

একটা দৃষ্টান্ত সামনে রাখা বোধ হয় উচিত।

তারপর কয়েকদিন পরমেশ্বর খুব বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়।

জিজ্ঞাসা করলে বলে, একটা দরকারে যাচ্ছি। যথা সময়েই জানতে পারবে।

প্রতিমা একটু চিন্তিতভাবে পঙ্কজকে বলে, কি যেন হয়েছে জ্যাঠামশায়ের।

পঙ্কজ সহজভাবেই বলে, জ্যাঠামশায়ের ভুল ভেঙেছে।

: ভুল ভেঙেছে? ভুল?

: নিজে নিজে একলা আনন্দে থাকার ভুল। এখন থেকে উনি সবার সুখদুঃখে ভাগ নেবেন, সবার লড়ায়ে হাত মেলাবেন।

: নিজে বলেছেন এসব কথা?

: নিজে বলেছেন।

পঙ্কজের মুখে হাসি ফোটে।

: আরও একটা কথা যা বলেছেন—!

: কি কথা ?

পঙ্কজের রকম দেখে প্রতিমা উৎসুক হয়ে চেয়ে থাকে।

পঙ্কজ বলে, কথায় কথায় আমি সেদিন বলেছিলাম যে আমি ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করি। উনি কি বললেন শুনবে? গুরুজন করে নিয়ে আরও বেশী শ্রদ্ধা করব।

প্রতিমা হেসে বলে, এ আর নতুন কথা কি হল? এতো সবাই জানে।

তারপর একদিন সকালে পরমেশ্বর মহেশ্বরকে ডাকে।

বলে, মহেশ, এসো আমরা বসে একটু পরামর্শ করি। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে কি ব্যবস্থা করা যায় দেখা যাক।

মহেশ্বর খাটের প্রান্তে বসে। বাড়ীর পূজো বন্ধ করে তাকে সার্বজনীন পূজোর দায়িত্ব নেবার পরামর্শ অথবা নির্দেশ অবশ্য পরমেশ্বর দিয়েছিল—কিন্তু চিরকালের গা-বাঁচানো ভাব ছেড়ে দিয়ে সে নিজে থেকে যেচে তার সঙ্গে পরামর্শ করবে সংসারের অচল অবস্থা সম্পর্কে—এটা মহেশ্বর কল্পনাও করে নি।

মুখ দেখেই বোঝা যায় সে অভিভূত হয়ে গেছে। আশার এক নতুন আলো ফুটেছে তার মুখে।

পরমেশ্বর বলে, ভবিষ্যতের কথাটা পরে বিবেচনা করা যাবে। সেজন্য একটু বিশেষ ভাবে চিন্তা করা দরকার। অবিলম্বে কি করা সম্ভব ঠিক করে ফেলি এসো।

: দিনরাত তাই ভাবছি—ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না।

: কষ্ট আমাদের করতেই হবে—যতটা পারি করতে হবে।

: সে তো বটেই।

পরমেশ্বর ধীরে ধীরে বলে, অবস্থাটা আমাদের দাঁড়িয়েছে প্রায় অচল। এর একটা প্রতিকার না করলে আমরা চোখে অন্ধকার দেখব—অবস্থার বড় রকম পরিবর্তনের কথা চিন্তাও করতে পারব না। দুদিক দিয়ে সমস্যাকে ধরতে হবে। কিছু পয়সা আনার ব্যবস্থা করা আর খরচ কমানো। আমরা ভদ্রলোক, পাঁচজনের কাছে মানসম্ভ্রম আছে, আগে সুখে ছিলাম—এসব মনে রাখলে চলবে না। আমরা ছেঁড়া কাপড় পরব, শাক ভাত খাব। একটি একটি খরচ ধরে হিসাব করতে হবে—কোনটা বাদ দেওয়া যায়, কোনটা কত কমানো যায়। তার আগে আয়ের কথাটা ভাবি এসো।

সুভাগিনী বলে, ওটাই তো আসল।

তার শাঁখা সম্বল নিরাভরণ দেহের দিকে চেয়ে পরমেশ্বর বলে, আসল বৈকি। তাই তো বুড়ো বয়সে চাকরী নিলাম।

মহেশ্বর বিভ্রান্তের মত বলে, চাকরী নিয়েছেন?

: নইলে উপায় কি? তোমার জন্যও চেষ্টা করছি—তোমাকেও খেটে কিছু পয়সা আনতে হবে।

মহেশ্বর খানিকক্ষণ অভিভূত হয়ে থেকে বলে, আপনি পারলে আমি খাটতে পারব না?

পরমেশ্বর বলে, পারবে বৈ কি। দরকার হয়েছে, করতেই হবে। তা ছাড়া আরেকটা কথা আছে। আমি বলি কি, একতলা কিম্বা দোতলাটা ভাড়া দেওয়া যাক।

: সম্পূর্ণ?

: সম্পূর্ণ। আমার মতে দোতলাটা ভাড়া দেওয়াই ভাল, বেশী ভাড়া পাওয়া যাবে। আমরা সবাই একতলাতে থাকব। সাধন আমার ঘরে থাকবে।

সুভাগিনী সখেদে বলে, আপনাকে আমরা সবাই মিলে একেবারে ডুবিয়ে দিলাম। গোটা একতলাতে একলা ছিলেন—আজ আপনার একটি ঘরেও ভাগ বসাব!

পরমেশ্বর তার আগের আনন্দময় হাসি হাসে।

: কি ছিলাম কেমন ছিলাম—ভেবে আর লাভ নেই। আমার নেই, তোমাদের নেই, আরও অনেকের নেই।

মহেশ্বর বলে, জিনিষপত্র আঁটবে কি? খাট আলমারি—

: বাড়তি জিনিষ নীলাম করে দেব।

: তা মন্দ নয়। এ বাড়তি বোঝা দিয়ে কি হবে?

: হ্যাঁ, জীবনটার বোঝা কমাবার লড়াই চলেছে—বাজে বোঝার দরকার নেই।

এদিকে পরমেশ্বর বাড়ীতে মহেশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ করে, ওদিকে সাধন সবিতার সঙ্গে চালায় কিছু রোজগারের জন্য তাদের অস্থায়ী উপায়টার প্রস্তুতি।

সে একটা বিড়ি ধরায়।

: আরেকটা গান লিখেছি, শিখবে?

: শিখব না?

সাধন লেখা গানটি সবিতার হাতে দেয়। মোটা গলায় পদগুলির মোটামুটি সুর গেয়ে শোনায়। সবিতা মন দিয়ে শোনে—তারপর সেই পদটি সুরে ঝংকার দিয়ে ওঠে তার গলায়।

ভুমুর এসে চুপ করে দরজার বাইরে বসে। একে একে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ যারা এসে জোটে। তাদের সে হাতের মুখের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে

বুঝিয়ে দেয় যে টুঁ শব্দটি করা চলবে না, ইঙ্গিতেই তাদের সে নির্দেশ দেয় চুপচাপ বসে পড়ার।

গান অভ্যাস করার ফাঁকে সবিতা বলে, এমনি শুনলে হবে না, পয়সা লাগবে। রেশন আনার পয়সা নেই। না খেয়ে শুকোলে গলায় গান খোলে না।

বাইরে থেকে জিতু বলে, পয়সা দিয়ে পচা সিনেমা দেখি, বিনা পয়সায় গান শুনব কেন? চাঁদা আমরা তুলে দিচ্ছি—কিন্তু গান শেখা শুনব শুধু? শেখা গান দু'একটা হবে না?

: হবে বৈকি।

দরজার কাছে এগিয়ে এসে সবিতা পুরানো গান ধরে। গতর খাটিয়ে, ফসল ফলিয়ে, জিনিষ বানিয়ে মানুষের উপোসী থাকার গান।

মহেশ্বরের সঙ্গে কথা শেষ করে পরমেশ্বর বস্তির দিকে পা বাড়ায়।

সাধন আর সবিতার সমস্যার একটা মীমাংসার দরকার।

কিন্তু তার আগেই সাধন আর সবিতা বেরিয়ে গিয়েছিল।

সবিতার মা বলে, দুজনে সকাল বেলা বেরিয়ে গেছে একসাথে।

: কোথায় গেছে?

: কে জানে কোথায় যায়, কি করে। আমায় কি আর জানায় কিছু। জিজ্ঞেস করলে মেয়ে শুধু বলে, রোজগার করতে যাচ্ছি।

সাধন বাড়ী ফিরলে সেদিন পরমেশ্বর তাকে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাও কি কর বলতে পারবে না?

: না জ্যাঠামশায়, জানতে চাইবেন না। এ মাস থেকে আমি কিছু কিছু সংসার খরচ দেব।

: সে ভাল কথা। সঙ্কোচটুকু কাটাতে পারলে আরও ভাল হত। চুরি কর না নিশ্চয় ?

সাধন হাসে।

দিন তিনেক পরে আপিস যাবার পথে পরমেশ্বর হঠাৎ ট্রাম থেকে নেমে পড়ে।

ধীবে ধীরে ভিড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

সাধন আর সবিতা ভাটিয়ালি সুরে গান গাইছে—দেশের দুঃখদুর্দশার গান—সবাই মিলে তার প্রতিকার করার গান।

আনন্দের মূল্য আছে, কিন্তু শুধু গান শুনিয়ে তারা রোজগার করছে না। সাধন বিক্রী করছে জুতোব সোল, সবিতা কিসের মোড়ক।